অরণ্য বাসর

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ :
১লা অগ্রহায়ণ ১৩৬৫

প্রকাশক :
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি. এস্-সি
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্
কলিকাতা ৬

মুদ্রক :
শ্রীকালীপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৬, চালতা বাগান লেন
কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদশিল্পী :
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ-মুদ্রক :
শ্রীমাখন বক্সী
শ্রীগুরু আর্ট প্রেস

অরণ্য বাসর

কথারম্ভ

জল--কেবলই জল আর জল। যতোদূর নজর যায়—চারপাশে শুধু টল্ টল্ ছল্ ছল্ করছে কালো জল। নিবিড় কালো। অথচ এ কোনো সাগর মহা-সাগর নয়—কোনো সুবিশাল নদ-নদীও নয়। বিদেশী বণিকের বাণিজ্যপোত এর জলে ঢেউ তোলে না। কোনো রণতরীর গতি-তরঙ্গে এর শান্তি ব্যাহত হয় না। তথাপি এও সামান্য নয়—উপেক্ষারও নয়।

স্থানীয় অধিবাসীরা বলে, এককালে এর রূপ নাকি আরো ভয়ংকর ছিল—আরো ভয়াবহ ছিল। তখন এর এই কৃষ্ণবর্ণ বারি-বিস্তারের পানে তাকালে মানুষের বুকের রক্তও জল হ'য়ে যেতো। এর ত্রিসীমানা দিয়ে মানুষের গতায়াত ছিল না সেদিন। ছিল না শুধু জল বলেই নয়--অন্য ভয়ও ছিল প্রবল। সে ভয় মারী ভয়—ঠ্যাঙাড়ের ভয়—দস্যুর ভয়! তাই থেকেই সম্ভবত জলাশয়টির নাম হয়েছে—'ডাকুর বাদা' বা 'ডাকাতে বিল'।

অনেক রকমের কিংবদন্তি প্রচলিত আছে এই ডাকুর বাদা বা ডাকাতে-বিল সম্পর্কে। স্থানীয় প্রাচীন লোকদের মুখে মুখে সে সব প্রবাদ শোনা যায় আজও। এখনো এর আশপাশ দিয়ে ভর দুপুরে কিংবা সাঁঝের বেলা চলা-ফেরা করতে ভয় পায় স্থানীয় লোকেরা। গা ছম্ ছম্ করে তাদের।

বেশি দিন নয়—মাত্র পঁচিশ ত্রিশ বছর আগেও নাকি কতো শত নরমুণ্ড ভাসতে দেখা গেছে এর জলে—কতো কবন্ধ কংকাল কোথা থেকে ভেসে এসে জমা হয়েছে এর পাড়ে পাড়ে। বিলের-

দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ওই যে মস্ত বাদাড়টা, ওর গাছে গাছে কতো প্রাণহীন নরনারীকে ঝুলে থাকতে দেখা গেছে সেদিন। গভীর রাত্রে এখনো এখানে যেন কাদের বুক ফাটা কান্না শোনা যায় —শোনা যায় মর্মছেঁড়া বেদনার হাহুতাশ আর অনুনাসিক কান্না। এখনো নাকি কাদের কাতরানি, কাদের বুক-ভাঙা দীর্ঘশ্বাস এখানের বাতাসে বাতাসে গুমরে বেড়াচ্ছে।

ডাকাতে-বিল!

বর্ষার প্রারম্ভেই এর রূপ বদলাতে শুরু করে আস্তে আস্তে। তারপর কোথা থেকে একদিন অকস্মাৎ একটা প্রবল জলস্রোত এর মধ্যে এসে পড়ে হুড়মুড় ক'রে। এসে পড়ে ভৈরব গর্জনে এর দুকূল প্লাবিত ক'রে সমুদ্রের মতো দুর্বার উচ্ছ্বাস আর বিপুল তরঙ্গ নিয়ে। দুর্বাসার মতো ক্রুদ্ধতর তার সেই ভয়ংকর গতি। সে উন্মাদগতি ভাসিয়ে দিয়ে যায়—ডুবিয়ে দিয়ে যায় এর চারিপাশের তটসীমা। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য! সুন্দর অথচ ভীষণ ভয়াল। মাইলের পর মাইল শুধু থই থই করছে অথই জল—কোথাও হাঁটুভোর, কোথাও একগলা আবার কোথাও বা অতলস্পর্শী কালো জল।

শুকো-খরার দিনে যারা এর চর দিয়ে যাওয়া আসা করে, জলের দিনে তারা শালতি ভাসায় এর বুকে। তখন ডিঙি নৌকা আর শালতি ছাড়া গমনাগমনের অন্য উপায় থাকে না। জলে-স্থলে সব একাকার হ'য়ে যায়।

এখান থেকে মাইল পাঁচ ছয় দূরে রাধানগর। প্রতি শনি-মঙ্গলবার সেখানে হাট বসে। মস্ত হাট। এ তল্লাটে রাধানগরের হাটই সব চাইতে বিখ্যাত এবং বড়। ভিন্‌গাঁয়ের ব্যাপারীরা নৌকা ক'রে তাদের পণ্য নিয়ে যায় এই ডাকাতে-বিলের ওপর দিয়ে রাধানগরের হাটে। ক্রেতারা ডিঙি শালতি ক'রে হাট করতে যায়—হাট ক'রে ফিরে আসে আবার এই বিলেই শালতি ভাসিয়ে

জেলেরা ছোট ছোট জেলেডিঙি ক'রে মাছ ধরে বেড়ায় এর জলে। পাড়ে পাড়ে জেলেদের ছেলেরা ছিপ আর খ্যাপলা ফেলে বেড়ায়। আশেপাশের খানা-খন্দে ঘুনী আট্‌ল বসিয়ে মাছ ধরে। গেঁড়ি গুগ্‌লি কুড়োয়। মেয়েরা খাট কাপড়ে গাছ কোমর বেঁধে সুষনি কলমী শাক্ সঞ্চয় ক'রে ফেরে এর ধারে ধারে। এমনি ক'রেই সারাটা দিন কাটে। মনে হয় এ যেন একটা রহস্যময় জলেরই দেশ।

দিনের বেলাটা বেশ লাগে এখানে। অল্প বিস্তর প্রাণের সাড়াও পাওয়া যায় এর জলে স্থলে। কিন্তু সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে এর রূপ বদলে যায় একেবারে। সম্পূর্ণই বদলে যায়। সেস্থলে জেগে ওঠে একটা মহা আতঙ্ক—উৎকট ভীতি। জন-মানবের সমাগন আর থাকে না। মনে হয় না তখন. যে কোনো কালে এর আশপাশ দিয়ে কিংবা এর বুকের জলরাশির ওপর দিয়ে কেউ যাওয়া আসা করেছে বলে। তখন কেবল দেখা যায় ওই দূর বাদাড়ের গায়ে অগণিত জোনাকীর জ্বলা আর নেভা—দেখা যায় আকাশের সংখ্যাতীত নক্ষত্ররাজির প্রতিবিম্ব ডাকাতে-বিলের কালো জলে। কখনো বা দেখা যায় চাঁদের প্রতিফলন। আর শোনা যায় খেপা বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ—কল্ কল্ ছল্ ছল্ জলের একঘেয়ে আওয়াজ—শৃগাল কুক্কুরের চিৎকার এবং ঝিঁঝিঁর ঐকতান। এ ছাড়া আর যা কিছু দেখা বা শোনা যায় তাই নাকি ভীতির, তাই নাকি ভীষণ অমঙ্গলের এবং আশঙ্কার।

মাঝে মাঝে বিলের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ওই বাদাড়টার মধ্যে কোনো এক গভীর রাতে অকস্মাৎ একটা আগুন জ্বলে ওঠে দপ ক'রে। তার লেলিহান শিখায় আকাশ পর্যন্ত লাল হ'য়ে ওঠে। মনে হয় বাদাড়টার গাছপালাগুলো বুঝি মুহূর্তেই পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে সে আগুনে। কিন্তু তা হয় না। যেমন দপ ক'রে জ্বলে ওঠে সেই আগুন আবার ঠিক তেমনি খপ ক'রে নিভেও যায় পরমুহূর্তেই। কখনো কখনো আবার সে আগুন স্থান হ'তে স্থানান্তরে ঘুরেও বেড়ায়। বিলের জলেও মাঝে মাঝে আগুন জ্বলতে দেখা গেছে—যেন হাজার

মশালের আগুন জ্বেলে কারা উল্লাস ক'রে ফিরছে। অনেকেই নাকি দেখছে সে দৃশ্য। তারা বলে—ওটা আলো নয়—আলেয়া! কেউ কেউ আবার শুনেছে—নিস্তব্ধ রাত্রির বুক চিরে বিভিন্ন স্বরের বিকট হাস্যরোল—বীভৎস কান্নার ধ্বনি কখনো! তারা বলে—ও হাসি আর ওই কান্না মানুষের নয়—ও উপদেবতার!···

কিন্তু সে আজকের কথা নয়—অতীতের কাহিনী। আজকের ডাকাতে বিলের আর সে পূর্বের রূপশ্রী নেই। বিগত যৌবনা নারীর মতো অবস্থা হয়েছে যেন তার। এখন এর পাড়ে আলেয়ার আলো জ্বলে ওঠে না আর, উপদেবতার হাসি-কান্নাও ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে না। দক্ষিণ-পূর্ব কোণের বাদাড়টাও অনেক সাফ হ'য়ে এসেছে, বিলও মজে আসছে আস্তে আস্তে। তবুও স্থানীয় লোকেদের আতঙ্ক আজও ঠিক তেমনি বজায় আছে। আর আছে মুখে মুখে ছড়িয়ে ডাকাতে বিল সম্পর্কে সত্য মিথ্যা অসংখ্য প্রবাদ।

ডাকুর বাদা!

আষাঢ় থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত এখানে পায়ে চলা পথ থাকে না। জল পথেই আসা যাওয়া করতে হয় এ অঞ্চলের অধিবাসীদের। তারপর আস্তে আস্তে সরতে শুরু করে জল। পৌষ মাঘ মাসে একটি ক্ষীণ জলধারায় পরিণত হয় ডাকুর বাদার সেই বিপুল জলরাশি।

শোনা যায়—পূর্বে নাকি এমন হতো না, সারা বছরই সমান জল বর্তমান থাকতো। তবে বিলের ওই পশ্চিম দিকটা শিবরাত্রের পূর্বেই খট্‌-খটে শুকনো হ'য়ে যেতো সেদিনও—আজও যায়। এটা নাকি স্থান মাহাত্ম্য!

পশ্চিম দিককার পাড়ে এ অঞ্চলের জাগ্রত দেবতা মহাকালের মন্দির! মন্দির কতো কালের এবং কোন ভক্ত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার কোনো ইতিহাস জানা যায় না আজ। ক্ষুদ্র একটি মন্দির—

কারুকার্যের কোনো বাহুল্যও নেই এর গাত্রে। নির্মাণ কৌশলও এমন কিছু বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়। কিন্তু মন্দির মধ্যস্থ বিগ্রহটির কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। কালো পাথরের অপূর্ব শিব মূর্তি। মূর্তিটির দিকে তাকালে মনে হয় যেন কোন দক্ষ ভাস্কর সুদীর্ঘকাল সাধনার পর তবে এই অপরূপ মূর্তিটি নির্মাণ করতে সমর্থ হয়েছেন।

বৎসরের মধ্যে প্রায় ছ'মাস মন্দির সমেত এই আশ্চর্য সুন্দর মূর্তিটি ডাকাতে-বিলের জলে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে নিমজ্জিত থাকেন। তখন বিগ্রহের পূজারতি, স্তব স্তুতি কিছুই আর সম্ভব হয় না। সম্ভব হয় না দেবতার দর্শন লাভ। গ্রামান্তরের যাত্রীরা নৌকায় ক'রে এই পথে যাবার সময় জলমগ্ন মহাকালের উদ্দেশ্যে ভক্তি ভরে প্রণাম জানিয়ে যায়। কোনো কোনো ভক্ত যাত্রী ফুল-বেলপাতার অর্ঘ্য সাজিয়ে এইখানেই জলে ভাসিয়ে দিয়ে যায় জলতলবাসী দেবতার উদ্দেশ্যে। মনে মনে মানত ক'রে যায়ঃ এই সামনের শিবরাত্রে ঠাকুরের স্থানে এসে জাগর করবে বলে।

বড় জাগ্রত দেবতা এই ডাকুর দাদার মহাকাল। ভক্তের ডাকে নাকি সাড়া দেন ইনি। এঁর দরজায় ধর্ণা দিয়ে কত কঠিন রোগীর রোগ নিরাময় হয়েছে—কতো বিপন্ন বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছে—কতো বন্ধ্যার সন্তান লাভ ঘটেছে। মহাকালের মহা-মাহাত্ম্যের খ্যাতি সুদূর বিস্তৃত! মাটি আর জলের তলা থেকে একদিন নিজেই নাকি ইনি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। মৌগাছির মহাভারত শিরোমণি স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন এঁর সেবা আর পূজার দায়িত্ব গ্রহণের।

শিরোমণি মহাশয় সেই আদেশ পেয়ে সংসার ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং তারপর যতোদিন জীবিত ছিলেন এই দেবতার সেবা ক'রেই কাটিয়ে গেছেন। তিনি গতায়ু হ'লে তাঁর পুত্র পূজার ভার পান। বর্তমানেও শিরোমণি মহাশয়ের বংশধররাই মহাকালের পূজক আছেন।

মহাকাল প্রায় ছয়মাস জলতলে অবস্থান করেন। এই সময় তাঁর পূজাদি বন্ধ থাকে। আবার শুরু হয় শিবরাত্রির রাত্রি থেকে মহা জাঁকজমক সহকারে তাঁর পরিপাটি পূজা। শুরু হয় সমারোহ। এ নাকি তাঁরই স্বপ্নাদেশ।

শিবরাত্রি এ অঞ্চলের এক বিরাট উৎসব। এতো বড় উৎসব, এতো বড় মেলা এদিকে আর কোথাও হয় না। কতো দূর দূরাঞ্চল থেকে নরনারী আসে দলে দলে মহাকালের স্থানে। আসে শিবরাত্রের মেলা দেখতে—আসে জাগর উৎসবে যোগদান করতে। ব্রত-পালন করতে—মানত পূজা দিতে এবং মহাকালকে দর্শন করতে।

শিবরাত্রের পনেরো দিন পূর্ব থেকেই প্রাণচঞ্চল হ'য়ে ওঠে ডাকুর বাদার শুকনো চর। প্রাণচঞ্চল হ'য়ে ওঠে বাদার উত্তর তীরবর্তী মৌগাছি গ্রাম।

এখন আর জল থাকে না ডাকুর বাদার দুই পাড়ে। দুই দিকেই সুবিস্তৃত বেলে-মাটির চর আর মাঝ দিয়ে বয়ে চলেছে আঁকা বাঁকা ক্ষীণ জলস্রোত। এ দেখে কেউ ডাকুর বাদা বা ডাকাতে বিলের বর্ষার সেই বিভীষণ রূপ কল্পনাই করতে পারে না।

ডাকুর বাদার দুই চরে শিবরাত্রের মেলা বসে—দীর্ঘস্থায়ী এই মেলা। শিবরাত্রের সপ্তাহকাল পূর্ব থেকে শুরু হয় মেলা, শেষ হয় চড়ক পূজার পর। যখন গাজনের বাজনা আর ঝাঁপসন্ন্যাসীদের উৎসব শেষ হয়। থেমে যায় ব্রতধারী সন্ন্যাসীদের আকাশ বাতাস প্লাবিত করা কণ্ঠ: বাবা মহাকালের চরণের সেবা লাগে—মহাদেব! —তারপর মেলা শেষ হয়।

বিরাট মেলা বিপুল জনসমাগমে পূর্ণ হ'য়ে যায়।—দোকান-পাট বাজি-বাজনা সার্কাস-সিনেমা হৈ-হল্লা—সে এক ইলাহী কাণ্ড। এদিকের লোকেরা কোনো বড় উৎসবাদি দেখলেই উপমা দিয়ে বলে থাকে: এ যেন ডাকাতে-বিলের শিব-মেলা!

রাজা বাহাদুর মহেশ্বর ঘোষাল এ-অঞ্চলের জমিদার। ডাকাতে বিল তাঁরই জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত। রাজা বাহাদুরের আদি বাড়ি যদিও মৌগাছি গ্রামে; কিন্তু বর্তমানে তিনি রাধানগরে নতুন প্রাসাদ নির্মাণ ক'রে বসবাস করছেন। অবশ্য মৌগাছিতে তাঁর কাছারী আজও আছে। বৎসরে দু'একবার নিজে এসে এখানের মহল পরিদর্শনও ক'রে যান। বিশেষ ক'রে এই মেলার সময়টা এখানে না এলে তাঁর চলে না। কোনো বছর যদি নিজে নাও আসতে পারেন, তাহলে তাঁর বড় ছেলে—কুমার গৌরীশংকর আসেন। সঙ্গে আসেন বৃদ্ধ দে'ওয়ান ত্রিলোচন রায়, গোমস্তা করালী চক্রবর্তী। আসে পাইক বরকন্দাজের দল। আরও অনেকেই আসেন রাজা অথবা রাজকুমারের সঙ্গী হ'য়ে। ছোট গ্রাম মৌগাছি সচকিত হ'য়ে ওঠে তাঁদের আগমনে। পুরাতন জমিদার-ভবন কলমুখর হ'য়ে ওঠে!

রাজা বাহাদুর মহেশ্বর ঘোষাল বর্তমানে বৃদ্ধ এবং বাতাদি বার্ধক্যজনিত নানা রোগে আক্রান্ত। জমিদারি দেখা শোনা আর নিজে বড় একটা করতে পারেন না—বড়ছেলে গৌরীশংকরই করেন। গৌরীশংকর জমিদারবাবুর অত্যন্ত প্রিয় এবং বিশ্বাসভাজন। প্রত্যেকটি বৈষয়িক ব্যাপারেই গৌরীর পরামর্শ বৃদ্ধ জমিদারের একান্ত অপরিহার্য। তিনি বলেন: বিষয় বুদ্ধিতে গৌরীর জোড়া নেই! তা ছাড়া তার মতো সচ্চরিত্র, উদার এবং বিনয় নম্র স্বভাবের ছেলেও আজকাল বিরল। কেতাবী বিদ্যা তার উল্লেখ যোগ্য নয় বটে—বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো সম্মানই সে লাভ করতে পারেনি, তবু সে সুশিক্ষাই পেয়েছে।

জমিদারবাবুর দুইটি বিবাহ। প্রথম স্ত্রী এক বৎসরের শিশু গৌরীকে রেখে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তারপর জমিদারবাবুর বিবাহে আর মোটেই রুচি ছিল না। কিন্তু অবস্থাগতিকে পুনরায় তাঁকে এক রকম বাধ্য হ'য়েই বিবাহ করতে হয়—প্রথম স্ত্রী বিয়োগের প্রায় তিন বছর পরে। এই দ্বিতীয় পত্নীই বর্তমানে জমিদার গৃহের

সর্বময়ী কর্ত্রী। এঁর একটি পুত্র ভবানীশংকর এবং একটি কন্যা উমারাণী। এ ছাড়া আরো তিনটি সন্তান হয়েছিল কিন্তু তারা জীবিত নেই।

এই দ্বিতীয় বিবাহটি জমিদারবাবুর জীবনে যেমনই আকস্মিক তেমনই অপ্রত্যাশিত। রাধানগর এবং মৌগাছির বিখ্যাত জমিদার এমন একটি বিবাহ যে কোনোদিন করতে পারেন এ কল্পনাও কারো মনে কখনো ছিল না।

রাধানগরের পাশের গ্রাম চন্দনা। জানকী ভট্টাচার্য এই চন্দনার অধিবাসী। পণ্ডিত এবং অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এই জানকীনাথ। সাংসারিক অবস্থা তাঁর অতিশয় মন্দ—সামান্য যজন-যাজন এবং একটি টোলে অধ্যাপনা ক'রে কায়ক্লেশে সংসার প্রতিপালন করতেন। জমিদারের অগাধ শ্রদ্ধা ছিল এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি। বহুবার বহুভাবে এঁকে সাহায্য করার প্রয়াসও পেয়েছিলেন তিনি; কিন্তু কখনো কৃতকার্য হননি। ব্রাহ্মণ কারো সাহায্য বা দান গ্রহণে অভ্যস্ত ছিলেন না। এঁরই একমাত্র কন্যা বসুমতীর বিবাহ-রাত্রে অকস্মাৎ এক বিপর্যয় ঘটে গেল। সে রাত্রে বিবাহের তিনটি লগ্ন ছিল। প্রথম লগ্নেই বিবাহের কথা। লগ্ন বয়ে গেল পাত্র এলো না। দ্বিতীয় লগ্নও যখন উত্তীর্ণ প্রায় অথচ বরের দেখা নেই, তখন পাত্রের বাড়ি লোক ছুটলো এবং ফিরে এলো এক মহা দুঃসংবাদ বহন করে। সে সংবাদে জানা গেল—অজ্ঞাত কোনো কারণে পাত্র পলাতক। বহু অনুসন্ধানেও তার সন্ধান পাওয়া যায়নি।

জানকীনাথ স্থির হ'য়ে শুনলেন সব। তাঁর ভুরু দুটো কুঁচকে গেল, সুগৌর প্রশান্ত আননে একটা চিন্তার কৃষ্ণ ছায়া নেমে এলো। চারিদিকে মৃদু গুঞ্জন ধ্বনিত হ'য়ে উঠলো—উপায়?

সহসা কী ভেবে জানকীনাথের মুখ প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠলো। তিনি সোজা হ'য়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং কাউকে কিছু প্রশ্ন করার অবকাশ না দিয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন।

রাত তখন প্রায় দুটো। জমিদার বাড়ি নিসুতি। কেবল বার-মহলে একটি ঘরে তখনো উজ্জ্বল বাতি জ্বলছে। রাস্তার দিকেই সে ঘর। সামনের লোহার রেলিং ঘেরা ফুলের বাগানটা পেরুলেই সেই ঘরের নিচে গিয়ে দাঁড়ানো যায়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকেই জমিদারবাবু এই ঘরে আস্তানা পেতেছেন—অন্দর পরিত্যাগ ক'রে। গভীর রাত্রি পর্যন্ত এই ঘরে তিনি জমিদারির খাতাপত্র দেখা শোনা করেন, কখনো বা বসে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন। সেদিনও তাই করছিলেন, আর মাঝে মাঝে জানকীনাথের কথা চিন্তা করছিলেন। বসুমতীর বিবাহে জানকীনাথ সসংকোচে তাকেও নিমন্ত্রণ করেছিলেন। যাবার ইচ্ছাও ছিল তাঁর শুধু অভিমান করেই যাননি। অভিমান এই কারণে যে, এই বিবাহে ব্রাহ্মণকে কিছু সাহায্য করার অভিলাষ ছিল তাঁর—ইচ্ছা ছিল নিজেই এই বিবাহের সমুদয় ব্যয় বহন করবেন। কিন্তু সে ইচ্ছা তাঁর ফলবতী হয়নি। ব্রাহ্মণ তাঁর কাছে কোন রকম সাহায্য নিতে রাজী হননি। বলেছিলেন: যতোদিন শরীরে আমার সামর্থ্য আছে ততোদিন আমায় কোনো রকম সাহায্য নিতে বাধ্য ক'রো না মহেশ্বর। একমাত্র ঈশ্বরের দান ব্যতীত অন্য কারো দেওয়া কোনো বস্তু আমি গ্রহণ করি না—আমার প্রয়োজনও হয় না। তিনিই আমায় দরিদ্র ক'রে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন—এই দারিদ্র্যই আমি পূর্ণভাবে ভোগ ক'রে যেতে চাই। আমার দুঃখ মোচন করার ছলে আমায় অপমান ক'রো না। আমি দান গ্রহণ করি না।—একটু থেমে বলেছিলেন: তবে হ্যাঁ, যদি কোনোদিন প্রয়োজন বোধ করি—একমাত্র তোমারই কাছে আমি হাত পাতবো।—এইটুকু আজ আমি তোমায় জানিয়ে রাখলুম।

জমিদার মহেশ্বর ঘোষাল কি যেন একটা বলতে চেয়েছিলেন সে কথার উত্তরে কিন্তু পণ্ডিত জানকীনাথ বাধা দিয়ে বলেছিলেন: আমাকে বোঝাবার চেষ্টা ক'রে কোনো লাভ নেই বাবা! আমি বুঝতে পেরেছি তুমি কি বলতে চাও। হ্যাঁ, দান করা ভালো,

কিন্তু অনিচ্ছুককে জোর ক'রে দান গ্রহণে বাধ্য করা দাতার দাম্ভিকতা।

এর পর আর কোনো কথা বলেন নি মহেশ্বর ঘোষাল। বসুমতীর বিবাহ সভায়ও যান নি। যান নি অভিমান ক'রেই। এমন কি সামাজিক নিয়মে কোনোরূপ যৌতুক'ও পাঠান নি। জানকীনাথের অতোটা অহংকার তাঁর ভালো লাগে নি।

গভীর রাত্রে নির্জন ঘরের মধ্যে চোখের সামনে খোলা ভাগবত-গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে বসে বসে ভাবছিলেন মহেশ্বর। ভাবছিলেন গর্বিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জানকীনাথেরই কথা। সহসা মনে হ'ল, কাজটা হয়তো তিনি ভালো করলেন না। নিমন্ত্রণ যখন গ্রহণ করেছিলেন তখন সামাজিক বিধানে কিছু যৌতুক পাঠানো উচিত ছিল। এটা তাঁর দিক থেকে মারাত্মক ত্রুটি হ'য়ে গেছে। এই সঙ্গে আজ অনেকদিন পরে তাঁর পরলোকগতা পত্নীর কথা মনে পড়লো। আজ যদি তিনি জীবিত থাকতেন তাহলে এতো বড় সামাজিক ত্রুটি কখনোই ঘটতো না তাঁর।

দেউড়ির পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে দুটো বেজে গেল। একটু নড়ে বসলেন মহেশ্বর। একটা দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ ক'রে খোলা বইখানা মুড়ে ফেললেন। আলোটা নিবিয়ে এবার শুয়ে পড়বেন—অনেক রাত হ'য়ে গেছে।

—মহেশ্বর!

কম্পিত গম্ভীর স্বরের একটা আহ্বান ঠিক এই সময় তাঁর কানে এসে সজোরে আঘাত করল। চমকে উঠলেন তিনি। পরিচিত স্বর, কিন্তু এমন সময়—

—জেগে আছ? মহেশ্বর!

পুনরায় চমকে উঠলেন তিনি।—না, ভুল তো হয়নি তাঁর শোনার—পণ্ডিতমশায়ের গলাই তো এ!

ত্রস্তে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। স্খলিত কণ্ঠে বলে উঠলেন:

আছি—জেগে আছি।—বলতে বলতে এগিয়ে গেলেন জানলার দিকে।

তাঁর ঘরের কড়ি কাঠে টাঙান ঝাড়ের উজ্জ্বল আলো জানলা ভেদ ক'রে নিচের বাগানে ছড়িয়ে পড়েছে খানিকটা, অন্ধকার সেখানে পাতলা হ'য়ে গেছে। সেই আলো আঁধারের মাঝে যে মূর্তিটি নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছেন তাঁকে চিনতে মুহূর্ত বিলম্ব হ'ল না জমিদারবাবুর। সবিস্ময়ে বলে উঠলেন: এ কি! পণ্ডিতমশাই—আপনি! কি ব্যাপার?

—আছে। একবার তুমি নিচে এসো বাবা কষ্ট ক'রে।

—এখুনি যাচ্ছি। কি আশ্চর্য! এতো রাত্রে—

এক রকম প্রায় ছুটতে ছুটতেই নিচে নেমে এলেন মহেশ্বর। পাহারাদার সিপাইটা একটা টুলে বসে দেউড়ির দরজায় ঠেস দিয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল, প্রভুর চটি জুতার শব্দে ধড় মড় ক'রে উঠে পড়ে সেলাম বাজাতে গেল, এবং তার শঙ্কিত ব্যস্ততায় টুলের পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা গাদা বন্দুকটা হাত লেগে সশব্দে পড়ে গেল। প্রভু একবার ভ্রূকুটি করলেন অপ্রস্তুত সিপাইর দিকে তাকিয়ে। তারপর দরজা মুক্ত করার ইঙ্গিত করলেন।

জানকীনাথ একই স্থানে একই ভাবে তখনো দাঁড়িয়ে। মহেশ্বর শশব্যস্তে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

—কি হয়েছে পণ্ডিতমশাই?

—তোমার অভিশাপ লেগেছে।

ম্লান একটু হাসি ফুটে উঠলো জানকীনাথের মুখে এবং মিলিয়েও গেল পরমুহূর্তে। তিনি মহেশ্বরের একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন: তুমি আমাকে সাহায্য করতে চাও মহেশ্বর?

মহাবিস্ময়ে মহেশ্বর তাঁর দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে জানালেন—চাই।

—যে কোন রকম সাহায্য চাইবো—পাবো তো ?

বিস্মিত মহেশ্বর আরো বিস্মিত হলেন। আস্তে আস্তে বললেন ঃ কিন্তু আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না পণ্ডিতমশাই ! হঠাৎ—

—বুঝিয়ে বলছি।—জানকীনাথ বললেন ঃ আগে বলো—যা সাহায্য চাইবো পাবো তো ?

—পাবেন বইকি। কারণ. আমি জানি, আপনি এমন কিছু চাইবেন না যা আমার পক্ষে ক্ষতিকর। বলুন, আমি কি সাহায্য করতে পারি আপনাকে ?

একটু ইতস্তত করলেন জানকীনাথ। তারপর বললেন ঃ আমার বসুমতীকে গ্রহণ ক'রে আমার সম্মান রক্ষা করো—

—বসুমতীকে গ্রহণ ক'রে ?—আকাশ থেকে পড়লেন মহেশ্বর। —সে কি ? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

—এখনো বুঝতে পারছ না ! একমাত্র তোমরা ছাড়া এদিকে আর আমাদের পালটি ঘর তো নেই বাবা।

তথাপি আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইলেন তিনি ব্রাহ্মণের দিকে। ভালো ক'রে কিছুই বুঝতে পারছিলেন না মহেশ্বর। সমস্ত কিছুই যেন মাথার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। অথচ এ যে তামাসা নয় তাও বুঝছিলেন মনে মনে। কিছুক্ষণ কোনো কথাই তিনি বলতে পারলেন না—পৃথিবীর যাবতীয় বিস্ময় চোখ দুটোর মধ্যে জড়ো ক'রে তিনি তাকিয়ে রইলেন পণ্ডিতমশাইয়ের দিকে ! তারপর তেমনি বিস্ময়ের সঙ্গে আস্তে আস্তে বললেন ঃ কিন্তু বসুমতী—বসুমতীর তো আজ বিবাহ—

—না। সেখানে বসুমতীর বিবাহ হ'ল না। পাত্রের যে কারণেই হোক এ বিবাহে মত নেই, তাই আত্মগোপন করেছে। অথচ আজ রাত্রে বিবাহ না দিতে পারলে বসুমতীর বিবাহ হয়তো আর সম্ভব হবে না। অন্তত সামাজিক বিধান অনুসারে সম্ভব হবে না। আমিও সমাজে সম্ভ্রম হারিয়ে গ্রামে আর বাস করতে পারবো

না। যদি আজ রাত্রি সাড়ে তিনটার লগ্নে বসুমতীকে পাত্রস্থা করতে পারি তো ভালো, নচেৎ প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে আমাকে গ্রাম ত্যাগ করতে হবে। এ মুখ আর কাউকে দেখাতে পারবো না। মহেশ্বরের হাতখানায় একটা ঝাঁকানি দিকে জানকীনাথ বললেন: বহুবার তুমি আমায় সাহায্য করতে চেয়েছ—আমি নিইনি। আজ আমি নিজেই যেচে তোমার কাছে সাহায্য ভিক্ষা করতে এসেছি। এখন সাহায্য করা না করা তোমার অভিরুচি।

মুহূর্তকাল কি যেন চিন্তা ক'রে নিলেন মহেশ্বর। সমস্ত অতীত জীবনটার প্রতি একবার মানস-দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। তারপর আর কিছুমাত্র চিন্তা না ক'রে সহসা আনত হ'য়ে জানকীনাথের পদধূলি গ্রহণ করলেন।

—আপনার আদেশই শিরোধার্য। চলুন, আর সময় বোধ হয় বেশি নেই।

পরদিন প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই কথাটা গ্রামে প্রচার হ'য়ে পড়লো। প্রচার হ'য়ে পড়লো অনন্যোপায় কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের প্রতি জমিদারের অনুকম্পার নানা কাহিনী—জমিদারের হৃদয়বত্তার কথা। কেউ কেউ এই ঘটনার পশ্চাতে কোনো গোপন রহস্য আছে বলেও অনুমান করলে। আবার কেউ কেউ প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার বাহাদুরের এই বিরাট মহত্বে শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে মনে মনে বললে: হ্যাঁ, প্রাণ বটে!

বসুমতী নববধূরূপে জমিদার গৃহে প্রবেশ করলেন। কোনো উৎসব নেই, কোনো আড়ম্বর নেই, কোনো আয়োজন নেই। পূর্বাহ্নে সংবাদ পেয়ে জমিদার বাড়ির আশ্রিতা আত্মীয়ারা অতি সামান্য আয়োজন করতে সক্ষম হয়েছিলেন বধূবরণের; তারই দ্বারা বধূবরণ ক'রে ঘরে তুললেন তাঁরা এবং বধূর কোলে তুলে দিলেন জমিদারের চার বছরের মাতৃহারা শিশুপুত্র গৌরীশংকরকে। একজন

প্রৌঢ়া নববধূর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চাপা গলায় বললেনঃ বউ, এইটি তোমার ছেলে। মা-হারা আজ আবার মা পেলে। একে নাও।

প্রগাঢ় স্নেহে ছেলেটিকে বুকের মধ্যে সজোরে আঁকড়ে ধরলেন বসুমতী। বুকের ভেতরটা কেমন যেন ক'য়ে উঠলো তাঁর। ছেলেটা চোখ দুটোর মধ্যে বিশ্বের বিস্ময় আর অব্যক্ত জিজ্ঞাসা নিয়ে চেয়ে রইলো তাঁর দিকে। অপরিচিতার স্নেহ-নিষ্পেষণে নিজেকে পীড়িত বোধ করলেও কাঁদতে পারলে না সে—যেন ক্ষণকালের জন্যে ভুলেই গেল কাঁদতে।

বসুমতীও অবাক চোখে স্বল্পকাল শিশুর সেই সুন্দর কচি মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ আত্মবিস্মৃত হ'য়ে পড়লেন। ভুলে গেলেন স্থান কাল, ভুলে গেলেন তাঁর বর্তমান অবস্থা। আরো জোরে শিশুকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে চুম্বনে চুম্বনে অস্থির ক'রে তুললেন তাকে। শুধু এতেই ক্ষান্ত হলেন না—সেই প্রথম দিনেই শিশুর সমস্ত ভার নিজের হাতে তুলে নিলেন মাতার অধিকারে।

পরিজনেরা অন্তরালে ব্যঙ্গ করলেনঃ ঢং দেখে আর বাঁচি না। নতুন বউ নতুন বউয়ের মতো থাক। তা নয়—সতিন-পো নিয়ে কচ্ছে দেখ না কাণ্ডটা।...

—টোলো পণ্ডিতের বিদ্যেধরী ধিঙ্গী মেয়ে—ওর ধরনই আলাদা!...

—সতিন-পোর ওপর এমনটা চিরকাল থাকলে বাঁচি। দেখলুম তো অনেক—নিজের পেটের একটা দুটো হলেই তখন আবার নিজমূর্তি ধরবেন।...

ফুলশয্যার রাত্রিতে জমিদারবাবু সনিশ্বাসে বললেনঃ বসুমতি, বিয়ে করার আর ইচ্ছা ছিল না আমার; কিন্তু আমার ইচ্ছার ওপরও একজনের ইচ্ছা আছে; যেজন্যে অভাবনীয় ভাবেই আমি বাধ্য হলুম তোমায় বিয়ে করতে। এখন মনে হচ্ছে, মঙ্গলময় আমার মঙ্গল

বিধানই করেছেন। তুমি বুদ্ধিমতী, পণ্ডিতমশাই তোমায় শিক্ষাও দিয়েছেন যথেষ্ট—তোমায় বিশেষ কিছু বলার আবশ্যক নেই। তবুও বলছি, তোমার সংসার তুমি বুঝে নিও। গৌরীকেও আজ থেকে আমি তোমায় দিলাম। তুমি গৌরীর মা এই কথাটা সব সময় মনে রেখো।—

আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন তিনি কিন্তু স্তব্ধ হ'য়ে গেলেন বসুমতীর দিকে তাকিয়ে। পুষ্পশোভিত পালংকের শুভ্র প্রশস্ত শয্যার একান্তে আনত মুখে বসেছিলেন বসুমতী, তাঁর ক্রোড়ে অঞ্চলাচ্ছাদিত গৌরী নিদ্রামগ্ন। মহেশ্বর মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন। কক্ষের সেই অনুজ্জ্বল দীপালোকেও তিনি স্পষ্ট দেখলেন—বসুমতীর মুখে মাতৃত্বের অপূর্ব ব্যঞ্জনা। মনে পড়ে গেল তাঁর তিন বৎসর পূর্বেকার হারানো একটি মুখ। সে মুখেও তিনি ঠিক এমনি মাতৃত্ব ফুটে উঠতে দেখেছিলেন। এই পালংকের পরে গৌরীকে নিয়ে সেও ঠিক এমনি ক'রেই বসে থাকতো। একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন ক'রে তিনি বললেন ঃ যাক, গৌরীর সম্বন্ধে আজ থেকে আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

বসুমতী গৌরীকে সযত্নে শয্যায় শুইয়ে দিয়ে পালংক থেকে নেমে এলেন। নেমে এসে অদূরের একখানা চেয়ারে উপবিষ্ট স্বামীকে আভূমি আনত হ'য়ে প্রণাম করলেন।

তারপর বহু বর্ষ অতীত হয়েছে—দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরকে পিছনে ফেলে কাল এগিয়ে এসেছে। কিন্তু সেদিনের সেই নিশ্চিন্ততা আজও অটুট হ'য়ে আছে জমিদারবাবুর মনে। যদিও ইতিমধ্যে পর পর পাঁচটি সন্তান বসুমতীর গর্ভে স্থান লাভ করেছে এবং তার মধ্যে পুত্র ভবানীশংকর ও কন্যা উমারাণী ব্যতীত তিনটি গতাসু। তথাপি, সপত্নী পুত্র গৌরীশংকরের প্রতি স্নেহ তাঁর এতোটুকু মলিন হয়নি। বরং বেড়েই এসেছে দিন দিন। এমন কি আপন গর্ভস্থ

সন্তান অপেক্ষা গৌরীই তাঁর বেশি আপন—বেশি আদরের। গৌরীও নিজে ভাবতে পারে না যে, এই মা তার নিজের মা নয়—বিমাতা। ভাবতে পারে না, ভবানী তার সহোদর নয়।

ব্যবহারটা বসুমতী দেবীর প্রকৃতই অদ্ভুত—গৌরীর প্রতি তাঁর ব্যবহার ঠিক আপন সন্তানের মতো এবং ভবানী ও উমার প্রতি ঠিক যেন সপত্নী সন্তান তুল্য। এমনটা সচরাচর দেখা যায় না।

বসুমতী দেবী বলেনঃ গৌরীই আমার পেটের ছেলে আর ভবানীটাকে আমি মানুষ করেছি মাত্র। নইলে আমার পেটে কি আর অমন অবাধ্য মন্দ ছেলে জন্মায়! ওতো ছেলে নয়, বংশের কলংক!

এ বিষয়ে জমিদারবাবুর মতও ভিন্ন নয়। ভবানীশংকরের নামে আগুন হ'য়ে ওঠেন তিনি যেন। তাঁর বিশ্বাস ভবানী হ'তেই বংশের সুনাম নষ্ট হবে এবং ভবিষ্যতে জমিদারিও থাকে কি না সন্দেহ। তিনি যেন দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছেন, তাঁর পিতৃ-পিতামহের জমিদারীর ভবিষ্যৎ দুরবস্থা। দেখতে পাচ্ছেন—আস্তে আস্তে যেন এই সমুদয় সম্পত্তি ভবানীর স্কন্ধে ভর ক'রে ক্লেদ পঙ্কিল নরকের পথে অন্তর্হিত হচ্ছে ধীরে ধীরে। অন্তর্হিত হচ্ছে তাঁর পুণ্যের ধনসম্পদ পাপের হাটে বাটে।—ভবানীর প্রতি কোন আস্থাই নেই তাঁর। ভবানী দুশ্চরিত্র কুলাঙ্গার। এখন মাঝে মাঝে অনুতাপ করেন—কেন তিনি দ্বারপরিগ্রহ করলেন আবার। যদি না করতেন তাহলে তো এমন লক্ষীছাড়া ছেলের পিতা হ'তে হ'তো না তাঁকে! কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার মনে হয়—যদি বিবাহ আর না করতেন তাহলে এমন সহধর্মিণী পেতেন কি ক'রে? কি ক'রে পেতেন এমন সর্ব-বিষয়ের সুপরামর্শ-দাত্রী জায়া—এমন বুদ্ধিমতী স্নেহ-ভক্তি-সেবাপরায়ণা গৃহিণী? মাতৃহারা গৌরী তাহলে মা পেতো কেমন ক'রে? কিন্তু এমন মায়ের গর্ভে ভবানীর মতো সন্তানের জন্ম কি ক'রে সম্ভব হ'ল? যেদিকেই কান পাতা যায়—ভবানীর কুৎসা, ভবানীর চরিত্রের আলোচনা! গ্রামের বাড়িতে ভবানী থাকে না,

থাকে কলকাতার বাসায়। সেখানে থেকে নাকি কলেজে পড়াশোনা করে। অন্ততঃ তার মুখে এইটাই শোনা যায়। বাড়িতে কদাচিৎ আসে এবং দু'একদিন থেকে কিছু অর্থাদি সংগ্রহ ক'রে পুনরায় কলকাতায় চলে যায়।

কিন্তু ভবানী চিরকাল ঠিক এমনি উচ্ছৃঙ্খল ছিল না। লেখাপড়াতে বেশ ভালো ছেলেই ছিল। গৌরীশংকর লেখাপাড়ায় পাল্লা দিতে পারতো না তার সঙ্গে। যদিও বয়সের অনেকখানি পার্থক্য ছিল তাদের। প্রবেশিকা পর্যন্ত এগুতে পারেনি গৌরী। তখন মহেশ্বর বড় ছেলে গৌরীর প্রতিই বিরক্ত ছিলেন। ভবানী অনায়াসে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল এবং উচ্চশিক্ষার জন্যে কলকাতায় গিয়ে কলেজে ভর্তি হ'ল। আর গৌরী লাগলো জমিদারি দেখাশোনার কাজে বাপের সহায়তা করতে। বাড়ির সকলেরই আশা ছিল—ভবানী পণ্ডিত হবে, লেখাপড়ায় সে জমিদার-বংশের সুনাম বৃদ্ধি করবে।

কলেজে ভর্তি হবার পর কিছুদিন বেশ পড়াশুনাও করছিল ভবানী। সুশীল সুবোধ সে কোনোকালেই ছিল না। গ্রামে থেকে ইস্কুলে যখন পড়তো তখনো মাঝে মাঝে তার নানা উৎপাতে বাড়ির লোক এবং প্রতিবেশিরা অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠতেন। ছেলেবেলা থেকেই তার একটা প্রচণ্ড নেশা ছিল—থিয়েটারের। থিয়েটার করার এবং দেখার। কোথাও থিয়েটার বা যাত্রা হচ্ছে জানতে পারলেই সেখানে তার যাওয়া চাই। যেমন ক'রে হোক যাবেই। সমস্ত বাধা সমস্ত শাসন তুচ্ছ ক'রে সে যাবেই। কেউ তাকে আটকাতে পারবে না। তারপর সেই অভিনয় দেখে এসে নিজের বুদ্ধি এবং সামর্থ্য মতো কোনো এক বিশেষ ভূমিকার রূপ দেবার চেষ্টা করবে। তা সে যেখানেই হোক আর যেমন ভাবেই হোক! কাপড়ের সীন তৈরি ক'রে হয়তো ছাদের ওপরেই কিংবা বাগানের মধ্যে সাঙ্গ-পাঙ্গ জোগাড় ক'রে অভিনয় শুরু ক'রে দিলে। হয়তো কোনো এক

স্থানে যাত্রার আসর বসে গেল। তারপর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ের সীনের পরিবর্তে সত্যিকার সীন আমদানী করতে আরম্ভ করলে। বাঁকারীর তরোয়াল ছেড়ে ভাড়া করা টিনের তরোয়াল আর সাজ-পোশাক আনাতে লাগলো। সত্যিকারের থিয়েটার যাত্রা শুরু করলে। প্রায়ই গ্রামের ছেলেদের নিয়ে সে এখানে ওখানে থিয়েটার করে বেড়াতো। লেখাপড়ার চেয়ে এইদিকেই তার ঝোঁক ছিল বেশি। এজন্যে বাপ-মায়ের আর ইস্কুলে মাস্টারদের অনেক শাসন পরিপাক করতে হয়েছে তাকে। তবু এই বাতিক পরিত্যাগ করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারে সকলেই প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন বড় হ'লে, একটু বেশি লেখাপড়া শিখলে এ নেশা আর থাকবে না। আর তা ছাড়া থিয়েটারই করুক আর যাই করুক, লেখাপড়ায় তো মন্দ নয় সে। পাসও বছর বছর করে। কাজেই ওটাতে কেউ শেষ পর্যন্ত আর তেমন গুরুত্ব দিলেন না। ম্যাট্রিক পাস করার পর তাকে কলকাতায় পড়তে পাঠিয়ে বাপ-মা অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন। ভাবলেন, গ্রামের সঙ্গী-সাথীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে এবার ওই বদ ঝোঁকটা হয়তো কেটে যাবে তার। কিন্তু বছর খানেক যেতে না যেতে সংবাদ পেলেন—সেখানেও একটা বেশ দল পাকিয়ে তুলেছে সে। আরো কিছুদিন পরে সংবাদ পেলেন—তার চরিত্রও নাকি ক্রমশঃ অবনতির দিকে চলেছে। সেই সঙ্গে যখন তখন তার কাছ থেকে টাকার তাগিদও আসতে লাগলো। বাপ-মা উভয়েই ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। ভেবে পেলেন না ছেলের সম্বন্ধে কি করা কর্তব্য। ইতিমধ্যে আই. এ. পরীক্ষা হ'য়ে গেল এবং ফলাফলও প্রকাশিত হ'ল। জানা গেল ভবানী কোনো রকমে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

এই সময় কিছুদিন এসে এক টানা গ্রামের বাড়িতে ছিল ভবানী। এই থাকার হেতু অন্য কিছু নয়—কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ। বাপ-মা ছেলের মতিগতি ভালো হচ্ছে অনুমান ক'রে পুলকিত হলেন।

দেখলেন ছেলে বেশ শান্ত-শিষ্ট ভাবে নিয়ম মতো খাচ্ছে-দাচ্ছে-বেড়াচ্ছে লেখাপড়া করছে। পাড়ার সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গেও বেশি মাখামাখি করে না। এ ভবানী যেন সে ভবানী নয়।

কলেজের ছুটির দিন সংক্ষেপ হ'য়ে আসছে। এবার সে বি. এ. পড়বে। তারপর মহেশ্বরবাবুর ইচ্ছা তাকে আইন পড়াবেন। কিন্তু তার আগে আরো একটা বিশেষ কিছু করার ইচ্ছা হ'ল তাঁর। গৃহিণী বসুমতী দেবীও সে ইচ্ছায় সায় দিলেন। ইচ্ছাটা অন্য কিছু নয়, এই অবসরে ভবানীর বিবাহ দিয়ে দেওয়া। তাহলে বাড়ির প্রতি একটা সাধারণ আকর্ষণ তার থাকবেই এবং হয়তো মন্দ কিছু আর তাহলে করতে পারবে না তারপর। অন্ততঃ বাপ-মা এইরূপ আশাই যেন করলেন।

খবরটা শুনে ভবানী বিশেষ আপত্তি করলে না। মন্দ কি? একটা নতুন অভিজ্ঞতা। একবার মাত্র গাঁইগুঁই করেছিলঃ এখন আবার ওসব কেন—বি. এ.টা পাস করি—আর তা ছাড়া বিয়ে করার আমার মোটেই ইচ্ছা নেই।

পিতা উত্তরে বলেছিলেনঃ তোমার ইচ্ছা অনিচ্ছা নিয়ে তো আমরা চলবো না।

এরপর আর কোনো আপত্তি করেনি ভবানী।

বিবাহ হ'য়ে গেল তার এক শুভদিনে রাধানগরের আদালতের বিখ্যাত আইনজীবী রামেশ্বর চক্রবর্তীর একমাত্র সন্তান, একমাত্র কন্যা অনুরাধার সঙ্গে। এরই বৎসর দুই পূর্বে গৌরীশংকরের বিবাহও সমাধা হ'য়ে গেছে।

বিবাহের পর কিছুকাল পর্যন্ত ভবানী বেশ ভালো ছেলে হ'য়েই ছিল কলকাতার বাসায় থেকে কলেজে পড়তো, ছুটি ছাটায় নিয়মিত বাড়ি আসতো যেতো। কোনোরূপ দুষ্টবুদ্ধিই দেখা যায়নি তার—কোনো মন্দ কাজের খবরও পাওয়া যায় নি। দেখতে দেখতে

বি. এ. পরীক্ষা এলো এবং একদিন শেষও হ'য়ে গেল। কিন্তু ফলাফল প্রকাশ হ'তে দেখা গেল—দুর্ভাগ্যবশতঃ ভবানী ফেল করেছে। ফেল করাটা দুঃখের হ'লেও ছাত্রের পক্ষে গুরুতর অপরাধ নয়। শ্বশুর মহাশয় এর জন্যে মন খারাপ না ক'রে পুনরায় পরীক্ষা দেবার জন্যে প্রস্তুত হ'তে জামাতাকে লিখলেন। লিখলেন ঃ ফেল তুমি একা করনি, অনেকেই ক'রে থাকে। সেজন্যে লজ্জার বিশেষ কারণ নেই—পত্রপাঠ বাড়ি এসো। তোমার পিতামাতা তোমার জন্যে উদ্বিগ্ন আছেন।

পিতাও তাকে বাড়ি আসতে লিখলেন।

পরীক্ষার মাস কয়েক আগে থেকেই ভবানী পড়ার অজুহাতে গ্রামের বাড়িতে আসা বন্ধ করেছিল। পরীক্ষার পরেও এলো না—পত্রের পর পত্র দিয়েও কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। এমন সময় সংবাদ পাওয়া গেল সে ফেল হয়েছে। তা হোক! তবুও তাকে সাদরে বাড়ি আসতে পত্র লিখলেন বাপ, লিখলেন শ্বশুর এবং আর লিখলে—অনুরাধা। কিন্তু সবই বৃথা! ভবানী আসা তো দূরের কথা—একছত্র পত্রের জবাবও পাঠালে না। তখন একরকম অনুরাধার মুখ চেয়েই এবং গৌরীশংকরের আগ্রহাতিশয্যে কলকাতার বাসায় লোক পাঠানো হ'ল।

সপ্তাহ খানেক পরে সেই লোক ফিরে এসে যে সংবাদ দিলে তা যেমনই অপ্রত্যাশিত তেমনই লজ্জাকর। পিতা মহেশ্বর ঘোষাল দিব্যদৃষ্টিতে যেন দেখতে পেলেন—তাঁর গুণধর পুত্র ভবানী নরকের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেছে আর যেন শুনতে পেলেন তাঁর ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষ মহাতঙ্কে অন্তরীক্ষে চিৎকার করছেন!

শোনা গেল—ভবানী আজকাল বাসায় বড় একটা থাকে না। কোথায় নাকি একটা থিয়েটার কোম্পানি খুলেছে সে—সেইখানেই থাকে। নারী-পুরুষ মিলে থিয়েটার করে। সমাজ পরিত্যক্তা নারী পরিবেষ্টিত হ'য়ে দিনরাত থাকে। লেখাপড়া প্রভৃতি ছুল তার, বি. এ. পরীক্ষাও দেয়নি সে।

ভবানীর পক্ষে এমন কাজ অসম্ভব নয় মনে মনে সেটা মহেশ্বরবাবু বুঝলেন, বুঝেও তিনি আরো অনুসন্ধানের জন্যে দেওয়ান ত্রিলোচনকে কলকাতায় পাঠালেন। ত্রিলোচনকে পাঠালেন ঠিক নয়—ত্রিলোচন নিজেই গেলেন। তিনি দীর্ঘদিন এই জমিদারীর দেওয়ানী পদে অধিষ্ঠিত আছেন। বর্তমান জমিদার মহেশ্বরের পিতার আমলের লোক তিনি। অত্যন্ত বিশ্বাসী এবং দীর্ঘদিনের মেলামেশায় এই পরিবারের আত্মীয়ের শামিলই হ'য়ে পড়েছেন। কিন্তু তিনিও বিষন্নমুখে ফিরে এলেন কলকাতা থেকে—ফিরে এলেন অনুরূপ সংবাদ নিয়েই।

জমিদার হুংকার দিয়ে উঠলেনঃ ওকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করবো। ও আমার বংশের কলঙ্ক।—

বসুমতী দেবী দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধরলেন—এমন ছেলেও গর্ভে ধারণ করেছেন তিনি।—ছিঃ!

রামেশ্বর চক্রবর্তী সমস্ত ঘটনা নীরবে শুনে গেলেন—কোন মন্তব্য করলেন না। ভুরু দুটো শুধু কুঁচকে গেল তাঁর একবার—মুখখানা অস্বাভাবিক গম্ভীর হ'য়ে গেল। অনুরাধা গোপনে অশ্রু বিঃ করতে লাগলো। আর ধিক্কার দিতে লাগলো নিজেরই অদৃষ্টকে।

এই ভাবেই বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হ'ল—প্রায় বছর দুই। ভবানীর কোনো সংবাদ নেই। তার সংবাদ জানবার জন্যেও কেউ ব্যগ্র নয় জমিদার বাড়িতে—এমনই একটা ভাব যেন সকলের মুখে। জমিদারবাবুর কাছে তার নাম উচ্চারণ করবার উপায় নেই—ক্ষেপে যাবেন। বসুমতী দেবীরও সেই ভাব; তবে অনুরাধার মুখের দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে তাঁকে তার কথা ভাবতে হয়।

রামেশ্বরবাবু কিন্তু নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। একমাত্র কন্যার অশ্রু-সজল বিষন্ন মুখখানি তাঁকে চুপ ক'রে থাকতে দেয়নি। ইতিমধ্যে বার কয়েক নিজে কলকাতায় গিয়ে তিনি ভবানীর অনুসন্ধান করেছেন—দেখা পাননি তার। লোক পাঠিয়েছেন তারাও বিফল মনোরথ হ'য়ে ফিরে এসেছে।

কলকাতায় জমিদার মহেশ্বর ঘোষালের যে বাড়িখানি আছে এবং যেখানে থেকে ভবানী কলেজে পড়াশুনা করতো সেখানে আর সে থাকে না। কোথায় আছে তাও কেউ জানে না। লেখাপড়া ও খাওয়া পরার খরচা বাবদ বাড়ি থেকে মাসে মাসে যে টাকা আসতো তাও জমিদারবাবুর নির্দেশক্রমে অনেকদিন বন্ধ হ'য়ে গেছে। উপস্থিত তার খরচাপত্র কি ক'রে চলছে? কোথায় এবং কী ভাবে আছে? সে-সব নিয়ে আর জমিদার বাড়ির কেউ মাথা ঘামায় না। পিতা-মাতা উভয়েই প্রতিজ্ঞা করেছেন—এ সম্পত্তির কানাকড়িও তাকে দিয়ে যাবেন না—এ সমস্তই গৌরীশংকরের আর ছোট বউ অনুরাধার। এই মর্মে ইচ্ছাপত্রও হ'য়ে গেছে।

জমিদার ভবনের সকলেরই মনের ভাব যখন ভবানীর বিপক্ষে—এমন কি তাকে মনে রাখতেও কেউ চায় না, ঠিক সেই সময়ে একদিন অকস্মাৎ একখানি পত্র এলো। এলো গৌরীশংকরের নামে। পত্রের লেখক-গৌরীশংকরের দূর সম্পর্কের এক মাসতুতো ভাই অশোক রায়। অশোকরা কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা। অবস্থা অতি সাধারণ। স্বভাব চরিত্র যতোদূর জানা আছে মোটামুটি মন্দ নয়। ভবানীর পরম বন্ধু সে। বহুবার রাধানগরে এসেছে এবং সেই আসা যাওয়ার ফলে ভবানীর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়।

সে লিখেছেঃ ভবানী অত্যন্ত পীড়িত—হাসপাতালে আছে। কি হয় না হয় কিছুই বলা যায় না। যদি দেখতে চাও সত্বর এসো।

মহেশ্বরবাবু পত্রের মর্ম অবগত হ'য়ে ভুরু কোঁচকালেন। গুম হ'য়ে খানিক কি চিন্তা করলেন। পরে একটা নিশ্বাস পরিত্যাগ ক'রে বললেনঃ যা বোঝো করো। আমার মনে ও'ছেলে অনেকদিন মরে গেছে।

বসুমতী একবার একটু চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিলেন। তারপর গম্ভীর ভাবে মন্তব্য করলেনঃ ওর সম্বন্ধে আমার কোনো ঔৎসুক্য নেই। ওর কথা আমার কাছে তোমরা বলো না বলেই চলে যাচ্ছিলেন.

হঠাৎ কি ভেবে আবার ফিরে দাঁড়ালেন: হ্যাঁ, আর দেখো, ছোট বৌমা যেন এ বিষয়ে কিছু না শুনতে পান। উমাকেও কিছু বলে কাজ নেই।

পিতা মাতার মতো নিশ্চেষ্ট হ'য়ে গৌরী কিন্তু থাকতে পারলে না। সেই দিনই গোমস্তা করালীচরণকে নিয়ে সে কলকাতায় রওনা হ'ল এবং মাস খানেক পরে ফিরে এলো একেবারে ভবানীকে সঙ্গে ক'রে। অশোকও সেই সঙ্গে এলো।

এখনো ভালো ক'রে সারেনি ভবানী। খুব কঠিন অসুখই তার—বাঁচবার কোনো আশাই ছিল না। একমাত্র অশোকের জন্যেই এ যাত্রা প্রাণ পেয়েছে সে। অতো সুন্দর চেহারাটা কি বিশ্রী হ'য়ে গেছে—যেন আগুনে ঝল্‌সে দিয়েছে কে। মুখের দিকে তাকান যায় না। দেহের হাড়গুলো চামড়া ভেদ ক'রে যেন বাইরে আসতে চাচ্ছে। সে মূর্তি দেখে পিতামাতা উভয়েই অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না।

আর অনুরাধা?

কিন্তু অনুরাধার কথা এখন নয়—অনুরাধার দুঃখের এখনো অনেক বাকী।

এতোদিন কী ভাবে কোথায় ছিল ভবানী, কী করছিল, কেমন ক'রে অসুখ করলো প্রভৃতি বহু প্রশ্নের উত্তর দিলে গৌরী এবং অশোক। বললে: থিয়েটারের রোগই ওর আসল রোগ। কেবল একটা কথা কোনো মতে প্রকাশ করলে না তারা—কেবল জানালে না, এতোদিন কি ভাবে সে চালাচ্ছিল? টাকাকড়ি পাচ্ছিল কোথা থেকে? বললে না যে এর মধ্যে রীতিমত হাজার কয়েক টাকা ঋণ ক'রে বসে আছে ভবানী। বসে আছে সুকৌশলে কলকাতার বাড়িখানি বাঁধা দিয়ে। একটা ফৌজদারী মামলায় জড়িয়ে পড়ে নিজের যথা সর্বস্ব নষ্ট ক'রে ফেলেছে সে। এমন কি ভবিষ্যতে জেল হওয়াও বৈচিত্র ছিল না তার। তার স্বভাব চরিত্রও অত্যন্ত দূষিত হ'য়ে

পড়েছে। এ সমস্ত বিষয় গোপন ক'রে গেল গৌরী। গৌরীর নির্দেশে অশোকও কিছু ভাঙেনি।

ভবানীর সমস্ত দেনা গৌরী নিজের ঘাড়ে নিয়ে—তার কোন কথা বাড়িতে প্রকাশ পাবে না আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবে তাকে রাধানগরে ফিরিয়ে আনতে পেরেছে। অবশ্য ভবানীকেও প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছে যে, আর কোনদিন সে অসৎ পথে যাবে না। গৌরীকে জিজ্ঞাসা না করে—গৌরীর অনুমতি না নিয়ে কোন কাজ করবে না। গৌরী বলেছে—যদি থিয়েটারের নেশা একান্তই সে না ছাড়তে পারে, তাহলে বাড়িতে মঞ্চ তৈরি করিয়ে দেবে, পাড়ার ভদ্র ছেলেদের নিয়ে সেখানে শখের থিয়েটার করতে পারবে সে। তার ব্যবস্থা গৌরীই করে দেবে।

বাড়ি এসে ভবানী এবার নিজেকে সংশোধন করবার চেষ্টা করতে লাগলো। তার এই অভাবনীয় পরিবর্তনে মহেশ্বর ঘোষাল ও বসুমতী দেবী মনে মনে বেশ খুশী হলেন বোঝা গেল। অনুরাধার আনন্দের সীমা নেই। কিন্তু সব চেয়ে সুখী হ'ল গৌরী। এখন বেশ স্থায়ী ভাবেই বাড়িতে আছে ভবানী। কোনো কাজে কলকাতায় কেউ যেতে বললেও রাজী হয় না। অশোক প্রায়ই এখানে আসে এবং যখনই আসে মাসাধিক বাস ক'রে যায়। অশোকের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা যেন দিন দিন বেড়ে চলেছে ভবানীর। বাড়ির সকলেও বেশ স্নেহ করেন অশোককে। বিশ্বাসও করেন।

ভবানীর স্বভাবের পরিবর্তন দেখে মহেশ্বরবাবু তাকে জমিদারি সেরেস্তার কাজকর্ম শিখতে বললেন। সেও নির্বিবাদে প্রতিদিন সেরেস্তায় গিয়ে বসতে লাগলো। যদিও ইতিপূর্বেই উইল সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার জানতে পেরেছে সে, কিন্তু তবুও কাউকে এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করেনি।

দেওয়ান ত্রিলোচন রায় জমিদারবাবুর কাছে কথাটা একবার ভয়ে ভয়ে উত্থাপন করেছিলেন। করেছিলেন তখনই যখন ভবানীকে দেখলেন বছর দেড়েক বেশ শান্ত সুবোধ হ'য়ে বাড়িতে বাস করছে এবং নিয়মিত কাজকর্ম করছে। রীতিমত সংকোচের সঙ্গেই বলেছিলেনঃ বাবু, সেই উইলটার সম্বন্ধে আর কিছু চিন্তা করলেন কি?

চমকে উঠেছিলেন যেন জমিদার।

—উইলটার সম্বন্ধে! তার কি চিন্তা করবো আবার?

—না। মানে—ছোটবাবু তো এখন—মানে ওঁর প্রতি একটু অবিচার হয় না কি?

—কিছু না, কিছু না। গম্ভীর মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে জমিদার বলেনঃ যা করবার আমি ভেবেই করেছি—তার আর কোনো পরিবর্তন নেই।

—কিন্তু—

—কোনো কিন্তু নেই এর মধ্যে ত্রিলোচন। আমার পৈতৃক বিষয় সম্পত্তিকে আমি জাহান্নামে পাঠাতে পারবো না।

পুনরায় একটু হাসলেন তিনি, অতিশয় খেদের হাসি হাসলেন। বললেনঃ আর তা ছাড়া, আমার বিশ্বাস ওর কোনো পরিবর্তনই হয়নি—হ'তে পারেও না।

—কেন?

—তা বলতে পারবো না। তবে আমার তাই অনুমান। যে পরিবর্তনটা ওর তোমরা লক্ষ্য করছো ওটা ওর মানসিক অবসাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। 'অন্তত আমার তাই ধারণা' আমার মনে হয় ওর ওই অবসাদ যে মুহূর্তে দূর হবে ও আবার সেই পূর্বের স্বভাবেই ফিরে যাবে। ও যে কতো মন্দ হ'য়ে গেছে ত্রিলোচন তা গৌরী আমাকে লুকোলেও, আমি সব জানি। আমার ছেলে ও—এই কথাটা মনে হলেই লজ্জায় যেন আমি মরে যাই। আরো কি জানো

—'ওর বিয়ে দিয়ে একটা মেয়ের জীবন আমি নষ্ট ক'রে দিয়েছি। কাজেই উইল পরিবর্তন অসম্ভব।

জমিদার মহেশ্বর ঘোষালের অনুমান যে কতো অভ্রান্ত, তার পরিচয় হাতে হাতেই পাওয়া গেল—সেবার ডাকুর বাদার শিবমেলায়।

প্রতিবৎসর শিবমেলা উপলক্ষে জমিদারবাবু নিজেই আসেন মৌগাছিতে। যেবার না পারেন গৌরীশংকর আসে। কিন্তু সেবার তার ব্যতিক্রম হ'ল। জমিদার নিজে আসতে পারলেন না—প্রায় সাত আট মাস যাবৎ কঠিন বাতব্যাধিতে তিনি শয্যাগত। আর গৌরীশংকরকে একটা জটিল মামলার তদ্বির করতে জেলার আদালতে প্রায় প্রতিদিনই যাওয়া আসা করতে হচ্ছে। তার দ্বারাও এবার মৌগাছি যাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং অনেক চিন্তার পর জমিদার শেষে ভবানীশংকরের প্রতি আদেশ জারি করলেন—মৌগাছি যাবার। সঙ্গে যাবে করালী চক্রবর্তী আর পাইক বরকন্দাজ প্রভৃতি। কয়েকদিন পূর্বেই অশোক বেড়াতে এসেছিল রাধানগরে—যেমন আসে। সে-ও ভবানীর সঙ্গী হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে। অশোক জীবনে কখনো পল্লী অঞ্চলের কোন বড়ো মেলা দেখেনি। তার মেলা দেখবার ভারী শখ। তা ছাড়া ডাকাতে-বিল নাকি একটা দর্শনীয় স্থানও বটে।

ভবানীর মৌগাছি যাবার মোটেই ইচ্ছা বা উৎসাহ ছিল না, অশোকই তাকে উৎসাহিত ক'রে তুললে শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু কে জানতো—ভবানী আর অশোকের জীবন-নাটকের একটা রহস্যজনক অঙ্ক আশু-অভিনয়ের জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে আছে ডাকুর বাদার শিবমেলায়? কে জানতো একটা বিরাট পরিবর্তনের সংকেত তাদের আহ্বান জানাচ্ছে সেখানে। একটা অনাগত

সংঘাতের সূচনা সূচিত হ'য়ে আছে সেখানের জলে স্থলে, সেখানের বায়ুস্তরে।

দিন দুই আগেই গোমস্তা করালীচরণকে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন জমিদার। প্রতি বছর তাই হয়—করালী আগে গিয়ে জমিদারের আগমন বার্তা গাঁয়ে জানিয়ে দেয়। জানিয়ে দেয় যেন যথাসময়ে প্রজারা সব খাজনাপত্র জমিদার কাছারীতে জমা দিয়ে যায়—দেখা ক'রে যায় জমিদার বাহাদুরের সঙ্গে। আর সেই সঙ্গে বাড়িঘর একটু ঝাড়ামোছা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার ব্যবস্থাও তাকে করতে হয়। এবারও তার ব্যত্যয় হ'ল না। অধিকন্তু এবার তার সঙ্গে এলো অশোক। অশোক যেন কোনো মতেই আর নিজের ঔৎসুক্য চেপে রাখতে পারছিল না। ঔৎসুক্য অন্য কিছু নয়—তার ধারণা পল্লীগ্রামের এই ধরনের মেলায় অনেক আশ্চর্য জিনিস দেখতে পাওয়া যায়। যা সচরাচর অন্যত্র দেখা যায় না।

॥ এক ॥

ডাকুর বাদার উত্তরপাড়ে এসে তাঁবু গেড়েছে একটা ভ্রাম্যমান সার্কাসের দল। ছোট দল, কিন্তু আড়ম্বর এবং আয়োজন ছোট নয়। গোটা কয়েক জীবজন্তুও আছে সেই দলে। আছে একটা জীর্ণ শীর্ণ বুড়ো নেকড়ে বাঘ, গোটা চারেক ছাগল আর একটা ভেড়া। কুকুরও পাঁচ ছটা, দুটো বানর, একটা ঘোড়া—বেতো ঘোড়া—গাধাও একটা আছে। আরো আছে, কতকগুলো পাখী এবং প্রকাণ্ড একটা ময়াল সাপ। এই নিয়ে মেলায় মেলায় সার্কাস দেখিয়ে বেড়ায় এই ছোট দলটি। দলে খেলোয়াড় বেশি নেই। মেয়ে পুরুষ আর বালক খেলোয়াড় মিলিয়ে মোট জন বারোর বেশি হবে না। উল্লাসী এই দলেরই একটি মেয়ে-খেলোয়াড়। বাঘ আর সাপ নিয়ে খেলা করে সে —তারের ওপর সাইকেল চালায়—শূন্যে ঝোলানো দোদুল্যমান দড়ির দোলনায় নাচে। কখনো কখনো আবার তাঁবুর বাইরে বাঁধা উঁচু মাচানটার ওপর দাঁড়িয়ে সে লোক ডাকে। অঙ্গ ভঙ্গী ক'রে চিৎকার ক'রে বলে ঃ আসুন দেখুন—বাঘের খেলা, জ্যান্ত বাঘ, তাজা বাঘ, রক্ত খোর বাঘ! দেখুন সাপের খেলা, ঘোড়ার খেলা—বুনো জানোয়ারদের মজার মজার তামাশা! নতুন খেলা—মজার খেলা! একবার দেখলে আবার দেখতে হবে। আসুন—কেবল আট পয়সা খরচা ক'রে একবার দেখে যান। এমন আর এখানে আসেনি—আসবেও না। বিলিতী খেলা, দেখে যান বাবু...

মেয়েটি থামে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা খনখনে ড্রাম বেজে ওঠে। সেই বাজনার সঙ্গে সুর মিলিয়ে মেয়েটাও খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে।

মেয়েটির রূপ আছে, যৌবন আছে আর আছে অপূর্ব মুখশ্রী।

তার আহ্বানে ভিড় জমে যায় তাঁবুর সামনে। অবাক হ'য়ে সব চেয়ে থাকে মেয়েটার মুখের দিকে। তারপর দু'আনা পয়সা দর্শনী দিয়ে সুড়সুড় ক'রে সব ঢুকে পড়ে তাবুর মধ্যে। সকলেই যে সার্কাস দেখতে ঢোকে তা নয়—অনেকে ঢোকে আরো খানিকক্ষণ ওই অদ্ভুত মেয়ে উল্লাসীকে দেখবার জন্যে। যে অমন কথা বলে, যার অমন নিটোল স্বাস্থ্য, অমন যৌবন পরিপুরিত দেহশ্রী সে কেমন খেলা দেখায় তাই দেখবার জন্যে।

বিরাট মেলার একান্তে এই সার্কাসের তাঁবু; কিন্তু সব চেয়ে এইখানেই ভিড় বেশি। ভিড় বেশি ছেলে ছোকরাদেরই। বুড়োরাও যে নেই তা নয়—তবে সংখ্যায় কম।

প্রথমে অশোকই আবিষ্কার করলে এই সার্কাস দলটিকে—আবিষ্কার করলে সার্কাসওয়ালী রূপসী উল্লাসীকে। বিস্ময়ে চোখ দুটো বড়ো বড়ো হ'য়ে উঠলো তার। ঠোঁট দুটো বিভক্ত হ'য়ে গেল। অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইলো সে মাচানে দণ্ডায়মানা অপূর্ব শ্রী সম্পন্না ও স্বাস্থ্যবতী মেয়েটার দিকে। কথাগুলো পর্যন্ত কি মিষ্টি মেয়েটার! আরো মিষ্টি তার কথা বলার ভঙ্গীটি। বার কয়েক মেয়েটার সঙ্গে চোখাচোখিও হ'ল তার—অপরূপ ভ্রূভঙ্গী ক'রে হাসলে মেয়েটা। মনে হ'ল যেন তাকে সার্কাস দেখবার জন্যে আহ্বান জানালে সে।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল অশোক, এগিয়ে গেল প্রবেশ দ্বারের দিকে। একটি আঠারো বিশ বছরের অতিশয় খর্বাকার ছোকরা অদ্ভুত বেশবাস ক'রে প্রবেশ দ্বার আগলে দাঁড়িয়ে আছে। দু'আনা ক'রে পয়সা নিয়ে এক একজনকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। ছোকরার দিকে তাকালে হাসি সামলানো দায় হ'য়ে পড়ে। অশোক দু'আনা দর্শনী দিয়ে তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করল। তারপর যথাসময়ে খেলা শুরু হ'ল। অবাক বিস্ময়ে বসে বসে সে খেলা দেখতে লাগলো।

খেলা সে ইতিপূর্বে অনেক দেখেছে। কলকাতার ছেলে সে—কতো ভালো ভালো বিলিতী খেলার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় আছে তার। কিন্তু উল্লাসীর মতো মেয়ে খেলোয়াড় জীবনে এই প্রথম দেখলে সে। এমন একটা মেয়েকে এই নগণ্য সার্কাস দল কেমন ক'রে সংগ্রহ করলে সবিস্ময়ে তাই ভাবতে লাগলো।

খেলা শেষে বাড়ি ফিরলো ওই উল্লাসীর কথা ভাবতে ভাবতেই। পরদিন পুনরায় গেল সার্কাস দেখতে। ঠিক সার্কাস দেখতে নয়, উল্লাসীকে দেখতে। তার পরদিন আবার। মনে তার নেশা ধরে গেছে। চেষ্টা ক'রে দলটার সঙ্গে একটু আলাপও জমিয়ে ফেলেছে। আলাপ জমিয়ে বুঝতে পেরেছে—দলের প্রত্যেকটি লোক পয়সার জন্যে অনেক কিছুই করতে প্রস্তুত। বড়লোকদের ভয়ংকর খাতির করে তারা। অশোককে বড়লোক মনে ক'রেই আমল দিয়েছে সম্ভবত। কিন্তু তার প্রকৃত অবস্থা যদি জানতো তাহলে হয়তো—

কিন্তু, সে কথা যাক!

অশোক মৌগাছিতে আসবার দিন দুই পরে পাইক বরকন্দাজ পরিবৃত হ'য়ে যথানিয়মে এসে উপস্থিত হ'ল ছোট জমিদার পুত্র ভবানীশংকর। এই প্রথম তার মৌগাছিতে আসা, এর পূর্বে কখনো আসেনি। এতো কাছে এমন অজ-গ্রাম যে আছে এবং থাকা সম্ভব তাই তার ধারণা ছিল না। ছেলেবেলা থেকে এই মৌগাছির এবং ওই ডাকাতে বিলের কতো কাহিনীই শুনেছে সে—মুগ্ধ হ'য়ে শুনেছে—নির্বাক বিস্ময়ে চোখ দুটো বিস্ফারিত হ'য়ে গেছে তার শুনতে শুনতে—আতঙ্কে রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠেছে। এই তাদের সেই পরিত্যক্ত পৈতৃক বাসভবন! অতীতের কতো স্মৃতির স্বাক্ষর বহন করছে আজো—কতো ইতিহাস এর ইট-কাঠ আর মাটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। কতো হাসি কতো কান্না—কতো উৎসব আর শোকের কাহিনী এর প্রতি ধূলিকণার সঙ্গে মিশিয়ে আছে। তারপর ওই

অদূরের ডাকাতে বিল! ওই আগুন খাকির বাদাড়! ছেলেবেলায় যার সামান্য উল্লেখেই তার সমস্ত দৌরাত্ম্য নিমিষে থেমে যেতো। ভয়ে জড় সড় হ'য়ে পড়তো সে। আজও মনে পড়ে কতো রাতে ওই ভয়ংকর ডাকাতে বিলের স্বপ্ন দেখে চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠেছে সে। মায়ের বুকের তলায় শঙ্কিত মুখ গুঁজে ঠক ঠক্ ক'রে কেঁপেছে—ডাকুর বাদার ডাইনীকে কল্পনা ক'রে।—বেশি দুষ্টামি করলে মা তখন ভয় দেখাতেন তাকে—বলতেন: অমন দুষ্টুমি যদি করো, তাহলে আমি নিশ্চয় বলছি কোন্‌দিন ডাকুর বাদার ডাইনি বুড়ি এসে তোমায় ধরে নিয়ে যাবে। ঠিক নিয়ে যাবে—এই বলে দিলুম!—সে কথাটি এখনো স্পষ্ট মনে আছে ভবানীর।

ডাকুর বাদার ডাইনি!

কথাটা মনে পড়তেই কেমন হাসি পেল তার। বাস্তবিক ছেলেবেলাটা মানুষের জীবনে যেন একটা অতি অদ্ভুত কাল! অদ্ভুত রহস্য ঘেরা! কতো শঙ্কাকাতর থাকে তখন মন! কী এক রহস্য দিয়ে ঘেরা থাকে যেন শিশুর সেই সব কচি কচি মন। কতো আজগুবী কল্পনা, কতো অবাস্তব আশঙ্কা—কতো হাসি-কান্না, সম্ভব অসম্ভব কতো সহস্র চিন্তার ভিড় তালগোল পাকায় মনের মধ্যে তখন। আর বড়রা সেই সুযোগ নিয়ে শিশুর কচি মনের গোড়ায় নাড়া দিয়ে কখনো আনন্দের মিঠা সমুদ্রে স্নান করান, কখনো ঠেলে দেন শঙ্কাসঙ্কুল অগাধ সমুদ্রের পরিকীর্ণ ফেনরাশির মধ্যে! আবার কখনো বা পক্ষীরাজে চড়িয়ে ঘুমন্ত রাজকুমারীর দেশে পাঠিয়ে দেন! পাঠিয়ে দেন রাক্ষসপুরী-রক্ষার বিজয় অভিযানে। পথে কতো দৈত্য দানবের সাক্ষাৎ ঘটে—সাক্ষাৎ ঘটে ডাকুর বাদার ডাইনির!...

সমস্ত বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়িয়েছে ভবানী প্রায় ঘণ্টা দুই ধরে। প্রত্যেকটি ঘর দালান উঠান একে একে দেখেছে সে। শুধু দেখেনি, করালীর কাছে এ অট্টালিকার অভিনব ইতিবৃত্ত শুনতে শুনতে দেখেছে। অশোকও সঙ্গে ছিল। তারপর তাদের দুজনকে

কর্মান্তরে বিদায় দিয়ে সে জমিদার ভবনের সুবিস্তৃত ছাদের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে। তিন তলার ছাদ! এখানে থেকে নজর করলে সমগ্র মৌগাছি গ্রামটাই দৃষ্টির মধ্যে ধরা দেয়।

অনেকক্ষণ ছাদের চারদিকে ঘুরে বেড়ালো ভবানী। ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো গ্রামখানির অবস্থা। স্বচ্ছল গৃহস্থ কেউ তেমন নেই বললেই হয় গ্রামে। দালান কোঠা ক্বচিৎ এক আধটা নজরে পড়ে। তাও সংস্কারের অভাবে অন্তিম অবস্থা। গ্রামটার কোথাও প্রাণের সাড়া নেই যেন। যেন সবাই মরে আছে। এখানে পৌঁছনোর পর গ্রামস্থ প্রজারা সব একে একে এসে তার সঙ্গে দেখা ক'রে গেছে। ঘণ্টা দু'তিন ধরে তাদের অভাব অভিযোগ শুনতে শুনতেই কেটে গেছে। কেউ কেউ ছোটকুমারের দরবারে খাজনা দাখিলও ক'রে গেছে। তাদের কারো দেহে এতোটুকু স্বাস্থ্য নেই, এতোটুকু মনে শান্তির রেশ নেই। অন্ততঃ ভবানীর চোখে পড়েনি।

ভারী বিশ্রী ঠেকছে তার এ জায়গাটা—ভালো লাগছে না! কেমন যেন অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া জায়গাটার চারদিক ঘিরে রয়েছে। বাতাসের সঙ্গে কেমন যেন একটা ভ্যাপসানি গন্ধ আসছে। চতুর্দিকে পচা খানা ডোবা আর বন বাদাড়। এখানে কি মানুষ থাকতে পারে কখনো। অথচ এক মাস নাকি থাকতেই হবে। কিন্তু—

ঘুরতে ঘুরতে ছাদের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণটায় এসে দাঁড়িয়ে পড়লো সে। এখানে দাঁড়ালে সামনের কতকগুলো গাছের পাতার ফাঁকে চোখের ওপর স্পষ্ট ভেসে ওঠে ডাকাতে বিল। দেখা যায় শিবমেলার একটা অংশ। ভালো ক'রে নজর করলে আগুন খাকির বাদাড়টাও দেখতে পাওয়া যায়। বেশি দূর তো নয়—মাইলটাকের মধ্যেই সব। তবে সামনে কতকগুলো গাছ গাছড়া থাকায় দৃষ্টি বাধা পায়। কিন্তু মেলার গোলমাল এখান থেকে বেশ শোনা যায়।

ছাদের সুউচ্চ আলসেয় দেহভার ন্যস্ত ক'রে ডাকাতে বিলের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করলো ভবানী। তারপর ছোটবেলার ছোট

বড় নানা চিন্তার ভিড়ে আপনাকে হারিয়ে ফেললে। ডাকুর বাদার ডাইনির কথাটা মনে পড়তেই কেমন যেন হাসি পেল তার আবার।

হঠাৎ কাঁধের ওপর কার স্পর্শ অনুভব ক'রে চমকে উঠলো সে। পিছন ফিরে তাকাতেই দেখলে সহাস্য মুখে অশোক দাঁড়িয়ে আছে।

—একলা একলাই দাঁড়িয়ে হাসছ! ব্যাপারটা কীহে?

তেমনি কাঁধে হাত রেখে হাসি মুখেই জিজ্ঞাসা করলে অশোক।

—ব্যাপার আবার কি—এমনি।

ভবানী একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করলে।

অশোক ভ্রূকুটি করলে।

—ও! আমি মনে করেছিলুম, বুঝি বা গিন্নীর কথাই ভাবছো! কিন্তু দীর্ঘশ্বাসটার অর্থ কী?

—তোমার মাথা। ফাজিল কোথাকার!—

অশোকের হাতখানা কাঁধের ওপর থেকে সরিয়ে দিয়ে ভবানী বললে: কেমন লাগছে এখানে বলো দিকি?

—মন্দ কি?

—মন্দ কি! আমার তো প্রাণ এই ক'ঘণ্টার মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠেছে। চারদিকে বন জঙ্গল আর পচা খানা-খন্দর ভ্যাপ্সা গন্ধ। এক মাস এখানে থাকতে হ'লেই হয়েছে আর কি। কি ক'রে ক'দিন কাটালে তুমি এখানে আমি তাই ভাবছি।

—না, মেজাজ খারাপ কোরো না। আমার ভাবনাটা আপাতত পরিত্যাগ ক'রে নিজের ভাবনা ভাবো। আমি এখানে ভালোই আছি—আশা করি যে ক'দিন থাকবো ভালোই থাকবো। আমরা গরীব মানুষ অল্পেই সন্তুষ্ট—

ভুরু দুটো কুঁচকে গেল ভবানীর—দৃষ্টিতে বিস্ময় ফুটে উঠলো। অশোকের স্বভাব অজানা নয় তার। অবস্থা যেমনি হোক—অশোকের মতো শৌখিন আর স্ফূর্তিবাজ ছেলে কমই দেখা যায়।

বুদ্ধিটাও অশোকের নানা রকমে আত্মপ্রকাশ করে। এখানে তার ভালো লাগার হেতু নিশ্চয়ই একটা আছে। সেটা অনুমান করতে দেরি হয় না। কিন্তু হেতুটি যে কী এবং তার গতি কোন মুখে তা কোনো মতেই স্থির করতে পারলে না ভবানী। নেশা করার রীতিমত অভ্যাস অশোকের নেই। মাঝে মাঝে বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধ উপরোধে নিতান্ত নিরুপায় হ'য়ে একটু আধটু—তবে তাও উল্লেখযোগ্য নয়। তা যদি হতো, তাহলে না হয় মনে করা যেতে পারতো যে, হয়তো বা পাড়াগাঁয়ের তাসের রসেই মন তার রসিয়ে গেছে। হাজার হ'লেও নতুন জিনিস তো বটে! কিন্তু তা তো নয়, একমাত্র সিগারেট ছাড়া অন্য কোনো নেশা তার নেই। তবে নেই একেবারে এমন কথা বলা যায় না—অভিনয় করার এবং তার চেয়ে অভিনয় করানোর উদগ্র একটা নেশা তার বর্তমান। বোধ করি এ নেশায় সে ভবানীকেও ছাড়িয়ে গেছে। ভবানীর সঙ্গে তার স্বভাবের অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। সেজন্য দুজনের সৌহার্দ্যও যথেষ্ট গড়ে উঠেছে। একটা প্রীতির সম্বন্ধও তাদের পরস্পরের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষ ক'রে ভবানীর যেন অশোক না হ'লে চলে না। সর্ব বিষয়ে অশোকের পরামর্শ তার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। অশোকের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, কথা বলার কায়দা, মানুষকে কথার প্যাঁচে বশীভূত করার দক্ষতা—সর্বোপরি অভিনয় নৈপুণ্য মুগ্ধ ক'রে দিয়েছে ভবানীকে: অশোকের কাছে নিজেকে যেন কতো খাটো মনে হয় তার। ভালোও বাসে যথেষ্ট। সেই সঙ্গে ঈর্ষাও করে কিছুটা অশোকের প্রতিভাকে। অথচ অশোক অতি দরিদ্র ঘরের ছেলে—রূপও এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়—নিতান্ত সাধারণ। এ দুটো ব্যাপারে ভবানীর সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। এমন কি, সব সময়ই প্রায় তাকে আর্থিক সাহায্য নিতে হয় ভবানীর কাছে। এবং কি জানি কেন—তাকে এতোটুকু সাহায্য করতে পারলে ভবানীর আত্মতৃপ্তির যেন সীমা পরিসীমা থাকে না। আর সে?—ভবানীকে খুশী করার জন্যেই

যেন ভবানীর সাহায্য গ্রহণ করছে এমনই একটা ভাব প্রকাশ করে। অদ্ভুত তার প্রকৃতি! তার সন্তুষ্টি উৎপাদন করা কতো কঠিন তা ভবানী ভালোই জানে। ভবানীর মনে হয়, কোনো অবস্থাতেই তাকে অধিকক্ষণ খুশী রাখা যায় না। কাজেই এই পাণ্ডব বর্জিত জায়গায় তার মতো ছেলের ভালো লাগার অবশ্যই কোনো রহস্যজনক কারণ আছে। কিন্তু সেটা কী?

পকেট থেকে সিগারেট কেশটা বার ক'রে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলে অশোক। তারপর চোখ বুজে গোটা দুই টান দিয়ে একমুখ ধূম উদ্‌গীরণ করতে করতে বিচিত্র ভঙ্গীতে ভবানীর মুখের দিকে তাকালে।

—কী ভাবছো ভায়া অতো? আমার এখানে ভালো লাগছে শুনে অবাক হ'য়ে গেছ, না?—একটু হেসে সিগারেটে আর একটা টান দিয়ে অশোক বললে: ভাবনা কোরো না—তোমারও আমার মতো ভালো লাগবে এখানে। ভালো লাগার বস্তু আছে।

ব্যাপারটা আরো ঘোরালো হ'য়ে পড়লো। এখানে আবার কি বস্তু আবিষ্কার করলে অশোক? তবে কি কোনো—কিন্তু তাই বা এখানে সম্ভব হয় কি ক'রে? সুলোচনা বাঈ-এর মতো কোনো রূপসীর দর্শন লাভ এখানে কিছুতেই সম্ভব নয়। অভিনয়েরও কোনো ব্যবস্থা এখানে নেই নিশ্চয়ই। তবে? ভবানীর বিস্ময় যেন উত্তরোত্তর বাড়তে লাগলো। অল্পক্ষণ নির্বাক দৃষ্টিতে অশোকের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে: হেঁয়ালি রেখে ব্যাপারটা কি একটু খুলে বলো দিকি?

—বলবো ভায়া—সব বলবো। শুধু বলবো না—দেখাবো। তবে একটু সবুর করতে হবে। মধ্যমা আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ঘর্ষণে একটা বিচিত্র শব্দ ক'রে সিগারেটের ছাই ঝাড়লে অশোক। এসব ব্যাপারে তার কায়দার অন্ত নেই। তারপর ঊর্ধ্ব নেত্র হ'য়ে সশব্দে সিগারেটে একটা টান দিয়ে বললে: আর তা ছাড়া দুপুর রোদে—না খাওয়া

না দাওয়া—ছাদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রসের কথা শোনাও যায় না—বলাও চলে না। চলো, নীচে যাই।

ভবানীর মুখে চোখে বিরক্তির ভাব ফুটে উঠলো। একটু রুক্ষ-স্বরেই বললেঃ যে কথা শেষ করতে পারবে না তা আরম্ভই বা করো কেন? মানুষের ধৈর্য পরখ করারও একটা রীতি আছে।

—আছে না কি?

সজোরে হেসে উঠে অশোক তার একটা হাত চেপে ধরে আকর্ষণ করলে।

—কি ইয়ার্কি হচ্ছে, ভালো লাগে না—হাত ছাড়ো।

ঠিক সেই সময় একজন ভৃত্য এসে জানালে—নীচে জন কয়েক প্রজা এসে অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা ক'রে আছে—ছোট বাবুর সঙ্গে দেখা করবে বলে।

সেদিন আর অশোকের সঙ্গে বিশেষ কিছু কথাবার্তা হ'ল না। সমস্ত দিনটাই কেটে গেল বৈষয়িক নানা ঝঞ্ঝাটে। শোনা গেল সারা মাসটাই নাকি এমনি ঝঞ্ঝাটে কাটবে এখানে। অবশ্য সব ঝক্কি আজকের মতো একা ভবানীকেই পোয়াতে হবে না—করালীচরণ সে ব্যবস্থা করবে। তবে আজ প্রথম দিন, তা ছাড়া ছোটকুমার কখনো আসেন না, তাই প্রজারা সব ভিড় ক'রে এসেছে তাঁকে দেখতে।

প্রজাদের দেখা দিতে দিতে—তাদের নালিশ আর অভিযোগ শুনতে শুনতেই সেদিনটা কেটে গেল। অশোকের রসের কথা শোনা হ'ল না। শোনার এতোটুকু আগ্রহও প্রকাশ করলে না ভবানীশংকর। যদিও ব্যাপারটা জানবার জন্যে প্রাণ ছটফট করছিল। আজও ভোলেনি সে সুন্দরী সুলোচনা বাঈ-এর কথা। ভোলেনি ওস্তাদ বামদেব মিশ্রকে আর তাঁর শিষ্য নিরঞ্জন সুরকারকে। নিরঞ্জন ছিল অশোকেরই বন্ধু।

বছর কয়েক আগে, কি যেন এক উপলক্ষে—ঠিক মনে নেই—বেনারসে যেতে হয়েছিল ভবানীকে। সঙ্গে ছিল অশোক। মাস তিনেক প্রায় থাকতেও হয়েছিল সেখানে এবং সেই সময়েই একদিন আকস্মিকভাবে স্থলোচনা বাঈকে আবিষ্কার করে অশোক।

আজও বেশ মনে আছে ভবানীর সেদিনের কথা। মনে আছে কোথায় যেন সাজগোছ ক'রে বেরুচ্ছিল সে, এমন সময় ঝড়ের মতো অশোক এসে উপস্থিত হ'ল।

—আরে কোথায় চলেছ ?

—এই একটু এদিক ওদিক। একবার রামনগর যাবো মনে করছি। মানে—

—আরে রেখে দাও তোমার রামনগর আর মানে! শীগগির আমার সঙ্গে চলো।—চলো, চলো—আর দেরি কোরো না—আরম্ভ হ'য়ে যাবে ওদিকে।

—তোমার সবই কি অদ্ভুত! কোথায় যাবো ? কী আরম্ভ হবে ? কিছুই তো বুঝলুম না। ব্যাপারটা একটু খুলে বলো।

মুখের একটা বিচিত্র শব্দ ক'রে অশোক বললেঃ যাবে আমার সঙ্গে ঠাকুরলাল আগরওয়ালার বাড়িতে। সেখানে জলসা আছে। বোম্বের বিখ্যাত গায়িকা এবং চিত্রতারকা স্থলোচনা বাঈ সেখানে গাইবে। পর্দায় যাকে দেখে তোমার মুণ্ডু ঘুরে যায়—সেই কোকিল-কণ্ঠী সৌন্দর্যময়ী স্থলোচনা!

—স্থলোচনা বাঈ ?

—হ্যাঁগো, সেই! চলো আর দেরি কোরো না! পাঁচটা বাজে—

আর কোনো প্রশ্ন করেনি ভবানী, শুধু পথে নেমে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলঃ কি ভাবে ঢুকবে ? তোমার পরিচিত কেউ সেখানে আছে ?

—নিশ্চয়ই।

সগর্বে বলেছিল অশোকঃ পরিচিত মানে? আমার বন্ধু নিরঞ্জনই তো ফাংসানের পাণ্ডা। শুধু পাণ্ডা নয়—সেও একজন আর্টিস্ট। তারও প্রোগ্রাম আছে।

একটু থেমে চোখ মুখের একটা কেমন ভঙ্গী ক'রে বলেছিল: সুলোচনার সঙ্গে সেই তো আলাপ করিয়ে দিয়েছে। সুলোচনার গুরুভাই কিনা সে। শুনছি ওদের গুরুদেবও নাকি ফাংসানে গাইবেন আজ।

সবিস্ময়ে ভবানী তাকিয়েছিল একবার অশোকের দিকে।—আলাপ! সুলোচনার সঙ্গে আলাপ হয়েছে অশোকের?—কিন্তু আর একটিও প্রশ্ন করেনি সে। সৌন্দর্যময়ী সুলোচনার কথা চিন্তা করতে করতে অশোকের সঙ্গে এক সময় এসে উপস্থিত হয়েছিল আগরওয়ালার গৃহে।

জীবনের সেই দিনটি চিরস্মরণীয় হ'য়ে আছে ভবানীর মনে। যতোদিন বাঁচবে ভুলবে না সেই দিনটির কথা। নিরঞ্জনের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল অশোক প্রবেশ দ্বারেই। তারপর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল সুলোচনা বাঈ-এর সঙ্গে আর সংগীতাচার্য বামদেব মিশ্রের সঙ্গে।

সাত্বিক স্বভাব বামদেব মিশ্রের কথা ভোলবার নয়। সরল শিশুর মতো হাসিটি। সুমিষ্ট সেই আলাপন এখনো তার মনের মণিকোঠায় উজ্জ্বল হ'য়ে আছে। সংগীতসাধক বামদেবের সংগীত—সেই ললিত রাগের ললিত আলাপ তরঙ্গ, সেই মূর্ছনা, সংগীতের সেই মনোহর গতি—আজো স্পষ্ট কানে বাজছে যেন। আর সুলোচনা? সুলোচনার কথা ভাষায় পরিব্যক্ত করা যায় না।

সম্মুখ পরিচয় সুলোচনার সঙ্গে তার সেই প্রথম হ'ল বটে; কিন্তু তার বহুপূর্ব থেকেই মনের রাজ্যে আসন বিস্তার করেছিল সুলোচনা বাঈ! এখন সেই আসনে তাকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে ব্যগ্র হ'য়ে পড়লো সে। এবং সেই আকাঙ্ক্ষাকে কার্যকরী করতে সে প্রাণপণ

করলে। তাকে সহায়তা করতে লাগলো অশোক—আর অর্থের জন্যে গোপনে নিরঞ্জন।...

সুলোচনাকে লাভ করা কঠিন হয়নি ভবানীর। কয়েক সহস্র অর্থের বিনিময়ে পেয়েছিল সে সুলোচনাকে। কিন্তু প্রণয় দীর্ঘস্থায়ী হয়নি—অল্পদিনেই মোহ টুটে গেল। যেদিন জানতে পারলে সুলোচনা তাকে ভালোবাসে না—ভালবাসে তার অর্থকে। যেদিন জানতে পারলে সুলোচনা নিরঞ্জনের সঙ্গে প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ—সেইদিনই তার মোহ টুটে গেল। সরে এলো সে মায়াবিনী সুলোচনার কাছ থেকে—সরে এলো অর্থলোলুপ নিরঞ্জনের মিথ্যা বন্ধুত্বের বাঁধন কেটে। দুষ্ট গ্রহের মতো সুলোচনা তার জীবনাকাশে উদয় হয়েছিল একদিন এবং অজ্ঞাত কোন্ শুভগ্রহের প্রভাবে নিষ্কৃতি পেয়েছে সে আজ।

এ ব্যাপারে অবশ্য অশোকই তাকে সচেতন ক'রে দিয়েছিল প্রথম। আশ্চর্য প্রকৃতির মানুষ এই অশোক! তাকে যেন কোনো মতেই বুঝে ওঠা যায় না। তার আচরণ, তার ব্যবহার সবই অসাধারণ। সুলোচনার সঙ্গে আলাপ পরিচয় সে-ই করিয়ে দিয়েছিল আবার সুলোচনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত ক'রে বিচ্ছেদও ঘটিয়ে দিলে সে-ই।

বাস্তবিক, অশোক যে কি চায় আর কি চায় না, তা আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারলে না সে। পাঁকের মধ্যে বাস করতে ভালোবাসে অশোক অথচ পাঁক গায়ে মাখে না। কামিনী-কাঞ্চন কোনো কিছুই অকাম্য নয় তার অথচ কিছুর মধ্যেই জড়িয়ে থাকতে চায় না। কাম্য বস্তু যতক্ষণ না পাওয়া যায় ততক্ষণ তার জন্যে প্রাণপাত করে কিন্তু যে মুহূর্তে তা আয়ত্তের মধ্যে আসে তৎক্ষণাৎ প্রয়োজন হ'লে পরিত্যাগ করতে এতোটুকু দ্বিধা করে না সে। এমনই বিচিত্র তার স্বভাব। সুলোচনার প্রতি আকৃষ্ট সে নিজে হয়েছিল কি না সে খবর ভবানীর

জানা নেই; তবে ভবানীর জন্যে—ভবানীর মনের ভাব উপলব্ধি ক'রে এবং ভবানীকে আনন্দ দেবার জন্যে সুলোচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেছিল সে। কেবল ঘনিষ্ঠতাই করেনি—তাদের মিলনের সহায়তাও করেছিল সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম ক'রে। কিন্তু যে মুহূর্তে কুহকিনী সুলোচনার অভিপ্রায় জানতে পারলে সে—জানতে পারলে যে প্রেমের সুচারু অভিনয়ে মোহগ্রস্ত রেখে ভবানীকে শোষণ করতে চায় সুলোচনা—জানতে পারলে সুলোচনা-নিরঞ্জনের গূঢ় সম্পর্কের কথা, সেই মুহূর্তেই ভবানীকে সাবধান ক'রে দেয় সে। সেজন্যে ভবানী তার কাছে মনে প্রাণে কৃতজ্ঞ। তাকে ভালোবাসে ভবানী, বিশ্বাসও ক'রে সেই পরিমাণ। ভবানীর মনের কামনা সে যেমন বুঝতে পারে তেমন বোধ করি ভবানী নিজেও পারে না। তাই তার মুখে, এখানে—এই পাণ্ডব-বর্জিত পল্লীতে মন্দ না লাগার কথায় বিস্মিত হ'ল ভবানী। মন ব্যগ্র হ'য়ে উঠলো জানবার জন্যে যে কিসের আকর্ষণে এখানে তার ভাল লেগেছে! রসের কথাটাই বা কি? কোনো নারী রত্ন আবিষ্কার করলে নাকি সে এখানে? শেফালী টেফালীর মতো কারো সন্ধান পেলে নাকি?

পরদিন সকাল বেলাটা তেমনি ভাবেই কেটে গেল নানা কাজে —নানা লোকের সঙ্গে দেখা করতে করতে। দুপুরে আহারাদির পর দোতলার দক্ষিণ দিকের সুসজ্জিত বড় হল ঘরখানায় একটা আরাম চৌকিতে শুয়ে বিশ্রাম করছিল ছোটকুমার ভবানীশংকর। আর অশোক সেই ঘরেরই অন্য একদিকের ঢালা শুভ্র বিছানার ওপর তাকিয়া ঠেশ দিয়ে আড় হ'য়ে পড়েছিল এবং মুদ্রিত নেত্রে পাইপ টানতে টানতে গুন্ গুন্ ক'রে একটা গানের সুর ভাঁজছিল।

অনেকক্ষণ এই ভাবে কেটে গেল। দেওয়ালে আটকানো ক্লকটায় ঢং ক'রে একটা শব্দ হ'ল—বেলা আড়াইটার সংকেত। অশোক পিট পিট ক'রে একবার ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে হাতের

পাইপটাতে একটা অন্তিম টান দিয়ে নড়ে চড়ে ভালো ক'রে শুয়ে পড়লো। ভবানীর দিকে তাকালে না—একটা কথাও বললে না। এ ঘরে ভবানীর অবস্থিতি যেন তার লক্ষ্যের মধ্যেই নেই—যেন সে জানেই না। কিন্তু ভবানীর অবস্থা ক্রমেই সংকটাপন্ন হ'য়ে উঠছে। মনের ঔৎসুক্য আর কিছুতেই চেপে রাখা সম্ভব হচ্ছে না তার পক্ষে। অশোকের রসতত্ত্ব শোনবার জন্যে ভয়ংকর চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে তার মন। অথচ অশোকের কাছে মনের দুর্বলতা প্রকাশ করতেও সংকোচ হ'চ্ছে! রাগও কম হ'চ্ছে না অশোকের ওপর।—আচ্ছা লোক যা হোক! চিরকাল স্বভাবটা একই রকম রয়ে গেল। হেঁয়ালি ছাড়া কথাই বলতে পারে না যেন!—আরে বাপু, কি জন্যে তোর এখানে এতো ভালো লাগলো সেটা স্পষ্ট ক'রে ব'লে ফেললেই তো চুকে যায়! তা নয় আদ্ধেক কথা মুখে—আদ্ধেক কথা পেটে। মানুষের মনে সমস্যা জাগিয়ে দিয়েই থেমে যাওয়া।—অত্যন্ত অন্যায়!

ঔৎসুক্য যেন ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে ভবানীর। আড় চোখে বার বার তাকিয়ে দেখতে লাগলো সে অশোককে। অশোক নির্বিকার। যতো বারই দেখলে—অশোক একই ভাবে শুয়ে আছে চোখ বুজে।

নাঃ! এ অসহ্য। রসতত্ত্বটা—

—কি হে ঘুমুলে নাকি? অশোক!

—না।

—তবে?

পাশের গোল শ্বেতপাথরের টেবিলের ওপর থেকে রূপোর সিগারেট কেশটা তুলে নিয়ে তার ভেতর থেকে একটা সিগারেট বার ক'রে ধরালে ভবানী। তারপর অকারণে বোকার মতো একটু হেসে বললেঃ অমন চুপ চাপ যে?

—ভাবছি!

তেমনি চক্ষু বুজে শুয়ে শুয়েই জবাব দিলে অশোক।

—ভাবছো ? কি ভাবছো ?

—ভাবছি—যা ভাবছি তা আমার ভাবা উচিত কি না ?

—সে আবার কি ?

—সে যে কি—তাইতো ভেবে পাচ্ছি না।

হঠাৎ উঠে বসলো অশোক।

—আচ্ছা, গোবরে পদ্মফুল ফোটার কথা শুনেছ কখনো ?

আবার সেই হেঁয়ালির কথা। ভুরু দুটো কুঁচকে বিকৃত মুখে তার দিকে তাকিয়ে খিঁচিয়ে উঠলো ভবানী : দুত্তোর পদ্মর নিকুচি করেছে। যত্তো সব—

হাতের সিগারেটটা সরোষে অ্যাশট্রের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বললে : হেঁয়ালি ছাড়া কথাই নেই যেন তোমার। এক জানতে চাইবো, বলবে আর এক !

মহা বিরক্তির সঙ্গে দেহটা আরাম চৌকিতে এলিয়ে দিলে ভবানী। যেন রাগ ক'রে নিজেকে চেয়ারটার মধ্যে ফেলে দিলে ঠেলে মনে হ'ল।

তার ভাব ভঙ্গী দেখে এবং মনের ভাব অনুমান ক'রে সহসা অট্টহাসি হেসে উঠলো অশোক। অশোকের বিকট হাসিতে রাগ আরো চ'ড়ে গেল ভবানীর। রুক্ষস্বরে কি যেন একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বলা হ'ল না। বাইরে থেকে করালীচরণের আহ্বান শোনা গেল।

—ছোটবাবু। একবার কাছারীতে আসতে হবে আপনাকে।

—আঃ ! আবার এখন কি দরকার পড়লো কাছারিতে ?

—না, তেমন কিছু নয়।—মানে—

ঘরের দরজাটার সামনে এগিয়ে এসে দাঁড়াল করালী এবং কপাটের দুদিকে দুটো হাত দিয়ে ভেতর দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে বললে : মানে, একটি মেয়েছেলে—একেবারে নাছোড়বান্দা—একবার আপনাকে দর্শন না ক'রে যাবে না।

—মেয়েছেলে ?

সোজা হ'য়ে একটু নড়ে চড়ে বসলো ভবানী।

করালী বললেঃ আজ্ঞে হ্যাঁ। শিবমেলায় বুঝি জায়গা ভাড়া নিয়ে জিরন্যাষ্টিক না কি খেলা দেখায়—

—জিম্‌ন্যাষ্টিক খেলা দেখায়! মেয়েছেলে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ! মানে, এ মেয়েলোকটি হ'চ্ছে সেই জিম্‌ন্যাষ্টিক দলের সর্দারনী! আপনি এসেছেন শুনে নজর দিতে এসেছে।

—ও, আচ্ছা। তাকে বসতে বলোগে—যাচ্ছি।

—যে আজ্ঞে!

করালী চলে যেতে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অশোকের দিকে তাকালে ভবানী। অশোক আবার হেসে ফেললে—তবে তেমন বিকট হাসি হাসলে না। হাসতে হাসতে বললেঃ নাম করতে করতেই গোবর!

—গোবর!

—হ্যাঁ, ওই গোবরে পদ্মর—গোবর।—যাও, যাও দর্শন দিয়ে এসো। আর নিজেও দর্শন ক'রে এসো। সচরাচর এমন বপুর দর্শন মেলে না। চাই কি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হ'লে পদ্মর আবির্ভাবও ঘটে থাকতে পারে! যাও—আর দেরি কোরো না।

॥ দুই ॥

কথাটা মোটেই অতিশয়োক্তি করেনি অশোক। বাস্তবিকই এমন জীব সচরাচর নজরে পড়ে না। মোটা জীবনে অনেক দেখেছে ভবানী কিন্তু এমন দু'পেয়ে হাতী এই প্রথম দেখলে। আরো আশ্চর্য, এই বিপুল মাংসপিণ্ডের ভার স্ত্রীলোকটিকে এতোটুকু কাবু করতে পারেনি—স্বচ্ছন্দে ব'য়ে বেড়াচ্ছে। মুখখানা যেন আরো ভয়ানক! দেখলেই কেমন ভয় ভয় করে। প্রকাণ্ড চওড়া কপাল—চুল বলে কোনো বস্তু মাথায় আছে কিনা ঠিক ঠাওর হয় না, ভুরুতেও চুল নেই এবং চোখের পাতারও কোনো বালাই নেই। করমচার মতো রাঙা রাঙা চোখ দুটো সর্বদাই আধ বোজানো। নাকটা অস্বাভাবিক চ্যাপটা। ঠোঁট দুটো যেমন কালো তেমনি মোটা। হাসলে সেই ঠোঁটের মধ্যে দিয়ে মুখের ভিতরকার সামনের দিকের তিন চারটি ফাঁক ফাঁক বিবর্ণ দাঁত মাঢ়ী সমেত আত্মপ্রকাশ করে। সম্ভবত ওই ক'টিই অবশিষ্ট আছে আর বাকীগুলি গঙ্গা পেয়েছে। স্ত্রীলোকটির মুখের দিকে তাকালে অতি সাহসীরও বুক কেঁপে ওঠে।

ছোটকুমার ভবানীশংকরের জন্যে উপঢৌকন এনেছিল স্ত্রীলোকটি। উপঢৌকন বিশেষ কিছু নয়—লোহার তারের খাঁচায় আবদ্ধ একটি অপূর্ব-দর্শন পাখি। ভবানী আসতেই সে সসম্ভ্রমে তাকে অভিবাদন করলে।

—গড় হই গো বাধুমশাই।

বলেই একটু কাছে এগিয়ে এলো এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভবানীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করতে লাগলো। ভবানীও সবিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে রইলো। ভবানীর মনে হ'তে লাগলো স্ত্রীলোকটির দৃষ্টি

যেন তার অস্থিচর্ম ভেদ ক'রে মর্মের মাঝখানে গিয়ে কিসের তল্লাশ করছে। কেমন সংকুচিত হ'য়ে পড়লো যেন সে। নিতান্ত দিনের বেলা এবং নিজের বাড়িতে বলে তাই নইলে অন্য কোথাও কোনো পরিজনহীন স্থানে হ'লে এ-দৃষ্টির সামনে বোধ হয় সে দাঁড়াতে পারতো না—মূর্ছা যেতো।

অশোক তার সঙ্গে সঙ্গেই এসেছিল। তার অবস্থা দেখে সে মনে মনে একটু হাসলে এবং সামনে এগিয়ে এসে স্ত্রীলোকটিকে লক্ষ্য ক'রে বললেঃ কী মাসী, খবর কী?—আরে ববাস্, বহুত আচ্ছা পাখি এনেছ তো! ছোটকুমারকে উপহার দেবে বুঝি?

—হেঁ হেঁ, এই একটুন—

স্ত্রীলোকটি অশোকের দিকে তাকিয়ে এক প্রকার বীভৎস হাসি হাসলে। তারপর খাঁচাসমেত পাখিটা ভবানীর দিকে এগিয়ে দিয়ে সবিনয়ে বললেঃ হামরারা গরীব মনিষ্যি বাবুমশাই। এই মেলাতে আপনারই থানে একটু আস্তানা গেড়েছি—তামাশা দেখাই। হামরাদের পায়ে রাখবেন বাবুমশাই।

অশোকের পানে তাকিয়ে বললেঃ কী বেটা, আজ বাবুকে হামরাদের সার্কাসে নেওয়া করবে, কেমন অ্যাঁ?—এই বেটা রোজ রোজ যাওয়া করে। হেঁ হেঁ—

বলে সে ভবানীর মুখের দিকে চেয়ে তেমনি ক'রে হাসতে লাগলো। কিন্তু ভবানীর মুখে কোনো কথা নেই। সে অবাক হ'য়ে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো সেই অদ্ভুত রমণীটিকে, আর শুনতে লাগলো তার ভাঙা কাঁসির মতো খন্‌খনে গলার আওয়াজ। এমনতরটি জীবনে সে দেখেওনি, শোনেওনি। প্রায় মিনিট পনেরো অনর্গল বক বক ক'রে শেষে বিদায় হ'ল স্ত্রীলোকটি। যাবার সময় বার বার অনুরোধ ক'রে গেল যেন ভবানী তার ওখানে জিমন্যাষ্টিক দেখতে যায়। অশোককেও বলে গেল, বাবুমশাইকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে।

রমণীটি চলে যাবার পরও কিছুক্ষণ তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে রইল ভবানী। যেন বাহ্যজ্ঞান নেই তার। যেন কোন্ জাদু প্রভাবে বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে তার স্বাভাবিক সংজ্ঞা। প্রায় আধ ঘণ্টাটাক্ পরে ওপরের ঘরে ফিরে এলো সে। অশোক ইতিপূর্বেই ফিরেছিল। একটা চুরুট ধরিয়ে চক্ষু বুজিয়ে টানছিল সে বিছানায় পড়ে পড়ে। সম্ভবত কিছু একটা ভাবছিলও, কিন্তু তার ভাবনা ধরা ছোঁয়ার বাইরে। বোধ হয় মনে মনে কোনো পরিকল্পনা স্থির করছিল। ভবানী আসতে পিট পিট ক'রে একবার চেয়ে দেখলে তার দিকে! একটা চাপা হাসি ফুটতে গিয়ে মিলিয়ে গেল তার মুখে। আবার চোখ বুজিয়ে ভাবতে শুরু করলে।

ভবানীও কোনো প্রশ্ন করলে না তাকে। ফিরেও তাকালে না তার দিকে একবার। আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে নিজের পরিত্যক্ত আসনের ওপর বসে পড়লো। কেমন যেন একটা অস্বাচ্ছন্দ্য মনের মধ্যে তালগোল পাকাচ্ছে। একটা কিছু করবার ইচ্ছে করেছে। কিন্তু কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।

হঠাৎ আজ অনেকদিন পরে কলকাতার কথা মনে পড়লো তার। মনে পড়লো সেই স্বাধীন স্বচ্ছন্দ জীবন, সেই তার নিজের গড়া রঙ্গমঞ্চ—যেখানে সে ছিল সর্বেসর্বা—সে ছিল সম্রাট্। মনে পড়লো —অভিনেত্রী সরসীবালা, সৌদামিনী, সুন্দরী শেফালীর কথা—মনে পড়লো সেই মনোহারিণী পরিবেশ!

নাঃ! এ তার ভালো লাগে না। এখানে এমনভাবে থাকতে পারবে না সে। এ যেন বন্দিত্ব। এ জীবন যাপন করা কিছুতেই সম্ভব নয় তার পক্ষে। সে ফিরে যাবে—ফিরে যাবে আবার সেই কলকাতায়। আবার সেখানে নতুন ক'রে গোড়ে তুলবে থিয়েটারের দল—আবার নতুন ক'রে শুরু করবে অভিনয়ের আয়োজন মঞ্চ ভাড়া নিয়ে। এখানে সে থাকতে পারবে না। এ বিষয় বৈভবের প্রতি এতোটুকু মায়া নেই তার—এর কিছুই তার নয়। কিন্তু টাকা চাই

—থিয়েটার শুরু করতে গেলে টাকার প্রয়োজন। অনেক টাকার। আর প্রয়োজন আছে অশোকের। হ্যাঁ, অশোক নইলে কিছুই সম্ভব হবে না তার দ্বারা। অশোককে চাই-ই।—টাকা—তাও জোগাড় হবে এই অশোককে দিয়ে। অশোকের খুরধার বুদ্ধি ঠিক আবিষ্কার ক'রে ফেলবে কোথায় টাকার খনি আছে! কেমন ক'রে টাকা আমদানী করতে হয় অশোক তা জানে!—আচ্ছা—

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যেতে হেসে ফেললে সে একটু এবং সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ়তা পরিস্ফুট হ'য়ে উঠলো তার মুখে।—না, অনুরাধার কাছে সে প্রত্যাশী হ'য়ে কোনদিন দাঁড়াবে না। কেন দাঁড়াবে? অনুরাধা তার কে? তার সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বিবাহ হয়েছে মাত্র, কিন্তু অনুরাধা তার সহধর্মিণী নয়। তাদের মধ্যে যেন একটা দুস্তর ব্যবধান বিরাজিত। অনুরাধার নাগাল পায় না সে—অনুরাধাও তার মনের কাছে আসতে পারে না। অথচ অনুরাধাকে সে ভালোবাসে—ভালো লাগে তার অনুরাধাকে! কিন্তু সে ভালোবাসার জাত আলাদা, সে ভালো লাগার রূপ ভিন্ন। আজ পর্যন্ত যতোগুলি নারীর সংস্পর্শে এসেছে সে তাদের কারো সঙ্গে এতোটুকু সংগতি নেই অনুরাধার। না সৌন্দর্যে, না ব্যবহারে! অনুরাধা যেন স্বতন্ত্র এক জীব। দূর থেকে দেখতে ভালো লাগে—কাছে যেতে কেমন ভরসা হয় না যেন। মুখের পানে চোখ তুলে তাকানো যায় না সরাসরি। কি যেন একটা সংকোচে কুঁচকে আসে মনখানা। তবুও ভালোবাসে সে অনুরাধাকে। কিন্তু সে ভালোবাসা শ্রদ্ধাযুক্ত ভালোবাসা। সে ভালোবাসায় এতটুকু লালসা কামনার গন্ধ নেই।

তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ উত্তাল সাগরকে যেমন ভালোবাসে মানুষ, ভালোবাসে যেমন তার সীমাহীন জলরাশির নীল সৌন্দর্য—ভীতোৎফুল্ল নির্বাক চোখে তাকিয়ে থাকে তার পানে, কিন্তু তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ার ভরসা পায় না। সূর্যের প্রদীপ্ত সৌন্দর্যের প্রতি যেমন

শ্রদ্ধা আছে মানুষের—ভালো লাগে যেমন তার আলো, কিন্তু মধ্যাহ্ন আকাশে তাকাতে পারে না তার দিকে—দৃষ্টি ঝাপসা হ'য়ে যায়। ভবানীর কাছে অনুরাধাও ঠিক তেমনি। কামনার ইন্ধন সঞ্চয়ের জন্যে অনুরাধার কাছে হাত পাতা অসম্ভব তার পক্ষে। অনুরাধাকে ভালোবাসে সে কিন্তু তার নৈকট্য সহ্য করতে পারে না। কেমন যেন ভয় ভয় করে। সর্বদাই নিজেকে অত্যন্ত খাটো মনে হয় অনুরাধার কাছে—অত্যন্ত অপরাধী মনে হয় নিজেকে যেন। প্রাণ খুলে কথা বলতে পারে না তার সঙ্গে—চোখ তুলে তাকাতে পারে না তার মুখের দিকে।…

একটা দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ ক'রে নড়ে চড়ে বসলো ভবানী। অশোকের দিকে চেয়ে দেখলে, ইতিমধ্যে কখন সে উঠে বসেছে শয্যা ছেড়ে এবং অনিমেষ চোখে তারই পানে চেয়ে আছে। যেন তার মনের কথা পাঠ করবার চেষ্টা করছে। পরস্পরের দৃষ্টি বিনিময় হ'তেই এবার অশোক হেসে ফেললে।

—অতো কি ভাবছো ভায়া? গোবর দেখেই এতো? না জানি পদ্ম দেখলে অবস্থা কি হবে!

নিরাসক্তভাবে কেস্ থেকে একটা সিগারেট বার ক'রে ধরালে ভবানী। কোনো কথা বললে না।

অশোক তেমনি হাসতে হাসতে বললেঃ বড় গম্ভীর যে, ব্যাপার কি? গিন্নীর জন্যে মন কেমন করছে নাকি?

—দূর!

—দূর নয় ভায়া, দূর নয়—কাছেই। বলতো না হয় লোক পাঠাই।

পুনরায় একটা দীর্ঘস্থায়ী নিশ্বাস আস্তে আস্তে মোচন করলে ভবানী। তারপর সিগারেটে গোটা কয়েক টান দিয়ে বললেঃ আমি একটা কথা ভাবছিলুম—

—যথা?

আধপোড়া একটা চুরুটে অগ্নিসংযোগ ক'রে ভবানীর দিকে তাকালে অশোক।

—বলে ফেলো, তোমার ভাবনাটা—শুনি!

কুঞ্চিত ললাটে হাতের সিগারেটটায় একটা সশব্দ অন্তিম টান দিয়ে সেটা ফেলে দিলে ভবানী। কোনো কথা বললে না, তেমনি ঊর্ধ্বদৃষ্টি হ'য়ে ভাবতে লাগলো।

অশোক খানিকক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে বললেঃ কি হে, শিবনেত্র হ'য়ে ভাবতে শুরু করলে যে আবার। ভাবনাটা কি তোমার শুনি—বলো? আবার ওদিকের দেরি হ'য়ে যাচ্ছে—যেতে হবে তো?

—কোথায় যেতে হবে?

—বেশ! ভাবনার ঠেলায় সব ভুলে যাচ্ছ দেখছি। মাসীর নেমন্তন্ন রাখতে যেতে হবে না? অত ক'রে বলে গেল—

ভবানী রীতিমত বিরক্ত হ'ল। মুখখানা বিকৃত ক'রে বললেঃ মাসী! কোথাকার একটা কদাকার ছোটলোক মেয়েমানুষ—ছিঃ! ওটাকে মাসী বলতে রুচিতে বাধে না তোমার? আবার ওর সার্কেসে—

হেসে উঠলো অশোক। হাসতে হাসতে বললেঃ ভায়া, রুচিটে গেছে বলেই তেতোটা-আঁশটা একটু চাখবার চেষ্টা করছি। আমার মনে হয় তোমারও খারাপ লাগবে না। একবার চলোই না ঘুরে আসি।

—না। আমার প্রবৃত্তি নেই। তুমি যাও।

আসন থেকে উঠে ভবানী সারা মুখে বিরক্তি নিয়ে ঘরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত একবার পায়চারি ক'রে নিলে। রপর হঠাৎ হাস্যরত অশোকের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ললেঃ আচ্ছা অশোক, সার্কেস কি জীবনে দেখনি? এই অজ পাড়াগাঁয়ে, অখদ্দে ম্লেচ্ছ বেদের দলের সার্কেস দেখতে যেতে ইচ্ছে করে তোমার? লজ্জা করে না? আবার মাসী বলে

ওই মেয়ে মানুষটার সঙ্গে খাতির জমিয়েছ! ছিঃ! তোমার হ'ল কী বলতো?

অশোক তেমনি হাসতে হাসতেই বললেঃ আমার বিশেষ কিছু হয়নি। যেটুকু হয়েছে তোমার জন্যেই হয়েছে। এখন বাজে কথা কাটাকাটি না ক'রে—চলো—সময় হ'য়ে গেছে!

—তুমি যাও। আমার তো মাথা খারাপ হয়নি যে তোমার ওই বেদে মাসীর জিমন্যাষ্টিক দেখতে ছুটবো। তোমার শখ বেশি, তুমি যাও। ও বেদেদের খেলা নতুন নয়—আমরা অনেক দেখেছি, আর ইচ্ছে নেই।

—দেখেছ অনেক অস্বীকার করছি না। অনেক দিশী বিলিতি সার্কেসও দেখেছ, জানি। কিন্তু ভায়া হলপ ক'রে বলছি, এমনতরটি কখনো দেখনি। না যাও, অবিশ্যি জোর করছি না; তবে গেলে ঠকতে না নিশ্চয়।—আচ্ছা, তাহলে আমি একাই ঘুরে আসি একবার!

অশোক উঠে দাঁড়ালো এবং আড় চোখে একবার ভবানীর দিকে চেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই বাইরে বেরুবার পোশাকে আবার এসে ঢুকলো ঘরে।

—কি হে একান্তই যাবে না, তাহ'লে?

ওদিকের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবছিল ভবানী। অশোকের কথায় চমকে উঠে ফিরে তাকালে।

—আশ্চর্য! তুমি কি সত্যিই যাচ্ছ নাকি?

—যাচ্ছি মানে? বেরিয়ে পড়েছি। তুমি যাও তো চলো—আর দেরি কোরো না। গোবরে পদ্ম দেখার ইচ্ছে যদি থাকে, চলো!

বলেই এক বিচিত্র হাসি হাসলে অশোক এবং সঙ্গে সঙ্গে চোখের এক প্রকার ভঙ্গী করলে।

আর আপত্তি করতে পারলে না ভবানী। অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেতে

রাজী হ'ল। তা ছাড়া বাড়িতেই বা একলা একলা করবে কী? তার চেয়ে একটু ঘুরে আসা যাক্ মেলাটা। অশোকের এই সার্কেস দেখার উদগ্র আগ্রহের কারণটাও জেনে আসা যাবে তাহলে।

যখন অশোকেরা পৌঁছলো যথাস্থানে তখন সার্কেস শুরু হ'য়ে গেছে। তাঁবুর বাইরে সেই খর্বাকার ছোকরাটা তখনো দাঁড়িয়েছিল। অশোককে দেখে এক গাল হেসে একটা প্রকাণ্ড সেলাম করলে। তারপর ছুটে চলে গেল একদিকে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এসে সসম্ভ্রমে তাদের তাঁবুর ভেতর যেতে অনুরোধ করলে। বললে: আসেন আপনারা বাবু—

সন্তর্পণে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো সে অশোক আর ভবানীকে তাঁবুর মধ্যে।

ভারী বিশ্রী লাগছে ভবানীর। অথচ উপায়ও নেই। অশোকের যেমন কাণ্ড! এখানে কোনো ভদ্রলোক কখনো আসে! ছি ছি—

কোনো রকমে এঁকতে বেঁকতে বেঁটে ছোকরাটার পিছন পিছন তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করলে তারা। বেশ ভিড় জমেছে—এতটুকু ফাঁক নেই কোথাও! খেলাও আরম্ভ হ'য়ে গেছে। একটা দাড়িওয়ালা মোটা লোক আগুন নিয়ে নানা রকম খেলা দেখাচ্ছে, আর অদ্ভুত ভাষায় সেই খেলার সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছে। তখনো সন্ধ্যার অনেক বিলম্ব আছে—দিনের আলো তখনো বেশ উজ্জ্বল; কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁবুর ভেতর আলো জ্বলে উঠেছে। জ্বলে উঠেছে গোটা কয়েক গ্যাস এবং একটা ডে-লাইট।

সার্কাসের বেঁটে ছোকরাটা দর্শকদের ভিড়ের পাশ কাটিয়ে তাদের একটা স্বতন্ত্র জায়গায় নিয়ে এসে বসবার বন্দোবস্ত ক'রে দিলে—একটা ভাঙা টুল আর একটা লোহার চেয়ার এনে পেতে দিয়ে।

অপ্রসন্ন মুখে লোহার চেয়ারটা টেনে বসে পড়লো ভবানী। অশোকও তার কাছ ঘেঁষে বসলো টুলটার ওপর এবং আড় চোখে

একবার তার বিরক্তিপূর্ণ মুখের পানে তাকিয়ে একটু হাসলো। তারপর বললেঃ ভায়া কি বড্ড চটেছ?

ভবানী কোনো কথা না বলে একবার শুধু কটমট্ ক'রে তাকালে তার দিকে।

আবার হাসলো অশোক।

—রাগ কোরো না ভায়া! মজা আছে—একটু সবুর করো।

কিন্তু সবুর আর করতে হ'ল না বেশি। ঠিক এই সময় তীক্ষ্ণ মধুর হাসির শব্দ কানে আসতেই তারা দুজনেই চমকে উঠে সামনের দিকে তাকালে। দেখলে একটি মেয়ে অদ্ভুত দেহভঙ্গী করতে করতে আর হাসির তুফান তুলে দ্রুত এগিয়ে আসছে ক্রীড়াস্থলে। সঙ্গে আসছে আরো গুটি তিনেক মেয়ে। যে বেঁটে ছোকরাটি পথ দেখিয়ে তাদের এইখানে এনেছিল, সে তাদের বসবার বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েই কোন্ ফাঁকে সরে পড়েছে—তারা কেউ লক্ষ্য করে নি। হঠাৎ দেখা গেল সেই ছোকরা কখন ক্রীড়াস্থলে অবতীর্ণ হয়েছে এবং কৌতুকজনক নানা অঙ্গ ভঙ্গী সহকারে মেয়েগুলিকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। মেয়েগুলিও রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হ'য়ে খেলা দেখাতে শুরু করলে। মেয়েগুলির প্রত্যেকেরই সাজ পোশাক প্রায় এক রকম, কেবল একটির কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে এবং তাকেই দলের প্রধানা খেলোয়াড় মেয়ে বলে মনে হয়। শুধু পোশাকেই নয়, রূপেও মেয়েটি দলছাড়া। তাকে দেখলে বিস্ময় লাগে। অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকতে হয় তার দিকে। এমন জঘন্য পরিবেশের মধ্যে কেমন যেন বেখাপ্পা লাগে মেয়েটাকে। সমগ্র দলটার সঙ্গে কোথাও এতোটুকু মানান নেই তার। গায়ের রং মেয়েটার একটু চাপা কিন্তু তাতেই যেন আরো মানিয়েছে তাকে। মুখখানার তুলনাই হয় না।—ভ্রমরের মতো কালো চোখ দুটোর মধ্যে কেমন একটা মাদকতা লুকিয়ে আছে যেন—একবার তাকালে দৃষ্টি আটকে যায়। স্বাস্থ্যপরিপুষ্ট সর্ব্ব দেহ ঘিরে তার পরিপূর্ণ যৌবন উল্লাস;—পরনে একটা ফিকে গোলাপী

রঙের টাইট ট্রাউজার, গায়ে ঘোর লাল রঙের আঁটসাঁট হাতকাটা জামা। মাথার চুলগুলো পাঁচ সাতটা বেণীতে বিভক্ত ক'রে সাপের মতো ছড়িয়ে দিয়েছে দেহের চারিদিকে।—

অপূর্ব! সত্যিই অপূর্ব দেখাচ্ছিল মেয়েটাকে। মনে হচ্ছিল যেন কোন দক্ষ শিল্পীর দীর্ঘ সাধনায় গড়া একটি জীবন্ত নারীমূর্ত্তি! এমনটি জীবনে কোনোদিন দেখেনি ভবানী। চোখ দুটো তার আটকে গেছে কখন মেয়েটার গায়ে—কিছুতেই ছাড়তে চাইছে না। মনেও তার নেশা ধরে গেছে। কী আশ্চর্য হাসি হাসতে পারে মেয়েটা!

অশোক এতোক্ষণ তার দিকে চেয়ে চেয়ে মুখ টিপে হাসছিল। সেই সঙ্গে লক্ষ্য করছিল তার হাবভাব। আর বোঝবার চেষ্টা করছিল তার মনের অবস্থা।

ভবানীর চরিত্র বেশ ভালো ক'রেই অধ্যয়ন করেছে সে। ভবানী কী চায় তা সে জানে। সুতরাং ভুল যে তার হয়নি—ভবানী যে মেয়েটাকে দেখে মুগ্ধ এবং লুব্ধ হয়েছে একথা বুঝে আত্মপ্রসাদ লাভ করলে সে। একটা সানন্দ মৃদু নিশ্বাসও পরিত্যাগ করলে। মনে মনে আগামী ভবিষ্যতের কী একটা পরিকল্পনা স্থির ক'রে পুনরায় একটু হাসলে।

ভবানীই তার অস্ত্র! ভবানীকে সামনে রেখে কার্যোদ্ধার করতে হবে তাকে। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে কোনো দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেবে না সে—আজ পর্যন্ত কোনো দিন দেয়ও নি। মুখে তার কেমন একটা কুটিল কাঠিন্য ফুটে উঠলো ক্ষণিকের জন্যে। মনে পড়লো এতাবৎ কতোগুলি নারীর সংস্পর্শ লাভের সুযোগ ঘটিয়ে দিয়েছে সে ভবানীকে, এবং ভবানীকে দিয়েই সে তার নিজের স্বার্থসাধনার পথ সুগম ক'রে নিয়েছে!

পৃথিবীতে বাঁচতে হ'লে—জীবনকে উপভোগ করতে হ'লে প্রয়োজন মতো ছলনা চাতুরির আশ্রয় নিতেই হবে। স্বার্থ-উদ্ধারের জন্যে, অভীপ্সা সাধনের জন্যে কোনো কাজ তুচ্ছ নয়—কোনো কাজ

ঘৃণ্য নয়। প্রয়োজন শুধু বুদ্ধির। নিজের বুদ্ধির প্রভাবে অপরের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন ক'রে কার্যোদ্ধার করাই হ'চ্ছে অশোকের নীতি। এর জন্যে কার কী পরিমাণ ক্ষতি হ'ল সে দেখবার অবকাশ নেই তার। সে দেখে শুধু নিজের লাভের পরিমাণ!

ভবানীকে এই সার্কেস দেখতে নিয়ে আসার পেছনেও গূঢ় অভিসন্ধি আছে তার! কিন্তু থাক—সে অভিসন্ধির কথা পরে প্রকাশ্য।

খেলা পূর্ণোদ্যমে চলেছে। অপরূপ দর্শন সার্কেসওয়ালী মেয়েটা সমগ্র দর্শকমণ্ডলীকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রেখেছে—সকলেরই একাগ্র ব্যগ্র দৃষ্টি তার প্রতি নিবদ্ধ। ভবানীর চোখও সেই থেকে মেয়েটার গায়ে জুড়েই আছে। আশ পাশে লক্ষ্য করার মুহূর্ত্ত অবকাশ নেই তার। সে যেন চোখ দিয়ে মেয়েটার গা' চাটছে।

এবার অশোক তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে বললেঃ কেমন ভায়া, রাগ পড়েছে তো? মেয়েটাকে কেমন দেখছ? ভারী চমৎকার না? যেমনি মিষ্টি কথা তেমনি হাসি। আবার নামটি আরো মিষ্টি! কী নাম জানো ওর?—উল্লাসী। বেশ মানিয়েছে ওকে নামটা না?

কোনো কথা বললে না ভবানী। অশোকের কোনো কথার কোনো জবাব দিলে না। শুনতে পেয়েছে কিনা তাও বোঝা গেল না। একই ভাবে উল্লাসীর দিকে চেয়ে রইলো।

অশোক আরও একটু ঘনিষ্ট হ'য়ে বসে ব'লে যেতে লাগলোঃ এদের দলের সবাই ওকে উলি ব'লে ডাকে। আমি কিন্তু উলির চেয়ে উল্লাসী ডাকটাই পছন্দ করি। আমার সঙ্গে বেশ আলাপ হ'য়ে গেছে মেয়েটার! ভারী গায়ে পড়া—

ভবানী একই ভাবে ক্রীড়ারতা উল্লাসীর পানে তাকিয়ে বসে রইলো। কেবল হস্তের ইংগিতে এবার অশোককে থামতে বললে একবার। পুনরায় অশোকের মুখে মৃদু সাফল্যের হাসি উদ্ভাসিত

হ'য়ে উঠলো। আর কিছু না বলে সে-ও এবার নীরবে খেলার দিকে দৃষ্টি ফেরালে।...

অসীম সাহসী মেয়ে উল্লাসী। মৃত্যুকেও বুঝি ভয় নেই তার। কখনো তারের ওপর নানাভাবে সাইকেল চালাচ্ছে সে, কখনো দড়ির দোলনায় দুলছে—কখনো পরমানন্দে বাঘের সঙ্গে খেলা করছে, আবার সাপের সঙ্গে কখনো বা নিপুণ সাপুড়ের মতো দুঃসাহসী খেলা খেলছে। সে একাই একশো। যাবতীয় কঠিন এবং দুঃসাহসী খেলা সে-ই প্রদর্শন করছে। খেলোয়াড়দের মধ্যে সেই প্রধান এবং মুখ্য—অন্যান্যেরা গৌণ। দর্শকেরা তারই খেলা দেখতে আসে; তাকেই দেখবার জন্যে ভিড় করে, চেঁচামেচি করে। তাঁবুর মধ্যে স্থান সংকুলান না হ'লে বাইরে অপেক্ষা করে—ডবল তিন ডবল দর্শনী দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে চায়। কি অসাধারণ আকর্ষণ মেয়েটার। চুম্বকের মতো যেন মানুষকে তার দিকে টানতে থাকে।

সার্কাস এমন কিছু অভিনব নয়। কোনো নতুনত্বই নেই, বিশেষত্বও নেই। নিতান্ত সাধারণ খেলা। পয়সা খরচ ক'রে এমন খেলা শহরে কেউ দেখেই না হয়তো। আয়োজনও অতি সামান্য। খেলোয়াড়রাও অপটু। কিন্তু অসামান্য ওই মেয়েটা। অসাধারণ ওর ক্রীড়া কৌশল। ওর হাসি কথা চাল চলন পোশাক পরিচ্ছদ সবই অভিনব, সবই চমকপ্রদ। মেয়েটা ব্যতীত এ খেলায় আর কিছু নেই। প্রতি মুহূর্তে দর্শকরা চকিত হ'যে উঠছে মেয়েটার খেলা দেখতে দেখতে। কখনো বিস্ময়াতঙ্কে, কখনো বা উল্লাসে রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠছে।

ভবানী বসে আছে; স্থির অপলক চোখে মেয়েটার দিকে চেয়ে বসে আছে। আবিষ্ট হ'য়ে পড়েছে সে। মনের ভেতর ঝড় বইছে। প্রচণ্ড ঝড়!—বেদের মেয়ের এতো রূপ!

উল্লাসী!

কানের ভেতর দিয়ে নামটা গিয়ে যেন মনের গোড়ায় নাড়া দেয়।

সার্থক নাম—উল্লাসী! ওর প্রতি অঙ্গভঙ্গিমায় উল্লাস—ওর দেহে উল্লাস—ওর দৃষ্টিতে উল্লাস। জীবজন্তু গুলো পর্যন্ত যেন ওর উল্লাসে আত্মহারা হ'য়ে পড়েছে—ওর বশ্যতা স্বীকার ক'রে যেন ধন্য হ'য়ে গেছে। আত্মহারা ভবানীর মনখানাও কখন কল্পনার জালে জড়িয়ে ফেলেছে ওই যৌবনবতী পরম সুশ্রী মেয়েটাকে। সে-ও যেন ওই বুড়ো নির্জীব বাঘটার মতোই মেয়েটার বশ্যতা স্বীকার করতে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠেছে। যেন অতিকায় ওই ময়াল সাপটার মতো তার মনখানা আষ্টেপিষ্টে বেষ্টন করতে চাইছে মেয়েটাকে।

উল্লাসী!

হ্যাঁ, উল্লাসী মাতাল ক'রে দিয়েছে তাকে—ক্ষেপিয়ে দিয়েছে তার ঘুমন্ত উচ্ছৃঙ্খল মনখানাকে। স্থান কাল কিছু মনে নেই তার।—মনে নেই আশপাশে কে কোথায় আছে না আছে। যাবতীয় দৃশ্যমান বস্তু অদৃশ্য হ'য়ে গেছে তার দৃষ্টি থেকে। সেখানে শুধু জেগে আছে একমাত্র ওই উল্লাসী।···

খেলা ভেঙে গেল। দর্শকেরা একে একে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেল তাঁবুর ভেতর থেকে। ভবানীর কোনো খেয়াল নেই—ভবানী তেমনি আচ্ছন্ন হ'য়ে বসে আছে। তন্ময় হ'য়ে ভাবছে উল্লাসীর কথা।—এমন সে দেখেনি—জীবনে দেখেনি। তার মনের তলায় ঘুমিয়ে থাকা প্রবৃত্তি সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠছে আস্তে আস্তে—এতদিন যে বিষধর কুণ্ডলী পাকিয়ে নিজের বিষে জর্জরিত হ'য়ে পড়েছিল অসহায়ের মতো মনের গহ্বরে—অকস্মাৎ সে ফণা বিস্তার ক'রে গর্জে উঠলো।—চাই—যেমন ক'রেই হোক চাই ওই বেদের মেয়েটাকে। যতো মাশুল লাগে লাগুক—

—কি হে, বিভোর হ'য়ে বসে আছ যে?

অশোক মৃদু ধাক্কা দিলে ভবানীর দেহে।

—বাড়ি যেতে হবে না? খেলা তো শেষ হ'য়ে গেছে। আবার না হয় কাল এসো।

—অ্যাঁ! ও হ্যাঁ—চলো!

চমক ভাঙলো ভবানীর। কল্পনার পাহাড় থেকে যেন হঠাৎ গড়িয়ে পড়লো বাস্তবের কঠিন মাটিতে। একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন ক'রে উঠে দাঁড়াতে গেল।

ভবানীর চিত্তচাঞ্চল্য বোধ করি বুঝতে পেরেছিল উল্লাসী। তাই কখন এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে হাসতে সুরু ক'রে দিয়েছিল। ভবানী লক্ষ্য করেনি তাকে এতোক্ষণ। এবার অকস্মাৎ চকিত হ'য়ে দৃষ্টি তুললে। তারপর—

—বাবুজী বকশিশ!—

বিদ্যুতের একটা প্রচণ্ড শিহরণ বয়ে গেল ভবানীর সমস্ত শরীরে। শিরায় শিরায় তপ্তরক্তের স্রোত উত্তাল হ'য়ে উঠলো। একটা বিপুল আলোড়নে তোলপাড় ক'রে দিলে তার মনের সমুদ্র। অভিভূতের মতো পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার ক'রে এগিয়ে দিলে সে উল্লাসীর দিকে।

—ইরে বাবা—

ছোঁ মেরে তার হাত থেকে নোটখানা ছিনিয়ে নিয়ে খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো উল্লাসী।

—রাজাবাবু, লোট দিছে গো! ইরে বাবা!—হি হি—দশ টাকা—

একটা অব্যক্ত অস্বস্তি পাক খাচ্ছে ভবানীর মনে। কিছুতেই যেন স্থির হ'তে পারছে না। এই মুহূর্তেই যেন একটা কিছু করা চাই তার। কিন্তু কি করবে স্থির করতে পারছে না। চিন্তাভারাক্রান্ত চিত্তে সার্কাস থেকে বেরিয়ে অশোককে অনুসরণ ক'রে বাড়ি ফিরলো। ফিরলো সারাটা পথ চুপচাপ ক'রেই—একটি কথাও বললে না, একটি প্রশ্নও করলে না সঙ্গী অশোককে। বাড়ি ফিরেও কোনো কথা হ'ল না। নীরবে বস্ত্রাদি পরিবর্তন ক'রে হাত

মুখ ধুয়ে আহার পর্ব সমাধা করলে; তারপর নিজের ঘরে গিয়ে শয্যায় দেহ এলিয়ে দিলে। কিন্তু চোখে ঘুম এলো না। সার্কাসওয়ালী উল্লাসীকে সে সংগোপনে মনের মধ্যে পুরে বাড়ি নিয়ে এসেছে। এখন নিরালা ঘরে তাকে মুক্ত ক'রে দিয়ে তার সঙ্গে রাত্রি যাপন করতে লাগলো। আজ অনেকদিন পরে একটি বস্তুর অভাব ভয়ংকরভাবে অনুভব করলো সে। আজ প্রায় বৎসরাধিক-কাল সে-বস্তু স্পর্শও করেনি। তার জন্যে বিশেষ কষ্টও অনুভব করেনি। কিন্তু আজ হঠাৎ সেই জিনিসটির জন্যে বড় ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো মন। অথচ বোধ করি তা পাবারও উপায় নেই। আর পাওয়া গেলেও সে ভালো নয়—দেশী! দেশী জিনিসের ওপর মোটেই সন্তুষ্ট নয় সে, নইলে হয়তো একটা উপায় হলেও হ'তে পারতো।

একবার নড়ে চড়ে শুলো ভবানী। বেশি নয়, উপস্থিত এক্ ঢোক হ'লেই প্রয়োজন মিটতে পারতো তার। একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগলো সে, আর ভাবতে লাগলো টুকরো টুকরো অজস্র ভাবনা।

এখানে সে যেন এক মুহূর্তও থাকতে পারছে না আর। এ যেন বন্দী জীবন, এ কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না।

নাঃ, কালই একটা যা হয় ব্যবস্থা করতে হবে। কলকাতায় যাওয়া ছাড়া তার উপায় নেই। কলকাতায় যেতেই হবে তাকে। আবার নতুন ক'রে জীবন শুরু করবে। কিন্তু উল্লাসী?—হ্যাঁ। উল্লাসীকে তার চাই-ই। যেমন করেই হোক উল্লাসীকে জীবনে পেতেই হবে তার। উল্লাসীকে নিয়েই নতুন ক'রে জীবন আরম্ভ করবে সে। এখনো যেন দেখতে পাচ্ছে সে হাস্য চটুল উল্লাসীকে। দেখতে পাচ্ছে তার উদ্দাম যৌবনশ্রী যেন দেহাবরণ তুচ্ছ ক'রে প্রকট হ'য়ে উঠতে চাইছে চোখের সামনে! দেখতে পাচ্ছে তার পল্লবভারাক্রান্ত আয়ত নেত্র-দুটির মাতাল করা দৃষ্টি! কী মোহ না জড়িয়ে আছে সে দৃষ্টিতে! আর

সবার ওপরে কণ্ঠস্বর ! অমন গলার আওয়াজ কোনোদিন শোনেনি সে। সুরে বাঁধা তারের যন্ত্রে পাকা হাতের মৃদু স্পর্শ পড়লে যেমন মধুরতর সুরসৃষ্টি হয়, ঠিক যেন তেমনি মিঠে গলার আওয়াজ।—বাবুজী, বকশিশ !—ইরে বাবা, রাজাবাবু বকশিশ দিছে গো-—দশ টাকা—হি হি—

উঠে পড়লো ভবানী শয্যা ছেড়ে !

নাঃ—চাই—যেমন ক'রে হোক উল্লাসীকে পেতেই হবে তার। —কিন্তু কেমন ক'রে—কী উপায়ে পাওয়া যায় ? সর্দারণীর বীভৎস ভয়ংকর চেহারাটা মনে পড়তেই কেমন একটু ভীত হ'য়ে পড়লো সে। পরক্ষণেই মনে পড়লো অশোকের কথা ঃ অর্থের জন্যে আর স্বার্থের জন্যে ওরা সব করতে পারে।—হ্যাঁ, অর্থ দিয়েই সে কিনে নেবে উল্লাসীকে ওদের কাছ থেকে। অশোককে দিয়েই কাযোদ্ধার করতে হবে। কিন্তু—কিন্তু অর্থ ! অর্থ কোথা থেকে সংগ্রহ করবে সে ?

অন্ধকার ঘরের মধ্যে চিন্তাচ্ছন্ন মনে পায়চারি করতে লাগলো ভবানী। চিন্তার শেষ নেই—একের পর এক চিন্তা জট পাকাতে লাগলো মাথার ভেতর। দেওয়াল ঘড়িটা ঢং ঢং ঢং ক'রে তিনবার বেজে উঠলো। বাইরে পল্লীর নৈশ অন্ধকারের বুক চিরে কোথায় একদল শিবা বিকট চিৎকার ক'রে উঠলো। নিকটে-—দূরে—আরো দূরে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে পড়লো সে ঐক্য চিৎকার ! দলের পর দল তাদের অস্তিত্ব ঘোষণা ক'রে চললো। তারপর আপনিই একসময় নীরব হ'য়ে গেল। খোলা জানলাটার সামনে এসে দাঁড়ালো ভবানী। জানালার ফাঁকে একবার তারকা মণ্ডিত আকাশের পানে তাকালে। একবার অন্ধকার প্রকৃতির সুশান্ত সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করলে। কিন্তু সবই অস্পষ্ট ! কিছুই ভালো দেখা যায় না। ডাকাতে-বিলের দিকে তাকাতে গেল—দেখতে পেলে না কিছুই—পুঞ্জীভূত অন্ধকারে দৃষ্টি হারিয়ে গেল শুধু। অগণিত মণিমাণিক্যের মতো চারিদিকের

গাছে গাছে জোনাকির জ্বলা নেভা—আকাশে নক্ষত্রের বাতি, তবু কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না কোথাও। কানেও শোনা যায় না বিশেষ কিছু। কেবল ঝিঁঝিঁদের একটানা গান, আর মাঝে মাঝে নিশাচর পাখিদের কর্কশ স্বর! এ ছাড়া বাতাসের মর্মর ধ্বনি। অন্য কিছু তেমন শোনা যায় না।

তন্ময় হ'য়ে সেই খোলা বাতায়নের সামনে দাঁড়িয়ে রইলো ভবানী। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো নিজের বর্তমান আর ভবিষ্যতের কথা। ভাবতে লাগলো উল্লাসীর কথা!

॥ তিন ॥

ভবানীর পাশের ঘরেই থাকে অশোক। আজ অশোকের মনেও ক্রমাগত চিন্তার সরীসৃপ সঞ্চরণ ক'রে ফিরছে। সেও জীবনের খতিয়ান খুলে বিনিদ্র বসে আছে তার ঘরে। সার্কাস থেকে ফেরবার পথে সে লক্ষ্য করেছিল ভবানীর বিমনা ভাব। বুঝতে পেরেছিল ভবানীর মনের গতি কোন্ পথে ছুটে চলেছে। বুঝতে পেরেছিল তার টোপ ব্যর্থ হয়নি। এখন ইচ্ছে করলে স্বচ্ছন্দে শিকার খেলিয়ে ডাঙায় তুলতে পারে। কিন্তু কি জানি কেন—সার্কাস থেকে বেরিয়ে হঠাৎ মনটা তার কেমন বিগড়ে গেল। মনে হ'ল যেন, কাজটা সে ভালো করছে না। নির্বোধ, নারীসঙ্গলোলুপ ব্যভিচারী ভবানীর জন্যে কোনো অনুতাপ নেই তার মনে। দুনিয়ায় ভবানীদের প্রয়োজন আছে, নইলে অশোকেরা চালাবে কি ক'রে? সেজন্যে এতোটুকু চিন্তা বা পরিতাপ তার মনে নেই। ভবানী গোল্লায় যাক। অনেক পয়সা আছে ভবানীর বাপের—বিশ-পঞ্চাশ হাজার কি লাখ দু লাখ যদি সে উড়োয় কোনো ক্ষতি হ'বে না সংসারের। আর উড়োতেই যদি না পারলে তো বড়লোকের ছেলে হয়েছে কেন? ওদের মুখ চেয়েই তো অশোকদের দিন গুজরান করতে হয়। কিন্তু

সে কথা নয়—ভবানীর কথা সে মোটেই ভাবে না—এতোদিন ভাবেওনি। সে আজ হঠাৎ অনুরাধার কথাটা চিন্তা ক'রেই কেমন অস্বস্তি বোধ করছে। বড় ভালো মেয়ে আর বুদ্ধিমতী মেয়ে অনুরাধা! কোনো দোষে দোষী নয়, অথচ তারই বরাতে ভবানীর মতো একটা পেজো লম্পট স্বামী জুটলো! আর ভাগ্যবশে সেই লম্পটের সাহায্যকারী অনুচর অশোক!

অনুরাধা বিশ্বাস ক'রে তাকে—অকপটে বিশ্বাস করে। শুধু অনুরাধা নয়, ভবানীর বাবা মা দাদা সবাই তাকে বিশ্বাস করেন। হয়তো ভালোওবাসেন। তার বাইরেটা দেখেই তাঁরা তাকে বিশ্বাস করেছেন, ভালোবেসেছেন। মুখোশ খুলে ভেতরটা তো দেখেন নি। দেখলে নিশ্চয় শিউরে উঠতেন! তার বাইরে দেখে তো অনুমান করতে পারেন নি তাঁরা যে, এই শান্ত স্বভাব মানুষটির ভেতর দিবারাত্র শয়তানের চক্রান্ত চলেছে!

সামনা-সামনি তার সঙ্গে কথা কয় না বটে অনুরাধা, তবে অন্তরাল থেকে কয়। তাকে ঠাকুরপো বলে ডাকে। এখানে আসার আগের দিন অনুরাধা বলেছিল: "ঠাকুরপো, আমার একটি কথা রাখবেন?

—নিশ্চয়। রাখবো বৈকি।

পরিহাস ক'রে বলেছিল সে: কিন্তু বউদি, আমি গরীব মানুষ—আমার জামার যে পকেটটা ছেঁড়া।

—তা হোক। না হয় বড়লোক বউদির জন্যে পকেটটা একটু সেলাই ক'রে নেবেন।

ঘরের ভেতর থেকে অনুরাধার চাপা হাসির শব্দ শোনা গিয়েছিল।

এমন জবাব প্রত্যাশা করে নি অশোক। অবাক হ'য়ে গিয়েছিল সে। মুখে কথা জোগায়নি।

অনুরাধা তারপর বলেছিল: আপনি তো সবই জানেন ভাই। সেখানে ওঁর দিকে একটু নজর রাখবেন। কেমন রাখবেন তো?

—আচ্ছা।

—আচ্ছা নয়, কথা দিন—রাখবেন! একমাত্র আপনি ছাড়া একাজ আর কেউ পারবেও না।

চমকে উঠেছিল অশোক। বউটা বলে কি? তাকে কি চিনতে পেরেছে নাকি? জিজ্ঞাসা করেছিল: কেন? আর কেউ পারবে না কেন?

—আপনি যে ওঁর বন্ধু। আপনার কথা উনি বড্ড শোনেন—

কথাগুলো সবই মনে পড়ছে আজ অশোকের। অনুরাধার সকাতর অনুরোধের সুরও মনে পড়ছে। ইচ্ছে করলে এখনো হয়তো ভবানীর দিকে নজর রাখা যায়। এখনো হয়তো রক্ষা করা চলে অনুরাধার অনুরোধ। পরে আর উপায় থাকবে না।

একটু হাসলে অশোক। একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে একটু হাসলে আপন মনে। কি অদ্ভুত প্রবৃত্তি মানুষের। বাড়িতে অনুরাধার মতো অমন রূপবতী গুণবতী স্ত্রী রয়েছে যার সে কেমন ক'রে একটা নিকৃষ্ট শ্রেণীর মেয়ের মোহে পাগল হয়? রূপে গুণে শিক্ষায় কোথায় অনুরাধা আর কোথায় সার্কেসওয়ালী উল্লাসী। ওই জন্যেই কথায় বলে—যার সঙ্গে যার মজে মন···

কিন্তু অশোক নিরুপায়। অনুরাধার অনুরোধ রক্ষা সম্ভব নয় তার পক্ষে। নিজের স্বার্থের ক্ষতি সাধন করতে পারবে না সে। কারো জন্যেই পারবে না। অনুরাধার জন্যেও না। মেয়েমানুষের মিষ্টি কথা, মুচ্‌কি হাসি, পানসে চোখের জল—তার মনে কোনো রেখাপাত করতে পারে না। মেয়েমানুষের কথায় ভোলবার মতো দুর্বলতা তার নেই। জীবনে অনেক মেয়ে নিয়ে কারবার করেছে সে —এতোটুকু বয়েস থেকে মেয়েমানুষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রে আসছে। কাজেই কে একটা মেয়ে অনুরাধা, কি একটা অনুরোধ করেছে বলেই নিজের আখের নষ্ট করতে সে কিছুতেই রাজী নয়। যাক্—ভেসে যাক ভবানী! অধঃপাতের শেষ সীমায় তলিয়ে

যাক্, কোনো ক্ষতি নেই তার। বরং তাকে সহায়তা করবে সে নিঃশেষে ডুবে যেতে। আর সর্বদাই সচেতন থাক্‌বে নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে।

কারো অধীনতা সহ্য হয় না তার। পরাধীন চাকরি তাই করতে পারে না। ব্যবসা করারও মূলধন নেই—আর ব্যবসা বুদ্ধিও নেই। প্রাণেও শখ প্রচুর। জীবনে একটি কাজ তার ভালো লাগে, সেইটাই তার সাধনা—সে হ'চ্ছে অভিনয়! শিল্প হিসাবে—জীবনের একমাত্র সাধনা হিসাবে এই অভিনয়কেই বেছে নিয়েছে সে। এই অভিনয়ই তার জীবিকাও বটে! কিন্তু কারো অধীনে অভিনয় করতে নারাজ সে। তার ধারণা তাকে শিক্ষা দেবার মত শিক্ষা এদেশের কোনো অভিনেতার নেই। তাছাড়া অভিনয় করেই তো শুধু তৃপ্ত নয় সে। অভিনয় করানোও চাই তার। অর্থাৎ নিজেই একটি সম্প্রদায় গ'ড়ে তুলে তাদের দিয়ে আপন পরিচালনায়—আপন রুচি অনুযায়ী অভিনয় করাতে চায় সে। এই তার জীবনের একমাত্র অভীপ্সা। এর জন্যে যে কোনো কাজ করতে প্রস্তুত সে। তা সে যতো হীন আর যতো নিন্দনীয়ই হোক।

ভবানী তার যোগ্য সঙ্গী, এবং শিষ্যও বটে। অনেক ভাগ্যে সে ভবানীকে পেয়েছে। ভবানী বিরাট বড়লোকের ছেলে। অভিনয়ের শখও ভবানীর প্রচুর। যদিও আর্ট সম্বন্ধে কোনো বাস্তব জ্ঞান তার নেই—ভালো অভিনয় করতেও পারে না, কিন্তু তবুও অভিনয় করবার জন্যে পাগল। অভিনয় ব্যাপারে চোখ বুজে অর্থ অপব্যয় করার জুড়ি নেই ভবানীর। তার ওপর ভবানী মদ্যপ এবং নারী-বিলাসী। ভবানীর দুর্বলতা সে জানে এবং সেই দুর্বলতার সুযোগ নিতে মোটেই অবহেলা করে না সে।

যেদিন থেকে পরিচয় হয়েছে ভবানীর সঙ্গে, ভবানীকে সেইদিন থেকেই আস্তে আস্তে আপন আয়ত্তে আনতে শুরু করেছে অশোক। সামান্যতম আত্মীয়তার সূত্র ধরে ঘনিষ্ঠতা নিবিড় ক'রে তুলেছে।

তারপর নিজের বুদ্ধির প্রভাব বিস্তার ক'রে একান্ত বশীভূত করেছে নির্বোধ ভবানীকে।

কলেজে দু'জনেই ছিল তারা সহপাঠী। এই সময় থেকেই তাদের বন্ধুত্ব আরো গাঢ় হয়। কলেজে নানা ফাংশনে দল তৈরি ক'রে অভিনয় আরম্ভ করে তারা। বাইরে ক্লাব সৃষ্টি ক'রে থিয়েটার করতে থাকে। কিন্তু নেশা ক্রমেই বেড়ে চলে। পুরুষকে মেয়ে সাজিয়ে তার সঙ্গে অভিনয় করতে আর ভালো লাগে না। তাতে প্রাণ নেই। ফিলিংস্ আসে না। অবশেষে নারী নিয়ে শুরু হ'ল অভিনয়—সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ভাড়া ক'রে। অজস্র অর্থ অপব্যয় করতে লাগলো ভবানী—অশোকের নির্দেশে। কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল ভবানী নিঃশেষ হ'য়ে গেছে। ইতিমধ্যেই কলেজেও ছেদ পড়ে গেছে তার—লেখাপড়া ছেড়ে নারী, সুরা আর অভিনয়ের মধ্যে তলিয়ে গেছে। অশোক কিন্তু তলিয়ে যায়নি নিজে। লেখাপড়াও ছেড়ে দেয় নি যতোদিন না বি. এ. পাস করেছে।

আর নারী! ছিঃ, অসংখ্য নারীর সংস্পর্শে এসে অরুচি হ'য়ে গেছে, আর ভালো লাগে না নারী, এবং সুরাকেও অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা ক'রে সে। ভবানীকে ব্যভিচারের সীমাহীন সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে নিজে তীরে দাঁড়িয়ে রসদ সংগ্রহ করেছে সে এতোদিন শুধু।

অতি সাধারণ দরিদ্র পরিবারের ছেলে অশোক। অল্প বয়সেই পিতৃমাতৃহীন। আত্মীয় পরিজনের গলগ্রহ হ'য়ে অনাদরে অবহেলায় জীবনের বাল্য কৈশোর অতিক্রম করেছে সে। তাদেরই অনুগ্রহে আর দাক্ষিণ্যে প্রবেশিকা পরীক্ষা কোনোক্রমে দিতে পেরেছে। লেখাপড়ায় উদগ্র আগ্রহ ছিল তার। ইস্কুলেও খ্যাতি ছিল মেধাবী ছাত্র বলে। সেজন্যে ইস্কুলে ফ্রী পড়ার সুযোগ পেয়েছিল। প্রবেশিকায় সামান্য বৃত্তি পেয়েছিল সে—তাই সম্বল ক'রে উচ্চ শিক্ষার অভিলাষে কলেজে ভর্তি হ'ল। আর সেই সঙ্গে আত্মীয়দের অনুগ্রহও এইখানে শেষ হ'ল। আত্মীয়রা ভেবেছিলেন—ম্যাট্রিক

পাস ক'রে বুঝিবা একটা চাকরী বাকরী জুটিয়ে নিয়ে স্বাবলম্বী হবে সে—মুক্তি দেবে তাঁদের দায়িত্ব থেকে এবং সময় অসময় কিছু কিছু সাহায্যও পাওয়া যাবে তার কাছে। কিন্তু তা না ক'রে সে কলেজে ভর্তি হওয়ায় বিরক্ত হলেন তাঁরা। ফলে তাকে আশ্রয়চ্যুত হ'তে হ'ল এবং নিজের পথ নিজেকে অন্বেষণ ক'রে নিতে হ'ল।

এইখানেই শুরু হ'ল তার জীবন সংগ্রামের দ্বিতীয় অধ্যায়।...

একটি পরিবারে থাকা খাওয়া আর সামান্য হাত খরচার বিনিময়ে দুটি ছোট ছোট ছেলেকে পড়াবার কাজ সংগ্রহ ক'রে নিলে অশোক। এবং নিজের কলেজের পড়াও চালাতে আরম্ভ করলে সেই সঙ্গে। কিন্তু বিধি বাম! এও তার ভাগ্যে বেশীদিন সইল না। বছর খানেকের মধ্যে এ আশ্রয়টিও হারাতে বাধ্য হ'ল সে।

আজো মনে আছে অশোকের—স্পষ্ট মনে আছে, কেমন ক'রে ধীরে, অতি ধীরে অধঃপাতের নিঃসীম অন্ধকারে হারিয়ে গেল সে। কেমন ক'রে আবার খুঁজে পেল আপনাকে—খুঁজে পেল এক নতুন জীবনকে নতুন আলোর মাঝখানে! মনে আছে তার জীবনের সেই অনাস্বাদিত প্রথম প্রেমের কাহিনী। আজো চোখের সামনে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে কমলাকে—দেখতে পাচ্ছে টুনুদি'কে!

সুপুরুষ না হলেও অশোকের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল এবং এখনো আছে যা সাধারণ নর-নারীকে স্বতঃই তার প্রতি আকর্ষণ ক'রে থাকে। তাকে ভালো লাগে দেখতে এবং দেখলে কেমন যেন আলাপ করতে ইচ্ছে হয় তার সঙ্গে। ভালোবাসতেও ইচ্ছে করে অনেকের। তার মুখের মধ্যে, তার চোখের মধ্যে কি যেন একটা আছে যা সাধারণের মধ্যে পাওয়া যায় না। আর একবার তার সঙ্গে আলাপ করলে তাকে ভোলা শক্ত। কথা বলতে জানে সে। জানে মানুষকে বশীভূত করতে।

যে-বাড়িতে আশ্রয় মিলল তার—অর্থাৎ যে বাড়িতে থেকে ছাত্র

পড়িয়ে নিজে কলেজে পড়তে লাগলো, ঘটনাটা ঘটলো সেইখানেই। অপ্রত্যাশিত ভাবেই ঘটে গেল একদিন।

মাত্র সতেরো বছর বয়েস তখন অশোকের। শান্ত সুধীর স্বভাব। কারো মুখের পানে চোখ তুলে কথা বলতে পারে না। কুণ্ঠিত ভীরু চাউনি। খায় দায় থাকে, ছাত্র পড়ায়, নিজে পড়ে, কলেজে যায়। নিজের অবস্থা সম্বন্ধে সর্বদাই সচেতন। যেমন করেই হোক লেখাপড়া শিখতেই হবে তাকে, বড় হতেই হবে। মানুষ হতেই হবে। এই ছিল তার ধ্যান ধারণা চিন্তা। অন্য কিছু ভাববার অবকাশও ছিল না, ইচ্ছাও হয় নি। প্রেম বস্তুটার সঙ্গে বাস্তব পরিচয় ঘটেনি তার তখন। হয়তো ভালো ক'রে বুঝতোও না। আর কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রণয় বা গোপন মিলন—সেতো ছিল কল্পনাতীত ব্যাপার।

কিন্তু দুনিয়ার খেলাঘরে কখন কী যে ঘটে কিছুই বলা যায় না!

অশোকের সেই ছাত্র দুটির নাম ছিল—দিবাকর আর সুধাকর! দু'ভাই তারা। অবস্থাপন্ন লোকের ছেলে। জানকীবাবু বড় কারবারী —বড়বাজারে তাঁর মস্ত মশলার দোকান। লেখাপড়ার তেমন চর্চা ছিল না জানকীবাবুর বাড়িতে। তাঁর বড় ছেলে প্রভাকর দীর্ঘ অধ্যবসায়ে ফার্স্ট বুকের ভেড়ার পাতা পর্যন্ত পৌঁছে আর এগুতে পারে নি! তারপর থেকে পৈতৃক কারবারে মনোনিবেশ করেছে। দিবাকর সুধাকরও যে পরিশেষে জ্যেষ্ঠের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে সে বিষয়ে একরকম নিঃসন্দেহ ছিলেন জানকীবাবু। তবুও অশোককে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন, যতটা হয় চেষ্টা ক'রে একবার দেখবেন বলে। কিন্তু সে কথা যাক্!

জানকীবাবুর তিনটি ছেলে এবং দুটি মেয়ে। বড় মেয়েটির বিয়ে হ'য়ে গেছে, ছোট কমলার বিয়ের বয়স বহুদিন উত্তীর্ণ হওয়া সত্বেও তখনো বিয়ে হয় নি। দেখতে শুনতেও নিতান্ত মন্দ ছিল

না কমলা ; তথাপি কেন তার যথাকালে বিয়ে হয় নি সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর।

প্রথম প্রণয় পর্ব শুরু হয় অশোকের এই কমলার সঙ্গেই। বয়সে কমলা বোধ হয় বেশ কিছু বড়ই ছিল অশোকের চেয়ে। কিন্তু সেজন্যে প্রণয় বাধা পায় নি তাদের। প্রথম প্রথম ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি অশোক। দেখতো—যখন তখন চোখ ফেরালেই কমলার সঙ্গে চোখোচোখী হ'য়ে যেতো তার। আর তৎক্ষণাৎ ফিক্ ক'রে হেসে সরে যেতো কমলা। তারপর সাড়া-শব্দ ক'রে তার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করতে আরম্ভ করে সে এবং দৃষ্টি বিনিময় হ'লেই জিভ ভেঙিয়ে পালায়। এই অদ্ভুত আচরণের হেতু বুঝতে পারতো না তখন অশোক। বোকার মতো চেয়ে থাকতো ফ্যাল ফ্যাল ক'রে। আরো অবাক হ'তো যখন মাঝে মাঝে পাকানো পাকানো কাগজের টুকরো এসে তার গায়ে পড়তো ; আর সেই কাগজ খুললেই দেখতে পেতো তাতে আঁকা-বাঁকা কাঁচা হাতের লেখা কয়েকটি অক্ষর ঃ ভারী বোকা!—সময় সময়—'ন্যাকারাম', 'বোকচন্দ্র', 'হাঁদাগঙ্গা' প্রভৃতি লেখা থাকতো। আকাশ-পাতাল ভেবেও সে স্থির করতে পারতো না, এসবের অর্থ কী? কেন মেয়েটা এসব লেখে? কখনো কখনো যাবার সিঁড়ি দিয়ে উঠবার নামবার সময় হঠাৎ কমলার সামনে পড়ে গেলে, চকিতে চারদিকে চেয়ে কমলা তার গায়ে ধাক্কা মেরে কিংবা চিমটি কেটে পালাতো। যাবার সময় ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে যেতো ঃ নেকুস্! এতো বোকা কেন?

সারাদিন অশোক অবাক হ'য়ে ভাবতো—কি বোকামি করলে সে? কিসে বোকা হ'ল? নেকুসেরই বা মানে কী?

আজ সে-সব কথা মনে পড়লেই হাসি পায় অশোকের। বেজায় হাসি পায়। বাস্তবিকই বোকা ছিল সে তখন। কমলার মনোভাব বুঝতে পারি নি। কতো রকম উপায়ে কমলা তার মনের কথা ব্যক্ত করবার চেষ্টা করেছে—কিছুতেই বুঝতে পারে নি সে

সেদিন। অবশেষে কমলা বাঁকা পথ ছেড়ে সোজা পথে আক্রম' চালালে।

সে এক অন্ধকার রাত্রির ইতিহাস। বাইরে কাল-বৈশাখী: দুরন্ত দুর্যোগ, আর ভেতরে—জানকীবাবুর মস্ত বাড়ীর ত্রিতলের একা ছোট্ট অন্ধকার ঘরে একাকী সুপ্তিমগ্ন অশোক। অকস্মাৎ একটা প্রচ' নিষ্পেষণে ঘুমটা ভেঙে গেল তার। মুখের ওপর কি যেন একটা চে' রয়েছে—নিশ্বাস নিতে কষ্ট হ'চ্ছে—বুকের ওপর একটা মস্ত ভা' বোঝা। প্রথমটা ভয়ংকর হতবুদ্ধি হ'য়ে পড়েছিল সে। তারপ: যখন বুঝলে—তাকে কেউ সবলে চেপে ধরেছে, বুকের মধ্যে তা: মুখটা সজোরে চেপে রয়েছে—তখন অতি কষ্টে মুখখানা সরিয়ে নি' চিৎকার করতে গেল, কিন্তু পারলে না। সঙ্গে সঙ্গে একজোড়া তপ্ত অধর এসে তার অধরে চেপে বসে গেল। উত্তপ্ত উষ্ণ নিশ্বাস-প্রশ্বাস যেন পুড়িয়ে দিতে লাগলো তার মুখখানা। দেহটা আরো দলিত মর্দিত হ'তে লাগলো। আর মুক্তির জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো সে।

ব্যাপারটা তখনও ভালো ক'রে বুঝতে পারে নি অশোক। বুঝলে মিনিট দুই পরে কমলার কম্পিত চাপা কণ্ঠ শুনে: না, ছাড়বো না আমি—কিছুতেই ছাড়বো না।

বলার সঙ্গে সঙ্গে চললো আবার সেই উন্মত্ত আচরণ। চুম্বনে চুম্বনে অস্থির ক'রে তুললো তাকে। তার নগ্ন বক্ষের প্রগাঢ় পীড়নে রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠতে লাগলো সে। শিরা উপশিরার মধ্যে উত্তপ্ত শিহরণ বইতে লাগলো। সমস্ত চৈতন্য যেন আস্তে আস্তে আচ্ছন্ন হ'য়ে এলো তার। সে যে কী এক অব্যক্ত অনুভূতি ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। কিন্তু যতো দূর মনে আছে—কমলার সেই বেপরোয়া উৎপীড়ন নিষ্পেষণ খুব খারাপ লাগেনি তার সেদিন। আরো যেন ভালো লেগেছিল সেদিনের কথাগুলি তার: আমি মরে যাবো, তোমাকে না পেলে আমি কিছুতেই বাঁচবো না। বলো? বলো তুমি আমার হবে? আমার

সব নাও তুমি, নিয়ে আমার হও। বলো হবে? নইলে কিন্তু আমি ঠিক মরে যাবো। বলো আমায় ভালোবাসবে?

এমনি অসংলগ্ন কতো কথা।

সব কথা আজ মনে পড়ে না বটে, তবে সে অনেক কথা। শেষ যেন আর হ'তে চায় না।

তারপর প্রতিদিন রাত্রির গভীরে আত্মগোপন ক'রে কমলার গতায়াত শুরু হ'ল অশোকের ঘরে। কমলার কামনার কুম্ভীপাকে এমনি ক'রে অবগাহন করতে লাগল সে।

এমনি ভাবেই কাটছিল মন্দ নয়। কিন্তু আর কাটলো না। হঠাৎ একদিন টুনুদির আবির্ভাব ঘটলো তাদের মাঝখানে। টুনুদি কমলার পিসতুতো বোন। বিধবা এবং বিপুল বৈভবের অধিকারিণী। বয়স ত্রিশ অতিক্রম ক'রে গেছে।

টুনুদির খাতিরের অন্ত নেই কমলাদের বাড়ীতে। জানকীবাবু থেকে আরম্ভ ক'রে বাড়ীর প্রত্যেকটি নর-নারী টুনুদির সুখ সুবিধার প্রতি সন্ত্রস্ত সজাগ। টুনুদি এ সংসারে যেন এক মহারাজ্ঞীর মতো আবির্ভূতা হ'ল। সকলেই টুনুদি বলতে অজ্ঞান। অবশ্য আজ বুঝতে পারে অশোক যে, খাতিরটা টুনুদিকে ছিল না—ছিল তার পয়সাকে। কিন্তু সে যাই হোক, সেই প্রথম দিনেই টুনুদির সুনজরে পড়ে গিয়েছিল অশোক। ভুরু কুঁচকে তার দিকে চেয়ে টুনুদি কমলাকে জিজ্ঞাসা করেছিলঃ ছেলেটি কে রে, কমল? ভারী মায়া মাখানো মুখখানি তো!

—দিবা সুধার মাস্টার।

দুষ্টামির চাপা হাসি হেসে চকিতে একবার অশোকের দিকে তাকিয়ে কমলা বলেছিলঃ আমাদের বাড়ীতেই থাকে। দিবা সুধাকে পড়ায় আর নিজেও কলেজে পড়ে।

তারপর কমলা তার পরিচয় অবস্থা সমস্তই জানায় একে একে টুনুদিকে।

সব শুনে টুনুদি বলেছিলেনঃ বাঃ। বেশ ছেলেটি! আমার যদি ওই রকম একটা ছোট ভাই-টাই কি দেওর থাকতো!

কথাটা শুনে ভারী মনে লেগেছিল অশোকের। সাহস সঞ্চয় ক'রে তাই কাছে এগিয়ে গিয়ে টুনুদির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে সে এতক্ষণে। বললেঃ আমি কি আপনার ভাই হ'তে পারি না, দিদি।

শশব্যস্তে টুনুদি তার মাথায় হাত দিয়ে অত্যন্ত প্রসন্ন স্বরে বলে উঠলেনঃ কেন পারবে না ভাই! তুমি তো আমার ভাই-ই।

মনে আছে অশোকের সে কথা। মনে আছে টুনুদিকে। অমন মিষ্টি ক'রে কথা কেউ কোনোদিন বলেনি তার সঙ্গে। অমন স্নেহের সম্বোধনও তার আগে আর শোনেনি সে। মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। জন্মাবধি স্নেহ-ভালোবাসার সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ছিল না তার। অন্তরের সেই দিকটা মধ্যাহ্ন মরুভূমির মতো খাঁ খাঁ করতো দিবারাত্রি। হঠাৎ কমলাই প্রথম খেপা বাতাসের মতো ধূলি-জঞ্জাল উড়িয়ে আবির্ভূত হয়েছিল তার মরু-জীবনের বিশুষ্ক সৈকতে। কমলার মুখে ভালোবাসার কথা শুনতেও বেশ লাগতো তার। ভাবতো কমলার মতো মিষ্টি ক'রে কথা আর কেউ বলতে পারবে না। কিন্তু সে ভুল তার টুনুদি ভেঙে দিলে। টুনুদি যেন স্নেহ-শান্তির শীতল-মধুর স্পর্শ বুলিয়ে দিলে তার অন্তরে।

ক'দিনের মধ্যেই মধুর ব্যবহারে টুনুদি তাকে একান্ত আপনার ক'রে নিলে। সে যে এ সংসারের কেউ নয়—একটা বাইরের লোক, এ বাড়ির সামান্য একজন কর্মচারী ব্যতীত কিছু নয়—টুনুদির ব্যবহারে তা বোঝবার উপায় রইলো না। এমন কি যখন তখন নিজের ঘরে টুনুদি ডেকে পাঠাতো তাকে—কখনো কখনো আবার নিজেও উপস্থিত হতো তার ছোট্ট ঘরখানিতে এসে।

টুনুদি প্রায়ই বলতোঃ পাড়াগাঁয়ে তো তুমি থাকতে পারবে না

ভাই, নইলে তোমায় আমি নিয়ে যেতাম আমার বাড়িতে। সেখানে তোমার কোনো কষ্ট হ'তো না।

যত্ন করতে জানতো টুনুদি। তার খাওয়া-দাওয়া যেন হঠাৎ বদলে গেছলো টুনুদি আসার পর থেকে।

বাড়ির একটা চ্যাংড়া মাস্টারের প্রতি টুনুদির সেই ব্যবহারটা কেউ তেমন পছন্দ করতো না বাড়িতে। কানাঘুষা নানা রকম চলতো। তবে সামনা সামনি প্রতিবাদ কেউ করতে পারতো না—সাহসও করতো না। টুনুদি প্রত্যেকদিন সামনের খাবারের দোকান থেকে খাবার কিনিয়ে আনাতো। বাড়ির ছেলেমেয়েদের নিজের হাতে ভাগ ক'রে দিতো, আর একটা ভাগ সযত্নে তার জন্যে রেখে দিতো। কলেজ থেকে সে ফিরলে তাকে কাছে বসিয়ে খাওয়াতো। তাঁর সাজ পোশাকের দিকেও টুনুদির লক্ষ্য ছিল। ছেঁড়া বা ময়লা কাপড় জামা পরতে দিতো না তাকে। লুকিয়ে কয়েকখানা ভালো ভালো কাপড় জামা কিনেও দিয়েছিল। মোটের ওপর ক্রমশ যেন টুনুদির স্নেহ-ভালোবাসা একটু বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পৌঁচেছিল।

কমলা কিন্তু কিছুতেই সহ্য করতে পারতো না টুনুদিকে। লক্ষ্য ক'রে দেখেছে অশোক, টুনুদির সঙ্গে সে হেসে কথা কইলে কি গল্প করলে রাগে মুখ চোখ রাঙা হ'য়ে উঠতো কমলার। অন্তরালে এ নিয়ে অনেক অভিযোগ করতো সে অশোকের কাছে। বলতোঃ মুখপুড়ি অন্যবার এসে এক মাস দু মাস থেকেই চলে যায়—এবার আর যাবার নাম করছে না। তুমি কিন্তু কিছুতেই ওকে ভালোবাসতে পাবে না এই বলে দিলুম! আমাকে আবার হতচ্ছাড়ি বলে কি জানো? বলে 'তোর এখনো বিয়ে হয়নি কমলা—অশোকের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করিস নে—বেশি কথাবার্তা বলিসনে, লোকে নিন্দে করবে! সোমত্ত ছেলেমেয়ের একটু সাবধানে থাকতে হয়।' ওরে আমার সাবধান উলি রে! তুই নিজে সাবধানে থাকগে।

তোর কথা জানতে আর কারো বাকী নেই। বড়লোক, পয়সা আছে তাই আর কেউ ঘাঁটায় না; নইলে জানে না কে? বাড়ির একটা চাকরের সঙ্গে সেবার কম ঢলাঢলি করেছিল ও মাগী!

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিল অশোকঃ কার কথা বলছো? টুনুদি—

—হ্যাঁ গো, হ্যাঁ, তোমার টুনুদির কথা বলচি। উনি তো কম মেয়েমানুষ নন। অনেক কাণ্ড করেছেন। অঢেল পয়সা আছে—আর মুখও আছে, তাই কেউ ভয়ে কিছু বলে না, নইলে ওঁর কীর্তি অনেক!

—টুনুদি! না না, তাকি কখনো হয়? তুমি রাগ ক'রে যা তা বলছো। টুনুদি সে রকম নয়!

—না, মোটেই নয়। একবার জিজ্ঞেস কোরো না তোমার পিরিতের টুনুদিকে যে, সেবার কাশীতে তীর্থ করতে না কি করতে গিয়েছিল? ওঁর সেই ছোঁড়া চাকর অধরাটারই বা কি হ'ল?

একটু থেমে কমলা বলেছিল: আমার জানতে কিছু বাকী নেই। ওই নিজের মুখে কতো কথা বলেছে। আমাকে এ সব শেখালে কে? ওই তো শিখিয়েছে। এখন আবার সাধু সেজে সাবধান করা হ'চ্ছে। আবার আমার ওপর নজর রেখেছে হারামজাদী।

অবাক হ'য়ে তাকিয়েছিল অশোক কমলার দিকে। টুনুদির সম্বন্ধে অতোবড় অভিযোগ কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেনি সেদিন। ভেবেছিল, তাও কি কখনো হয়, না হ'তে পারে? টুনুদি কখনো খারাপ হ'তে পারে না। টুনুদির দ্বারা কোনো মন্দ কাজ সম্ভব নয়। কিন্তু সে ধারণা তার ক'দিন পরেই উল্‌টে গিয়েছিল।

বেশি নয়, মাত্র চার পাঁচদিন পরে একদিন শরীরটা অশোকের খুব খারাপ হয়েছিল। কলেজ থেকে ফিরেই সে বিছানায় শুয়ে পড়েছিল। দিবা সুধাকে পড়াতেও বসতে পারেনি সেদিন সন্ধ্যায়। কিছু খায়ওনি। যে চাকরটা চা জলখাবার এনেছিল, সম্ভবত তার

কাছেই খবর পেয়ে কমলা তাকে দেখতে এলো। দরজার বাইরে থেকে জিজ্ঞাসা করলেঃ কি হয়েছে তোমার ?

—জ্বর জ্বর মনে হ'চ্ছে—বিশেষ কিছু নয়। আজ আর রাত্তিরে কিছু খাবো না, বাড়িতে বলে দিও।

—জলখাবার ফিরিয়ে দিলে কেন ?

—খেতে ইচ্ছে করছে না। চা-টা শুধু—

অশোকের কথা শেষ হবার পূর্বেই ওপরের বারান্দা থেকে টুনুদির কণ্ঠ ভেসে এলোঃ ওখানে দাঁড়িয়ে কেন রে কমলা ? অশোক এসেছে ?

চমকে উঠেছিল কমলা। কারণ এভাবে কারো দৃষ্টিতে—বিশেষ ক'রে টুনুদির দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যাবে, ভাবতে পারেনি বোধ হয় সে। কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছিলঃ হ্যাঁ, এসেছে। অসুখ করেছে বলছে, তাই—

—অসুখ করেছে ? সর্বনাশ ! ওকে বল, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি !

বিকৃত মুখে ফিস্ ফিস্ ক'রে কমলা বলেছিলঃ ঢঙি ! এক্ষুনি যাচ্ছি ! উনি এলেই অমনি অসুখ সেরে যাবে।—বলতে বলতে কমলা চলে গিয়েছিল।

পরমুহূর্তেই পদশব্দে চারিদিক সচকিত ক'রে টুনুদি এলো। এলো নয়তো, আবির্ভূতা হ'লো।

ঘরে পদার্পণ করেই বলে উঠলোঃ কোথায় গেল ছুঁড়িটা ! আমার সাড়া পেয়েই বুঝি সরে পড়েছে ? হুঁ ! বড় বদ্ স্বভাব হ'চ্ছে মেয়েটার। মামাকে বলছি এতো ক'রে তাড়াতাড়ি একটা বিয়ে দিয়ে দাও—খরচাপত্র যা লাগে না হয় দোবো। তা নয়। ওরই বা দোষ কি ? বয়সের ক্ষিধে তো একটা আছে ? যেমন থুবড়ো ক'রে রেখেছে, তেমন হ'চ্ছে।

অশোকের শিয়রের কাছে বসে বললেঃ মেয়েটার সঙ্গে বেশি মাখামাখি কোরো না ভাই। ওর স্বভাব মোটে ভালো নয়। যখন

তখন ছোঁক ছোঁক ক'রে তোমার কাছে আসে—কখন কি ক'রে বসবে—আর তুমি ছেলেমানুষ মাঝ থেকে বদনামের ভাগী হবে। কাজ কি ওসব অসভ্য মেয়েদের সঙ্গে মেশবার!

বলেই তার কপালের ওপর একখানা হাত রেখে বলে উঠলো: ইস্! এ যে দেখছি বেশ জ্বর হয়েছে। দেখো দিকি কাণ্ড! একে দিন কাল খারাপ আর এখন জ্বর বাধিয়ে বসলে!

সে-রাত্রে টুনুদির ভাবনার অন্ত ছিল না। অশোকের অসুখ; সোজা ব্যাপার! সেবায় আর আদরে অশোককে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছিল টুনুদি। জ্বর সত্যিই হয়েছিল কিনা আজ মনে নেই অশোকের কিন্তু টুনুদির অত্যাচারটা মনে আছে তার। কমলার চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না সে অত্যাচার।

তার অসুখের অজুহাতে সে রাত্রিটা টুনুদিকে তার শয্যাতেই অতিবাহিত করতে হয়েছিল। তা না ক'রে নাকি কোনো উপায় ছিল না টুনুদির! অবশ্য তার পরেও অনেক রাত অতিবাহিত করেছে এবং অশোক বিহনে প্রাণে বাঁচবে না এমন ভীতিও প্রদর্শন করেছে।

কিন্তু সে কথা যাক!

উপস্থিত টুনুদি আর ইহজগতে নেই। থাকলে হয়তো অশোকের একটা হিল্লে হ'তে পারতো। আর কমলা এখন বিয়ে থা' ক'রে সংসার ধর্ম পালন করছে। সম্ভবত তাকে দেখলে চিনতে চাইবে না এখন। না চাওয়াটাই স্বাভাবিক!

কমলা আর টুনুদি ছাড়াও এ বয়সে অনেক মেয়ে দেখেছে অশোক এবং দেখেছে তারা প্রায় সবাই এক! কেউ এগিয়ে আসতে সাহস করে না, কেউ করে। নইলে মনে প্রাণে সবাই এক। নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে এইটুকু বুঝেছে অশোক যে, নারীর হৃদয়-বস্তুর একান্ত অভাব। ভালো তারা বাসতে জানে না—তারা স্বার্থপর।

নারীদের সম্বন্ধে তার মনে কোথাও এতোটুকু সহানুভূতি নেই, দুর্বলতা নেই। আছে কেবল বিজাতীয় বিদ্বেষ। অনুরাধাও নারী! সুতরাং তার প্রতি কোনো অনুকম্পা প্রদর্শন করবে না সে। তার ভালো মন্দ যাই হোক—অশোকের তাতে কিছু যায় আসে না।

জমিদার বাড়ির প্রথা অনুযায়ী দেউড়ির দরোয়ান সময় ঘোষণা করলে পেটা ঘণ্টায় হাতুড়ির ঘা' মেরে মেরে।

একটা—দুটো—তিনটে—চারটে।

তারপর আবার সব নিশ্চুপ। কেবল সেই সশব্দ ঘণ্টাধ্বনি অট্টালিকার প্রাচীরে প্রাচীরে প্রতিধ্বনি তুলে আরো স্বল্পকাল আপন স্থায়ীত্ব প্রমাণের ব্যর্থ প্রয়াস ক'রে বাতাসে হারিয়ে গেল।

রাত চারটে!

অশোক চমকে উঠলো। মাথার ভেতরটা যেন কেমন দপ্ দপ্ করছে তার। গরম হ'য়ে উঠেছে মাথাটা। যতো সব বাজে ভাবনা! ঘুমটাই মাটি হ'ল আজ। খানিকক্ষণ এপাশ ওপাশ ক'রে বিছানার ওপর উঠে বসলো সে। ঘরের অপর প্রান্তে শামাদানে একটি মোমের বাতি টিপ টিপ ক'রে তখনো জ্বলছে। তার কম্পমান ক্ষীণালোক কেমন যেন রহস্য রচনা ক'রে চলেছে মনের মধ্যে। বেশ লাগলো অশোকের। অনেকক্ষণ সেই ক্ষীয়মান বাতির কম্পিত শিখার দিকে চেয়ে চুপ ক'রে বসে রইলো সে। তারপর একটা সশব্দ নিশ্বাস পরিত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়ালো এবং বার দুই ঘরের মধ্যে পায়চারি ক'রে এগিয়ে গিয়ে একটা জানলা খুলে দিলে। জানলা খুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই বাইরের এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস এসে ঘরের দীপ নিবিয়ে দিয়ে গেল। অশোক সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলে না। বাইরের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো।

পূর্বাকাশে উষার স্পর্শ লেগেছে।

ধীরে ধীরে অন্ধকার পাত্‌লা হ'য়ে আসছে। প্রভাতের আর

দেরি নেই বেশি। রাত্রির বিদায় দৃশ্য বেশ ভালো লাগলো অশোকের। এ দৃশ্য দেখবার সুযোগ তার কখনো হয়নি। তন্ময় হ'য়ে দেখতে লাগলো।

সুলোচনা বাঈয়ের মুখে শোনা বিশ্বকবির একটি বিখ্যাত গানের দুটি চরণ কেবলই মনের মাঝে ধাক্কা দিতে লাগলোঃ রাত্রি এসে যেথায় মেশে দিনের পারাবারে···তোমায় আমায় হবে দেখা সেই মোহনার ধারে।—নিজেরই অজ্ঞাতে কখন গানটি গুণ গুণ ক'রে গাইতে শুরু করেছে সে। ঠিক এমনি সময়ে হঠাৎ চমকে উঠলো কার স্পর্শে।

—কে?

—আমি।

চকিতে চোখ ফেরালে অশোক ঘরের মধ্যে। কিন্তু অন্ধকারে সামনের লোকটিকে চেনা গেল না। গলার আওয়াজও যেন কেমন বিকৃত। তবু অনুমানে লোকটিকে চিনলে সে। একটা বিচিত্র হাসি ফুটে উঠলো তার মুখে। জিজ্ঞাসা করলেঃ কে, ভবানী নাকি?

—হ্যাঁ।

—কি ব্যাপার? ঘুমোও নি?

—না।

মুহূর্তকাল মৌন থেকে ভবানী বললেঃ অশোক, আমি কোলকাতায় যাবো। এখানে আর—

—থাকতে পারছ না?

অশোক একটা চোখ বুজিয়ে একটু হাসলে। তেমনি বিচিত্র হাসি। তারপর বললেঃ কোলকাতায় যাবে? তা বেশ তো। এখান থেকে ফিরে—কিন্তু গৌরীদা' কি রাজী হবেন?

—জানি না। জানতে চাই না। আমি এখান থেকে সোজা কোলকাতা চলে যাবো। আর বাড়ি যাবো না।

—কিন্তু কোলকাতা গিয়ে করবে কি? চালাবে কি ক'রে?

—সে উপায় তোমাকে করতে হবে অশোক। তুমি ছাড়া আমার উপায় নেই।

—আমি? আমি কী ক'রে চালাবো? আমার অবস্থা তো তোমার অজানা নেই ভবানী। নিতান্ত দরিদ্র আমি। দুটো পয়সার জন্যে চুনকালি মেখে এ-দলে সে-দলে অভিনয় ক'রে বেড়াই। এ ছাড়া অন্য যোগ্যতাও বোধ করি আমার নেই। আমি কি ক'রে চালানো ভাই তোমার খরচ? তবে তুমি যদি কিছু অর্থাদি জোগাড় ক'রে একটা স্টেজ কোনো রকমে করতে পারো—

—কিন্তু আমার অবস্থাও তোমার তো অজ্ঞাত নয় ভাই। প্রাণে শখ আছে, হাতে পয়সা নেই। স্টেজ করার সাধ কি আমারই কম? তুমি তো জানো অশোক—এই স্টেজ করতে গিয়েই আমার সব গেছে। তবুও নেশা কাটাতে পারি নি। আবার ইচ্ছে করে—কিন্তু আমি ভিক্ষুক।

ভবানী অন্ধকারেই অশোকের দিকে তাকালো। তারপর হঠাৎ কি ভেবে খপ ক'রে অশোকের একখানা হাত চেপে ধ'রে ডাকলেঃ অশোক—

ক্ষণিকের জন্য আবার তেমনি একটু দুর্বোধ্য হাসি ফুটে উঠলো অশোকের মুখে—আবার তেমনি মিলিয়ে গেল। খোলা জানলার ফাঁকে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে নীরবে কি যেন চিন্তা করতে লাগলো সে। ভবানীর মনখানা তার চোখের সামনে সুস্পষ্ট ফুটে উঠেছে। এরপর ভবানী কি বলবে তাও বুঝতে বাকী নেই তার। ভবানীর সমগ্র চিত্ত জুড়ে উল্লাসীর নৃত্যোল্লাস চলেছে। উল্লাসীকে ভবানীর চাই-ই। মনে পড়লো অশোকের সুলোচনার কথা, মনে পড়লো আরো কতো নারীর কথা। যাদের দেখে ভবানী উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছিল। উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছিল তাদের সঙ্গ লাভের জন্যে ঠিক এই আজকের মতোই। কামনার ঘূর্ণাবর্তে ভবানীকে এমনি করেই আত্মহারা হ'য়ে নিমজ্জিত

হ'তে দেখেছে সে চিরকাল। আর নিজেই সে জুগিয়ে এসেছে চিরকাল সেই কামনার ইন্ধন।

পাপ! না, পাপ সে করেনি। এতে পাপ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে একজনের কামনা পূরণ করায় কোনো পাপ হয় না। জোর ক'রে তো ভবানীকে কিছু করায়নি সে। ভবানী স্বেচ্ছায় পঙ্কিল নরকের পথে যেতে চেয়েছে। সে শুধু মাত্র পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছে তাকে। আর সেই পরিশ্রমের পারিশ্রমিক স্বরূপ যা পেয়েছে নিয়েছে। এতে—না, এতে কোনো পাপ অর্সাতে পারে না তাকে। শুভবুদ্ধি দিয়ে ভবানীর মন্দ কাজে বাধা দিতে হয়তো পারতো সে—হয়তো আজকের অধোগতি ভবানীর নাও ঘটতে পারতো তাহ'লে; কিন্তু তাতে তার স্বার্থের হানি হ'তো। একজনের ক্ষতি না হ'লে আর একজন লাভবান হ'তে পারে না। জগৎ সংসারের নিয়মই এই। সুতরাং তাতে কোনো অপরাধ নেই তার। স্বেচ্ছাকৃত কামনার কলুষিত পঙ্কে ভবানী যদি তলিয়ে যেতে চায়—যাক্। অশোকের তাতে কিছুমাত্র যায় আসে না। অশোক শুধু নিজের স্বার্থের প্রতি সজাগ থাকবে।

গম্ভীর নীরবতায় থমথম করছে ঘরখানা। শুধু দুটি প্রাণীর ঘন ঘন নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। অশোক তেমনি নক্ষত্রখচিত রাত্রি শেষের আকাশের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে। আর ভবানী দাঁড়িয়ে তারই একখানা হাত নিজের কম্পিত হাতের মধ্যে ধরে নিয়ে।

বাইরে হুহু ক'রে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। হিমঋতুর অবসান হয়েছে—ফাল্গুনের গোড়া। তবু এখনো শীত যায়নি সম্পূর্ণ।

এতোক্ষণে অশোকের বেশ শীত করতে লাগলো। জানলাটা বন্ধ ক'রে দিতে গেল, ঠিক সেই সময় কোথায় যেন শঙ্খধ্বনি হ'ল। সম্ভবতঃ ডাকুর-বাদার শিব মন্দির থেকে ভেসে এলো সে-শঙ্খনিনাদ। মহাকালের পূজারম্ভ হ'ল বোধ করি।

—অশোক !

ভবানীর কম্পিত কণ্ঠস্বর কানে যেতে আবার তেমনি একটু হাসি হাসলে অশোক। জানালাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে বললেঃ তুমি যা বলবে আমি বুঝতে পেরেছি ভবানী। কিন্তু ওরা ভয়ংকর প্রকৃতির মানুষ! কথায় কথায় ছুরি চালিয়ে দেয়। নইলে মেয়েটাকে দেখে পর্যন্ত আমার কেবলই একটা কথা মনে হচ্ছে।

—কী ?

ভবানী উৎকণ্ঠিত আগ্রহে অশোকের মুখের দিকে তাকাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু প্রগাঢ় অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। ঘরের বাইরে প্রশস্ত দরদালানে যে ঝাড়লণ্ঠনগুলি সন্ধ্যা-রাত্রি থেকে জ্বলতে শুরু করেছিল এখন সেগুলির প্রায় নির্বাণ অবস্থা। দু'একটা এধারে ওধারে যাও বা জ্বলছে মিট মিট ক'রে, তাও তাতে আলো নেই, আছে শুধু রাত্রির রহস্যঘেরা বিভীষিকা। খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে, রঙিন শার্শির মধ্যে দিয়ে তারই অতি অস্পষ্ট কম্পিত রশ্মি ঘরের এখানে ওখানে এসে পড়েছে। তাতে অন্ধকার দূর হয়নি, হয়েছে কেমন একটা মায়ালোকের সৃষ্টি।

ভবানীর প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে অশোক বললেঃ চলো, বিছানায় গিয়ে বসি। ভোর হ'তে আর বেশি দেরি নেই। কিন্তু তুমি কি আজ সারারাত ঘুমোওনি ?

—না।

—তবে কি করেছ ? কেবল ওই মেয়েটার কথাই ভেবেছ ? তোমার দেখছি মাথা খারাপ—

বলতে বলতে তারা এসে বিছানার ওপর বসলো। বসে কি যেন একটা বলতে যাচ্ছিল অশোক কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে ভবানী বলে উঠলোঃ খালি বাজে কথা। কি মনে হচ্ছে বলো না মেয়েটাকে দেখে ?

—সে আর শুনে লাভ নেই। কারণ তা হবার নয়!

—কি আশ্চর্য!

বেশ বিরক্ত হ'ল ভবানী। রুক্ষস্বরে বললেঃ তবু সহজ ক'রে বলবে না ব্যাপারটা! আচ্ছা অশোক, তুমি কি একটু সহজ হ'তে পারো না?

—বিলক্ষণ! আমি আবার শক্ত কোনখানে?

একটু থেমে অশোক বললেঃ তোমার অবস্থা আমি বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু এবার আমি নিরুপায় ভাই। ভিমরুলের চাকে ঘা মারতে সাহস হয় না। একটা সার্কাসের মেয়ের জন্যে পিতৃদত্ত প্রাণটা খোয়াতে রাজী নই। বরঞ্চ তুমিই একবার চেষ্টা ক'রে দেখ নিজে। বিশাল জমিদারীর অর্ধাংশের উত্তরাধিকারী—নামের জোরে আর টাকার জোরে যদি কিছু করতে পারো। নইলে ওকে বাগে আনা আমার মতো 'চন্দর বিলেশে'র কর্ম নয়।

ভবানী স্তব্ধ হ'য়ে বসে রইলো।

অশোক একবার চুপ ক'রে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলে, তারপর আবার বলে চললোঃ মেয়েটাকে দেখে আমি কি মনে করেছিলুম জানো? মনে করেছিলুম ভুলিয়ে ভালিয়ে কোনো গতিকে ওকে কোলকাতায় নিয়ে যাবো। মেয়েটার চেহারার মধ্যে একটা অসাধারণ আকর্ষণ আছে। যা অনেক ভদ্রলোকের সুন্দরী মেয়ের মধ্যেও নেই। তা ছাড়া মেয়েটার গলার স্বরও অপূর্ব। ভাব-ভঙ্গী কথা বলার ঢং মুহূর্তে মানুষকে অভিভূত ক'রে ফেলে। শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সমস্ত গুণ ওর মধ্যে বর্তমান। ওকে যদি কোলকাতায় নিয়ে গিয়ে কিছুদিন শিখিয়ে পড়িয়ে নেওয়া যায় তাহলে বাণিজ্য মন্দ চলে না। স্টেজে স্টেজে, সিনেমায় সিনেমায় ওকে ভাড়া খাটিয়ে বেশ দু'পয়সা উপার্জন করা চলে। আর সেই সঙ্গে তোমারও অভিলাষ পূর্ণ হয়। কিন্তু—

কিন্তুতে কান না দিয়েই ভবানী সাগ্রহে বলে উঠলোঃ বেশ তো, তাই কেন করো না।

অশোক হাসলে। হাসতে হাসতে বললেঃ চেষ্টার ত্রুটি রাখিনি ভাই। তবে সে হবার নয়। ওই যে হাতীর মতো চেহারা সর্দারণীটিকে দেখছো, ও বড় সোজা চিজ নয় ভাই। ও না পারে এমন দুষ্কর্ম পৃথিবীতে নেই।

ভবানী বললেঃ তবে যে বলেছিলে ওরা টাকার জন্যে সবকিছু করতে পারে ?

—তা পারে। কিন্তু সে টাকার পরিমাণ বিস্তর। আমার বাবাও ওতো টাকা কখনো চোখে দেখেনি।

—কতো টাকা ?

—সে অনেক। অর্থাৎ ও মেয়েটি গেলেই ওদের সার্কাসের ব্যবসা বন্ধ হ'য়ে যাবে। অতোগুলো লোক তাহলে খাবে কি ? তার ওপর ওই সর্দ্দারণী ! ও মাগীর খরচা কি কম। হেন নেশা নেই যে ও করে না।

—মেয়েমানুষে নেশা করে ?

—বিলক্ষণ ! তুমি যে দেখছি নতুন হ'লে। মেয়েমানুষ নেশা করে তুমি জানো না ? তবে এর সঙ্গে কারো তুলনা চলে না। এ নেশা করে মানে কী ? সরকারের আবগারী ডিপার্টমেন্টই হয়তো উঠে যাবে ও মরলে। বোতল বোতল মদে ওর কিছু হয় না। আফিঙে নেশা ধরে না। মরফিয়া তাও অকেজো হ'য়ে গেছে ওর কাছে। এখন দিনে বার তিন চার ক'রে কেউটে সাপের ছোবল না হ'লে ওর চলে না।

—কেউটে সাপের ছোবল ?

—হ্যাঁ। তবে আর বলছি কি ভায়া ! বাচ্ছা কেউটের ছোবল !

—দূর ! তা আবার হয় নাকি। কেউটের ছোবল খেলে মানুষ কখনো বাঁচে ?

—আমারও তো সেই ধারণা ছিল। কিন্তু সেদিন নিজের চোখেই যে দেখলুম। কথা বলতে বলতে হঠাৎ একটা হাঁক দিয়ে উল্লাসীকে

ডাকলে। উল্লাসী আসতে তাকে ইশারা ক'রে নেশা আনতে বললে। আমি ভাবলুম হয়তো, আফিঙ টাফিঙ কিছু আনবে। কিন্তু উল্লাসী নিয়ে এলো একটা ছোট মাটির হাঁড়ী। হাঁড়ীটার গায়ে অনেকগুলি ছোট্ট ছোট্ট গর্ত। সর্দারণী সেটা হাতে ক'রে নিয়ে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে তার মুখের ঢাকাটা একটু ফাঁক করতেই—ওরে বাপরে! একটা ক্ষুদে কেউটে ফোঁস ক'রে তার ভেতর থেকে ফণা তুলে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে সর্দারণী তার কালো পুরু বীভৎস জিভটা সাপের ফণার সামনে বাড়িয়ে দিতেই সচাপটে একটা ছোবল!

—অ্যাঁ! তারপর?

—তারপর আর কি। ছোবল মেরেই সাপটি নেতিয়ে পড়লো আর সর্দারণী যেন বেশ চাঙ্গা হ'য়ে উঠলো। এ আমি নিজের চোখে দেখেছি। আর এ জিনিস চোখে না দেখলেও বিশ্বাস করা যায় না।

—সর্বনাশ!

স্তম্ভিত ভবানী অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেঃ তাহলে করা যায় কি বলো দিকি?

—তাই তো আমিও ভাবছি।

উদাসভাবে অশোক উত্তর দিলে।

আবার স্বল্পকাল প্রগাঢ় স্তব্ধতায় থমথম করতে লাগলো ঘরখানা। বাইরে হয়তো রাত্রির অন্ধকার স্বচ্ছ হ'য়ে এসেছে! বন্ধ ঘরের মধ্যে কিন্তু জমাট অন্ধকার। পাশাপাশি দুটি প্রাণী বসে আছে অথচ কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। দুজনের মনই উধাও হ'য়ে গেছে একটি নারীর চিন্তায়। একটি নারীকে কেন্দ্র ক'রে দুজনে আপন আপন চিন্তাজাল বিস্তার ক'রে চলেছে। একের সঙ্গে অন্যের চিন্তার কোনো মিল নেই। ভবানী নারীটিকে আপন আয়ত্তে এনে তাকে পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করতে চায়, আর অশোক চায় সেই নারীটির দ্বারা অর্থোপার্জন ক'রে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে। নারীটি দুজনেরই কাম্য।

হঠাৎ একটা সশব্দ দীর্ঘশ্বাস মোচন ক'রে ভবানী বলে উঠলো: যেমন ক'রে হোক চাই ওকে। আচ্ছা ভুলিয়ে ভালিয়ে কোনো রকমে মেয়েটাকে নিয়ে সরে পড়তে পারা যায় না? এ কাজে তো তোমার রীতিমত দক্ষতা আছে অশোক। আগে তো—

—দু'চারটে করেছি বটে। তাদের দিয়ে বাণিজ্যও মন্দ চলেনি। কিন্তু এক্ষেত্রে সে দক্ষতায় কোনো কাজ হবে না।

—কেন?

—অপঘাতে মরতে চাই না বলে।

—অপঘাত!

—হ্যাঁ। খুনটুন করতে ওদের চিন্তা করারও দরকার হয় না। আমি ওদের স্বভাবের পরিচয় পেয়েছি। তুমি এখানে আসবার ঠিক আগের দিনই, ওদের সার্কাসের তাঁবুর উত্তর দিকে যে চাটের দোকানটা বসেছে, সেই দোকানের একজন ছোকরা কর্মচারী হঠাৎ নিখোঁজ হ'য়ে গেল। সেইদিনই সন্ধ্যায় ক্রোশটাক দূরে ডাকুর-বাদার একটা চরের বাঁকে ছোকরার দেহটা পাওয়া গেল; কিন্তু মুণ্ডুটার আজ অবধি কোনো সন্ধান হয় নি। এমনি আরো তিন চারটি ঘটনা ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে। একটা মাতাল সেদিন বুঝি কি উৎপাত করেছিল—মেয়েটার তাঁবুর ভেতর, কেমন ক'রে ভগবান জানেন, ঢুকে পড়েছিল—ফলে পরদিন তাকে ওই জঙ্গলটার মধ্যে মরে পড়ে থাকতে দেখা গেল। শোনা গেল সাপের কামড়ে মরেছে। কিন্তু আমার ধারণা ওরাই তাকে মেরেছে।

সাতঙ্ক-বিস্ময়ে ভবানী বলে উঠলো: বলো কী? এ যে তুমি ডাকুর-বাদার ডাকাতের কাহিনী শোনাচ্ছ। আজকালকার দিনেও আবার এমন হয় নাকি?

অশোক স্মিতহাস্যে বললে: হয় মানে? হচ্ছে। ওই যে ওদের সার্কাস-দলটি দেখছো—আমার মনে হয় ওটা কিছু নয়—ভেক! ওদের

আসল ব্যবসা হ'ল ডাকাতী। কাজেই ওখানে টোপ ফেলে যে বিশেষ সুবিধে করতে পারবো সে ভরসা আমার নেই। তবে প্রচুর টাকা ওদের পেছনে খরচা করতে পারলে কাজটা হয়তো সম্ভব হ'তেও পারে।

—আন্দাজ কতো টাকা লাগতে পারে?

—হাজার পাঁচ সাত তো বটেই।

—হাজার পাঁচ সাত!

—তার কম হবে বলে মনে হয় না। সর্দারণীকে রাজী করতেই তো হাজার পাঁচেক লেগে যাবে। তারপর পার্শ্বচররা আছে, আনুসঙ্গিক খরচাপত্র আছে।

—পাঁচ হাজার টাকা সর্দারণী নেবে?

—সেই রকমই তো আভাস পেয়েছি। বেশিও চাইতে পারে। তার সম্পত্তি, সে যেমন খুশী দাম চাইতে পারে—কারো কিছু বলবার নেই।

—তুমি তাহ'লে কথা পেড়েছিলে?

—নিশ্চয়ই। মেয়েটাকে পেলে আমার দু'পয়সা আয়ের ব্যবস্থা হয়। মেয়েটাকেও পটিয়ে সটিয়ে খানিকটা রাজী করেছিলুম। কিন্তু ব্যাগড়া দিচ্ছে ওই মাগী। ওর খাঁই মিটোনো আমার পক্ষে তো কিছুতেই সম্ভব নয়! সে হয়তো তুমি চেষ্টা করলে পারো।

ভবানী গুম হ'য়ে বসে চিন্তা করতে লাগলো। অশোকের সব কথা তার কানে গেল কিনা তাও বোঝা গেল না। মিনিট দুই তিন চুপ চাপ বসে থাকবার পর হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন ক'রে বলে উঠলো: পাঁচ সাত হাজার টাকা!...আচ্ছা অশোক, এক কাজ করলে হয় না?

পর মুহূর্তে আবার নিজেই কি ভেবে বললে: না, তার কোনো উপায় নেই।

অশোক ভ্রুকুটি করলে।

—কিসের উপায় নেই?

—করালীর কাছে ভাঁওতা মেরে টাকা আদায় করার উপায় নেই। বাবা ওকে সাবধান ক'রে দিয়েছেন। নইলে অনেক টাকা আদায় উশুল করেছে ও।

মনে মনে একটু হেসে অশোক বললেঃ তবে থাক না। কী একেবারে রূপসী মেয়ে যে তার জন্যে আহার নিদ্রা ত্যাগ করতে হবে। অমন মেয়ে অনেক পাওয়া যায়। ওর চেয়ে তোমার চন্দনাকে ঢের ভালো দেখতো।

—তা হোক!

ভবানী একটা দীর্ঘস্থায়ী নিশ্বাস মোচন ক'রে বললেঃ ওকে আমার চাই-ই। টাকা আমি যেমন ক' র হোক জোগাড় করবো। কাল বাড়ি যাবো আমি। তুমি ওকে হাতছাড়া কোরো না।

সহসা অশোকের একখানা হাত ধরে ফেলে সে বললেঃ আমার জন্যে অনেক করেছ ভাই! আরো একটু করো। টাকার জন্যে ভেবো না, টাকা আমি যেমন ক'রে পারি জোগাড় ক'রে আনবোই। কিন্তু তুমি বলো ওকে পাইয়ে দেবে? ওকে কোলকাতায় নিয়ে যাবে?

—নিশ্চয়ই।

মনে মনে একটু হাসলে অশোক। সেই দুর্বোধ্য হাসি। তারপর বললেঃ তা ছাড়া তাতে তো আমারও স্বার্থ রয়েছে। টাকা যদি তুমি জোগাড় ক'রে দিতে পারো তাহলে উল্লাসী তোমার। আর এ ব্যাপারে আমার দ্বারা যেটুকু সাহায্যের প্রয়োজন অবশ্যই করবো। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

ভোরের শান্ত মৃদু আলোক শার্সির আবরণ ভেদ ক'রে ঘরে উঁকি দিচ্ছে তখন। সেইদিকে তাকিয়ে অশোক বললেঃ ওহে সকাল হ'য়ে এলো যে। এবার যাও একটু গড়িয়ে নাও গিয়ে। আমিও—

এক রকম জোর করেই ভবানীকে শুতে পাঠিয়ে দিয়ে অশোক একটা শব্দিত হাই তুলে শয্যায় দেহ এলিয়ে দিলে।

পরের দিন সকালে কিন্তু রাধানগরে যাওয়া ঘটে উঠলো না ভবানীশংকরের। করালীচরণ আপত্তি তুললে। বললে : এ সপ্তাহটা শেষ না হ'লে নাকি যাওয়া চলতেই পারে না। কর্তা তাহলে ভয়ংকর রাগ করবেন। আজ বাদে কাল শিবরাত্রির জাগর উৎসব। সেই উৎসবের পরেই নাকি মেলার খাজনাপত্র আদায় হ'তে শুরু হবে। তারপর আদায় উশুল শেষ হবে চৈত্র-সংক্রান্তির পরে। কাজেই শিবরাত্রিটা না কাটিয়ে ভবানীর বাড়ি যাওয়া চলতেই পারে না। জাগরটা মিটে গেলে দিন পনেরো বাড়ি ঘুরে আসা স্বচ্ছন্দে চলতে পারবে। এখানেও তখন বিশেষ কাজকর্ম থাকবে না। আর বড়বাবু—অর্থাৎ গৌরীশংকরও নাকি তাই বলে দিয়েছেন। বলে দিয়েছেন—একটানা অতো দিন ওখানে থাকতে যদি ভবানীর কষ্ট হয়, তাহলে শিবরাত্রির পর সে যেন সপ্তাহখানেকের জন্যে বাড়ি চলে আসে।

সমস্ত শুনে অনেকক্ষণ ভবানী কোনো কথা কইতে পারলে না। রাগে সারা দেহ তার জ্বালা করতে লাগলো। ভুরু কুঁচকে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে থেকে রুক্ষস্বরে সে বললে : আস্পর্ধা! তুমি কি আমার গার্জেন হয়েছ নাকি করালী ?

করালী চমকে উঠলো। অপ্রতিভের মতো তার দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বললে : সে কি কথা ছোটবাবু! আমি আপনাদের গোলাম—

—তবে আমার কাজে বাধা দিতে আস কেন ?

—আজ্ঞে, বাধা তো দিইনি। বড়বাবু যা বলেছেন তাই শুধু আপনাকে জানালাম। এখন আপনার যা ইচ্ছে।

চোখ রাঙা ক'রে করালীর মুখের পানে তাকালে ভবানী। দাঁতে দাঁতে বার দুই ঘর্ষণ করলে। যেন একটা কঠিন ক্রোধ কোনো ক্রমে দমন করার চেষ্টা করলে মনে হ'ল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস সশব্দে পরিত্যাগ ক'রে বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বললে : বড়বাবু! বড়বাবু বলেছেন। ননসেন্স!

বলেই আর একবার দাঁত কড়মড় ক'রে এবং আর একবার করালীকে চোখ রাঙিয়ে সে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু দু'পা গিয়েই আবার তেমনি দ্রুত ফিরে এলো।

—শোনো করালী! আমি তোমার বড়বাবুকে ভয় করি না। কারো হুকুম মেনে চলবার জন্যে আমার জন্ম হয়নি, তোমার বড়বাবু—

—আঃ, কী ছেলেমানুষী করছো ভবানী!

অশোক এতোক্ষণ বোধ করি অন্তরালে কোথাও ছিল। এই সময় সহসা আত্মপ্রকাশ ক'রে ভবানীর কথায় বাধা দিলে। ভবানীর কাঁধের ওপর হাত রেখে একটু নাড়া দিয়ে বললেঃ কী আবোল-তাবোল ছেলেমানুষের মতো বকছো। এসো এদিকে—অনেক কথা আছে।

করালীর দিকে তাকিয়ে বললেঃ কিছু মনে করবেন না আপনি! ভবানীর কাল সারারাত ঘুম হয়নি—শরীর অসুস্থ, তাই—আচ্ছা, আপনি এখন আসুন। পরে কথা হবে।

অশোকের স্পর্শে এবং অশোকের বাক্যে কী আছে কে জানে! ভবানী আর দ্বিরুক্তি করলে না। মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো। ফণীর উদ্যত ফণায় তপ্ত শলাকার স্পর্শ দিলে যে অবস্থা হয় অশোকের স্পর্শে ভবানীর ঠিক তেমনি অবস্থাই যেন হ'ল।

কালীচরণ চলে যেতে অশোক তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে ঘরের মাঝখানে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললেঃ পাগলামি ক'রে সব দিক নষ্ট করবে দেখছি তুমি। মেজাজটাকে একটু শান্ত করো। আজই তোমার বাড়ি যাবার আবশ্যক কী?

—কিন্তু বাড়ি না গেলে টাকা—

ভবানীকে কথা শেষ করতে না দিয়েই অশোক বললেঃ টাকা আজই এক্ষুণি চাই, এমন কথা তো তোমায় আমি বলিনি। দু'চার দিন পরেও ও-কাজটা হ'তে পারবে। রাগারাগি ক'রে বাড়ি যাওয়ার কোনো মানে হয়?

—কিন্তু—

—আবার কিন্তু। শোনো, বেশি ব্যস্ত হ'য়ে কোনো লাভ নেই। যদি উল্লাসীকে পেতে চাও, আমি যা বলবো, চুপচাপ শুধু তাই ক'রে যাও। উপস্থিত তোমার হাতে কতো টাকা আছে?

—কোথায় টাকা?

একটু বিরক্তির স্বরে ভবানী বললেঃ এখানে আসবার দিন দাদা শ' তুই টাকা দিয়েছিল। আর কুড়িয়ে বাড়িয়ে আমার কাছে হয়তো গোটা পঞ্চাশ টাকা থাকতে পারে। এই সর্বসমেত ধরো শ' আড়াই বড়ো জোর—

—তুমি মাস মাস হাত খরচা পাও না?

—ওঃ, ভারী হাত খরচা পাই! এক শো টাকা ক'রে মোটে বরাদ্দ করেছেন। তাতে তো আমার সিগারেটের খরচই কুলোয় না।

তা বটে! না কুলোবারই কথা?

অশোক একটু হাসলে। মনে মনে বললেঃ এ দেশের বেশির ভাগ লোক কিন্তু সারামাস হাড় ভাঙা পরিশ্রম করেও ওই একশো টাকা উপায় করতে পারে না। এ দেশের বেশির ভাগ লোকের পরিবার প্রতিপালন করতে হয় ওর অর্ধেকের কম টাকায়। কিন্তু তারা তো ভবানী নয়! সিগারেটের খরচা কী তারা বুঝবে না।

ভবানী ভুরু কুঁচকে অশোকের দিকে তাকালে।

—হাসছো যে?

তেমনি হাসি মুখেই অশোক বললেঃ না, এমনি। আচ্ছা তোমার ও হাত খরচাটা পেতে কতো দেরি?

—এখনো দিন দশেক দেরি আছে। কিন্তু কেন বলো তো?

—একটা মতলব ভাঁজছি তাই। মানে একদিন দশ টাকা বক্‌শিশ দিয়েই দেখেছ তো কি রকম বিগলিত হ'য়ে পড়েছিল মেয়েটা! এরপর একদিন কুড়ি টাকা—একদিন তিরিশ টাকা—

একদিন একটা সোনার মেডেল—তারপর একদিন একখানা ভালো শাড়ী! মানে বুঝলে না? এমনি ক'রে শনৈঃ শনৈঃ বশ করা আর কি! তারপর একদিন যদি আবার শ'খানেক টাকা খরচা ক'রে ওদের তাঁবুশুদ্ধ লোককে খাওয়ানো যায়—অর্থাৎ একটা ফিস্ট দেওয়া যায়! তা হলেই ব্যস্! আর ভাবনা করতে হবে না। টাকায় দুনিয়ায় কী না হয় রে ভাই! অসম্ভবও সম্ভব হ'য়ে যায়।

একবার থেমে অশোক বললেঃ তোমায় কিছু ভাব্তে হবে না ভবানী। আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। তুমি আমায় উপস্থিত কিছু টাকা দাও। কিন্তু খুব সাবধান—আমাকে লুকিয়ে যেন ওদের তাঁবুতে কিছু করতে যেও না—মারা পড়বে।

॥ চার ॥

দেখতে দেখতে একটি সপ্তাহকাল অতীত হ'য়ে গেল। ইতিমধ্যে সমগ্র সার্কাস দলটির ওপর আস্তে আস্তে বেশ খানিকটা প্রতিপত্তি বিস্তার ক'রে ফেলেছে অশোক আর ভবানী। কেমন ক'রে মানুষ বশীভূত করতে হয় অশোক তা জানে। অশোক সুকৌশলী। ভবানী কোনো কাজই অশোকের পরামর্শ ব্যতীত করে না। করে না এইজন্যে যে নিজের বুদ্ধিতে কিছু করতে গিয়ে যদি উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'য়ে যায়! হওয়াটা বিচিত্র নয়। নিজের বুদ্ধির ওপর মোটেই আস্থা নেই ভবানীর। কারণ বার কয়েক নিজের বুদ্ধি খাটাতে গিয়ে ঠকেছে এই সব ব্যাপারে। অশোক এসব কাজে অত্যন্ত বিচক্ষণ। তার নির্দেশ মতো চললে, আর যাই হোক, ঠকতে হবে না। শিকার খেলিয়ে সে ঠিক ডাঙায় তুলে দেবেই।

সর্দারণী ভবানীর বেশ অনুগত হ'য়ে পড়েছে। রাজাবাবু বলতে অজ্ঞান। আসল কাজও অনেকটা এগিয়েছে—এখন টাকা লেনদেনের অপেক্ষা মাত্র। তবে টাকার পরিমাণটা সর্দারণী

একটু বেশি দাবী করছে। সে বলে, মেয়েটা গেলে তাদের খেলা নাকি বন্ধ হ'য়ে যাবে। এতোগুলো লোকের অন্ন যাবে। কাজেই রাজাবাবুকে টাকার পরিমাণ একটু বাড়াতে হবে। আর তার একটা মাসহারার বন্দোবস্ত ক'রে দিতেও হবে। নইলে এই বুড়ো বয়সে তার ভারী কষ্ট হবে।

কিন্তু সে যাই হোক! সেজন্যে বিশেষ কিছু আটকাবে না ভবানীর। টাকা যেমন ক'রে হোক জোগাড় করবে সে। তারপর মাসহারা ফাসহারা সব বাজে। সে অশোক যা হয় করবে অখুন। কিন্তু মুশকিল হয়েছে উল্লাসীকে নিয়ে। সে যেন ভবানীর দিকে মোটেই ভিড়তে চায় না। হাসে, কথা কয়, বকশিশ দিলে হাত পেতে ঠিক প্রথম দিনের মতোই সোল্লাসে গ্রহণ করে। তবুও কেমন যেন একটা 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' গোছের অবস্থা। মেয়েটার হাব-ভাব ভবানীকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। শুধু ভাবিয়েই তোলেনি, কেমন একটু হিংসার উদ্রেকও হয়েছে। ভবানীর চেয়ে মেয়েটা যেন অশোককেই বেশি পছন্দ করে। ভবানীকে যেটুকু খাতির করে তাও যেন অশোকেরই খাতিরে। অশোকের সঙ্গে গল্প করতে, আলাপ করতে রীতিমত উৎসাহ বোধ ক'রে মেয়েটা। অশোককে কাছে পেলে তার সান্নিধ্য ছাড়তেই চায় না। ভবানীর এটা অসহ্য। অবশ্য অশোকের নারী-বিতৃষ্ণ-স্বভাব ভবানীর অবিদিত নয়। ভবানী জানে নারীর রূপ যৌবনের প্রতি কোনো আসক্তি নেই অশোকের। নারীর সৌন্দর্য অশোকের মনে এতোটুকু কামনার সঞ্চার করে না। নারীকে সমগ্র মন দিয়েই কেবল ঘৃণা করতে শিখেছে সে। তথাপি ভবানীর ঈর্ষা হয় উল্লাসীর ব্যবহারে! অথচ মুখ ফুটে কোনো কথা অশোককে বলতে পারে না সে। বলতে পারে না কারণ উল্লাসীকে পেতে হ'লে অশোকের সাহায্য অপরিহার্য।

মনে পড়ে ভবানীর আরো অনেকগুলি স্ত্রীলোকের কথা। মনে পড়ে সুলোচনা, চন্দনা, চামেলি প্রভৃতি মেয়েদের কথা। যাদের

সাহচর্য লাভ ক'রে এই পৃথিবীকে একদা স্বর্গ বলে অনুভব করেছিল ভবানী, তাদেরও পেয়েছিল সে এই অশোকেরই সাহায্যে। আর তারাও প্রত্যেকে তার চেয়ে অশোকের সঙ্গই কামনা করতো বেশি। অশোক জাদু জানে। অশোককে সকলেরই ভালবাসতে ইচ্ছা করে। যদিও সে জানে মৌখিক সদ্ব্যবহার ছাড়া অশোকের অন্তর কোনো নারীই লাভ করতে পারে নি। অশোককে ভালবেসে সকলেই ঠকেছে। উল্লাসীও ঠকবে। কিন্তু সব জেনে শুনেও ঈর্ষা দমন করতে পারে না ভবানী কিছুতেই।

আজ দুদিন থেকে আবার আর একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করছে সে। লক্ষ্য করছে সার্কাস দলের সেই বেঁটে ছোকরাটাকে। ছোকরার মনের ভেতরে যেন একটা বীভৎস দ্বন্দ্ব চলেছে। আর তার মুখে চোখে ফুটে উঠেছে তারই প্রতিচ্ছবি। একটা ভয়াবহ মতলব আঁটছে যেন ছোকরা মনে মনে। তার চোখে চোখ পড়ে গেলেই ভবানীর বুকের ভেতরটা যেন কেমন ক'রে ওঠে—যেন কি এক অজ্ঞাত ভয়ে সংকুচিত হ'য়ে আসে।

অশোকের কিন্তু এ সবে ভ্রূক্ষেপও নেই।......

খর্বাকার ছোকরাটার নাম বিশাই। এই ছোট সার্কাস দলটির প্রকৃত মালিক নাকি ওই বিশাই-ই। বিশাইয়ের বাবা রামলাল সর্দার এই দলটিকে গড়ে তুলেছিল। বিশাই রামলালের একমাত্র সন্তান—বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান। বর্তমান সর্দারণী রামলালের রক্ষিতা। বিশাইয়ের গর্ভধারিণীর মৃত্যুর পর রামলাল পুনরায় বিবাহ করেছিল। কিন্তু বছর তিনেকের মধ্যেই সে স্ত্রীরও জীবনাবসান ঘটে। শোনা যায়, রামলাল নিজেই নাকি তাকে হত্যা করেছিল।

অবশ্য হত্যা করাটা রামলালের পক্ষে অস্বাভাবিক ছিল না; কারণ লুটপাট রাহাজানি খুন জখম এই ছিল তার মুখ্য পেশা।

রামলাল সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী আজও শোনা যায়। শোনা যায় রামলাল নাকি শরীরে অসুরের বল ধারণ করতো। পাঁচ ক্রোশ পথ পনেরো মিনিটে অতিক্রম করতে পারতো মাত্র একটি সাড়ে তিন হাত লাঠির সাহায্যে। তিন তলার ছাদ থেকে চক্ষের নিমিষে মাটিতে লাফিয়ে পড়তে পারতো—কিছু হতো না তার। মোটা মোটা লোহার শেকল অবলীলাক্রমে ছিঁড়ে ফেলতে পারতো। কতবার জেলখানা থেকে পালিয়েছে তার স্থিরতা নেই। তার অত্যাচারে কতো চৌকিদারের, কতো পুলিসের যে জীবনান্ত ঘটেছে তার ইয়ত্তা নেই।

ডাকুর-বাদার শেষ দস্যু ছিল নাকি রামলাল। রামলাল ছিল তখন এ অঞ্চলের বিভীষিকা। ডাকাত রামলালের নামে এ অঞ্চলের অধিবাসীদের হৃৎকম্প উপস্থিত হতো। অথচ মানুষটিকে দেখে নাকি বোঝবারও উপায় ছিল না যে, কোনো রকম দুষ্কার্য তার দ্বারা সম্ভব হ'তে পারে বলে।

রামলালের আরো একটি বিশেষ গুণ ছিল। সে নাকি অদ্ভুত ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারতো। তাকে ধরবার জন্যেই একদল পুলিস এসে হয়তো গ্রাম তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে বেড়াচ্ছে আর নিজে সে ছদ্মবেশে সেই পুলিস দলের মধ্যে ঘুরে ঘুরে তাদের সহায়তা করছে। অকথ্য ভাষায় রামলালকে গালাগাল দিয়ে তার অত্যাচারের আশু প্রতিকার প্রার্থনা করছে। চেনবার কিছুমাত্র উপায় নেই। এমনই ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারতো সে। গলার আওয়াজ পর্যন্ত বদলে ফেলতে পারতো। চেহারার মধ্যেও এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল না তার। রোগা ছিপছিপে গড়ন, মাথায়ও বিশেষ লম্বা নয়—অবশ্য বিশাইয়ের মতো বেঁটেও নয়—মাঝারি। দেহে ছিল অসুরের মতো শক্তি।

রামলাল ডাকাত সম্বন্ধে অনেক অবাক কাহিনী এ অঞ্চলে প্রচলিত আছে। আজো এদিকের প্রাচীনরা রামলালের নামে শংকায় রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠেন।

বর্তমান সর্দারণীর স্বামী ছিল রামলালের গুরু। গুরু মানে ডাকাতী বিদ্যার গুরু। দীর্ঘদিন গতায়াতের ফলে গুরুপত্নী কামিনীর সঙ্গে তার গোপন প্রণয় ঘটে। ক্রমে সেই প্রণয় উৎকট অবস্থায় পৌঁছয় এবং রামলাল একদা কামিনীর কাছে প্রস্তাব করেঃ চল দুজনে পালাই। অন্য কোথাও গিয়ে ঘর বাঁধবো।

কিন্তু রামলালের স্ত্রী—অর্থাৎ বিশাইয়ের বিমাতা তখন জীবিত। সুতরাং কামিনী রামলালের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে।

এই ব্যাপারের কিছুদিন পরেই অকস্মাৎ রামলালের পুনরায় স্ত্রী-বিয়োগ হয়। তারপর সর্পাঘাতে গুরুরও মৃত্যু ঘটে এবং রামলাল কামিনীসহ দেশ থেকে উধাও হ'য়ে যায়। বিশাইয়ের তখন ছ' সাত বছর মাত্র বয়স। রামলালের আর যাই দোষ থাক, ছেলেটিকে বড় ভালোবাসতো। তাই যাবার সময় বিশাইকেও মমতা-বশে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল।

তারপর আট দশ বছর রামলালের আর কোনো খোঁজ খবর পাওয়া যায় নি।

আট দশ বছর পর একদিন একটি ছোট সার্কাসের দল নিয়ে এসে এই ডাকুর-বাদার শিবমেলায় তাঁবু খাটালে সে। তখন তার দেহের এবং স্বভাবের বহু পরিবর্তন হয়েছে। ডাকাত রামলাল অন্তর্হিত হ'য়ে গেছে এই সার্কাসওয়ালা রামলালের মধ্যে। তখন আর তাকে চেনবারও উপায় নেই—না শরীরে, না স্বভাবে।

যদিও দলের দলপতি ছিল সে-ই, কিন্তু কার্যতঃ কর্তৃত্ব করতো সর্দারণী কামিনী। কারণ তখন রামলালের দেহে নানা ব্যাধি আশ্রয় ক'রে তাকে প্রায় পঙ্গু ক'রে দিয়েছিল। সেই থেকে প্রতি বছর শিবমেলায় সার্কাস দলটি এখানে আসে, তাঁবু খাটায় সার্কাস দেখায় এবং চৈত্র সংক্রান্তির পর চলে যায়। কোথায় যায় সে খবর কেউ জানে না।

এদিকের প্রাচীনরা বলেঃ রামলাল দেশের মায়া কাটাতে

পারেনি। ডাকাতে বিলের আকর্ষণ আবার তাকে এখানে এনেছে।

কিন্তু আজ প্রায় বছর পাঁচেক হ'ল রামলাল মারা গিয়েছে। আর তারপর থেকেই এই সার্কাস দলটির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে কামিনী সর্দারণী সর্বময়ী কর্ত্রীরূপে। বিশাইকে কামিনী রামলালের পুত্র বলে একটু অনুগ্রহ ক'রে মাত্র। বিশাইয়েরও বিশেষ কোনো অভিযোগ আছে বলে মনে হয় না। তবে কামিনীকে বিশেষ সুনজরেও সে দেখে না।

বিশাইয়ের প্রকৃতিটা অত্যন্ত দুর্বোধ্য। সে যে দুর্ধর্ষ ডাকাত রামলালের ছেলে এ তাকে দেখে বোঝবার কোনো উপায় নেই। শান্ত শিষ্ট নিরীহ স্বভাব। সর্বদাই মুখে একটা হাসির প্রলেপ। কথা কয় অতি অল্প এবং তাও প্রয়োজন ব্যতীত কয় না। কারো কোনো কাজে প্রতিবাদ করা তার স্বভাব নয়। তবে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে দিয়ে কোনো কাজ করানো সম্পূর্ণ অসম্ভব। নিজের স্বার্থ সম্বন্ধেও সে বেশ কিছুটা সচেতন। কিন্তু তার কাম্য বস্তু কী? সেটা বুঝে ওঠা দুষ্কর। সে চায় না কারো কাজে হস্তক্ষেপ করতে। তার কাজেও অন্য কেউ হস্তক্ষেপ করে এটাও পছন্দ ক'রে না। দলের মধ্যে থেকেও কেমন যেন সে দলছাড়া। তার শরীরে নাকি রাগ বলে কোনো বস্তু নেই। রাগ করতে তাকে বড় একটা কেউ দেখেনি। তবে সেই বিনিরাগেও হাসিমুখে মাঝে মাঝে সে এমন এক একটা কাজ করে বসে যা কামিনীর মতো ভীষণ প্রকৃতির সর্দারণীকেও বিচলিত ক'রে তোলে। ছোকরাটিকে মনে মনে রীতিমত ভয়ও করে কামিনী—কেবল অনুগ্রহই করে না।

বিশাই খর্বাকৃতি হ'লেও এ-দলের ওস্তাদ খেলোয়াড়। রামলাল তাকে শিক্ষা দিতে কার্পণ্য করেনি। লাঠিখেলা, ছুরিখেলা, ধনুর্বিদ্যা প্রভৃতিতে 'রামলালের পুত্র বলে সগর্বে পরিচয় দিতে পারে সে। কেমন ক'রে অকম্পিত হাতে নিঃশব্দে একটি জীবন্ত প্রাণীকে পৃথিবী

থেকে সরিয়ে দিতে হয় তা সে পিতার কাছে ভালো ক'রে শিক্ষা করেছে। আবার সুর ক'রে রামায়ণ, মহাভারত পাঠ করতেও শিখেছে। সার্কাসের খেলোয়াড় তৈরি করার বিদ্যাও আয়ত্ত করেছে। এদলের অনেককেই হাতে ধরে খেলা শিখিয়েছে সে। উল্লাসীও তার মধ্যে একজন।

উল্লাসী সম্বন্ধে বিশাইয়ের নাকি বেশ খানিকটা দুর্বলতা আছে। সর্দারণী কামিনী বলে, উল্লাসীকে সে নাকি বড় ভালোবাসে। তার বাপের মনোগত অভিপ্রায় ছিল উল্লাসীর সঙ্গে তার বিয়ে দেবার। কিন্তু রামলাল সে অভিপ্রায়কে কার্যকরী ক'রে যেতে পারেনি। কামিনীর ওপর সে-কাজের ভার দিয়ে গেছে।

এই ছোট সার্কাস দলটির সঙ্গে উল্লাসীর জন্মগত কোনো সম্পর্ক নেই। সে এ-দলের পরভৃতা বিশেষ। ডাকাত রামলালের সর্বশেষ ডাকাতীর জীবন্ত নিদর্শন এই উল্লাসী।

কামিনীর কাছে উল্লাসীর যে ইতিহাস শোনা যায় তা সত্যই মর্মান্তিক

শোনা যায়, প্রায় সতেরো আঠারো বছর আগে কলকাতার পার্শ্ববর্তী এক গ্রামে রামলাল ডাকাতী করতে গিয়েছিল। ডাকাতী করতে গিয়েছিল এক বিখ্যাত জমিদারের বাড়িতে। সেদিন সেই বাড়িতে সম্ভবত কী একটা উৎসব ছিল জমিদারের। উৎসবান্তে বহিরাগতরা বিদায় নেন এবং গৃহবাসীরা অনেক রাত্রে শয়ন করেন।

আগে থেকেই সমস্ত বন্দোবস্ত করা ছিল। সুড়ুক সন্ধান নিয়ে তৈরি ছিল ডাকাত রামলাল আশপাশে কোথাও। অনেকদিন থেকেই সেই বাড়িটির ওপর নজর ছিল তার।

অনেক রাত্রে গৃহ নিস্তব্ধ হ'তেই রামলাল সেই অবসরে একদল সঙ্গী নিয়ে জমিদার বাড়িতে হানা দেয়।

হত্যার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না রামলালের কিন্তু কার্যগতিকে

হত্যা করতে বাধ্য হয় সে। পর পর দুটি জীবন হনন করতে হ'য়েছিল তাকে। হনন করতে হয়েছিল নিজেরই দলীয় দুটি প্রাণীর প্রাণ।

রামলাল দস্যু ছিল, রামলাল খুনি ছিল—সর্বপ্রকার নেশায় রামলালের গভীর আসক্তি ছিল। রামলাল জুয়া খেলতো—গণিকালয়ে যেতো—সুযোগ পেলে অসাবধানী পথিককে অতর্কিত আক্রমণে তার যথাসর্বস্ব আত্মসাৎ করতো। অসৎ আর অসত্য নিয়েই ছিল রামলালের জীবনের কারবার। কিন্তু একটি বিষয়ে সে ছিল সম্পূর্ণ সাঁচ্চা। ডাকাতি করতে গিয়ে কোনোদিন সে কোনো নারীর অঙ্গ স্পর্শ করেনি এবং প্রতিজ্ঞা ছিল তার, কালী মায়ের নামে প্রতিজ্ঞা ছিল—ডাকাতি করতে গিয়ে যদি কোথাও কোনো নারীর কাছে বাধা পায় তাহলে তৎক্ষণাৎ নতমস্তকে সেই স্থান ত্যাগ করবে।

আরো একটা প্রতিজ্ঞা তার ছিল—যে বাড়িতে কোনো দিন কোনো কারণে অন্নগ্রহণ করতে বাধ্য হবে সে, সেখানে জীবনান্তেও আর ডাকাতি করবে না।

দলের লোকেদের প্রতিও সেই রকম নির্দেশ ছিল। শুধু নির্দেশই ছিল না—এমন কথাও বলা ছিল যে, যদি দলের মধ্যে কেউ ভ্রম ক্রমেও সে নির্দেশ অবহেলা করে তাহলে তার শাস্তি প্রাণদণ্ড। এর আর কোনো ব্যতিক্রম নেই। তা ছাড়া প্রতিবার ডাকাতি করতে যাবার সময় মহাকালীর নাম নিয়ে সকলকে শপথ ক'রে যেতে হ'ত যে, নারীর প্রতি কোনোরূপ অসম্মান প্রদর্শন করবে না তারা। যদি করে সেজন্যে তাদের জীবন জামিন।

জমিদারের বাগান বাড়িতে ঠিক সেই ঘটনাই ঘটলো।

বাড়ির মধ্যে প্রবেশ ক'রে রামলাল দুজন সঙ্গীকে দুদিকে-পাহারায় নিযুক্ত রেখে একজনকে নিয়ে অলিন্দ অতিক্রম ক'রে একটি কক্ষে প্রবেশ করলে।

কক্ষদ্বার মুক্তই ছিল। কিন্তু সে ঘর শূন্য—কিছুই নেই।

সঙ্গীটিকে সেই ঘরের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে রামলাল মার্জারের মতো লঘু পায়ে অন্য একদিকে চলে গেল। একটি দুটি ক'রে তিন চারটি ঘর ঘুরে রামলাল যে ঘরের মধ্যে সুকৌশলে দরজা মুক্ত ক'রে প্রবেশ করলে সেটি জমিদারের নিজস্ব ঘর।

জমিদার তখন গভীর ঘুমে অচেতন। যে পালঙের ওপর জমিদার নিদ্রিত সেই পালঙের অপর দিকে একটি আরশি বসানো প্রকাণ্ড আলমারি। পালঙটি পেরিয়ে তবে সেই আলমারির কাছে যাওয়া যায়।

মুহূর্তকাল সেখানে দাঁড়িয়ে কী ভাবলে রামলাল। তারপর জামার ভেতর থেকে কি একটা গাছের পাতা বার ক'রে বাঁ হাতের চেটোয় রেখে ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে ডলতে শুরু করলে। এই মর্দিত পত্রগন্ধ নাকি যে কোন প্রাণীকে যে কোনো অবস্থায় ঘ্রাণের সঙ্গে সঙ্গেই কয়েক ঘণ্টার জন্য মৃতের মতো অচৈতন্য ক'রে দেবার শক্তি রাখে।

পাতা ডলা শেষ হ'লে সন্তর্পণে সেই দলিত পাতাটি বৃদ্ধ জমিদারের নাকের কাছে ধরলে সে এবং এক দুই ক'রে একশো পর্যন্ত গুণলে। গোণা শেষ হ'লে একটু সাফল্যের হাসি হেসে পালঙটি পেরিয়ে সে আলমারির সামনে এসে দাঁড়ালো। আলমারি খুলতেও বিশেষ বেগ পেতে হ'ল না তাকে। ভিন্ন চাবির সাহায্যে স্বল্প প্রচেষ্টায় আলমারি খুলে ফেললে সে। এবং মুহূর্তে চোখ দুটি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো তার। উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো মুখখানি আনন্দে।

ভুল করেনি সে—ঠিক জায়গায় এসে হাত লাগিয়েছে। লোলুপ দৃষ্টিতে আলমারির মধ্যকার দ্রব্যগুলি নিরীক্ষণ করতে লাগলো। একটা পুলক মিশ্রিত নিশ্বাস পরিত্যাগ ক'রে ভাবলে—মহাকালীর অনুগ্রহে যাত্রা আজ তাদের ভালোই হয়েছে।

কিন্তু আর দেরি করা উচিত নয়।

রামলাল মনে মনে মা-কালীকে স্মরণ ক'রে আলমারির মধ্যস্থ

একটি অলংকারের বাক্সে সবে মাত্র হাত দিয়েছে, ঠিক সেই সময় বাইরে একটা কিসের গোলমাল শোনা গেল।

চকিতে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো রামলাল। ভুরু দুটো কুঁচকে গেল তার।

গোলমাল সমান ভাবেই চলেছে।

কারা যেন কোথায় রুদ্ধ দরজা খোলবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে, আর আর্ত-চিৎকার করছে: খুন, খুন—কে আছ শিগগির এসো—বড়মাকে কেটে ফেলেছে ডাকাতে......

কয়েকটি নারী ও শিশুর সমবেত কণ্ঠস্বর।

ঠিক পাশের ঘর থেকে এই সময় কে একজন দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে চিৎকার ক'রে উঠলো: কি হয়েছে—কি হয়েছে? আরে আমার দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করলে কে?—দারোয়ান, দারোয়ান—গুলি চালাও—ডাকাত পড়েছে। গুলি চালাও—

অনুরূপ চিৎকার অন্যান্য ঘর থেকেও শোনা যেতে লাগলো।

অকস্মাৎ স্বল্পদূর থেকে আর একটি নারীর তীক্ষ্ণ ভয়ার্ত আর্তনাদ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠলো: ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও। আমি মা—

বন্দুকের গুলির মতো সে অসহায় আর্তনাদ রামলালের বুকে এসে আছড়ে পড়লো।

জ্যা-মুক্ত ধনুকের মতো ছিটকে পড়লো রামলাল। বেরিয়ে এলো তীরের মতো ঘর থেকে। সে-ঘর থেকে বেরিয়েই আর একটি ঘর তারপর অলিন্দ। কিন্তু অলিন্দে যাবার রাস্তা কই? সে ঘরখানির বাতি কখন নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে। সম্ভবতঃ রামলালের অন্যমনস্কতার অবসরেই নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে। জমাট অন্ধকার ঘরখানির মধ্যে থম থম করছে। এ ঘরে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো রামলাল।

বাড়ির চারিদিকের চেঁচামেচি অবিশ্রাম গতিতে বেড়ে চলেছে।

জামার মধ্যে থেকে একটা দেশলাই বার ক'রে জ্বাললে রামলাল। তারপর দরজার কাছে গিয়ে টেনে দেখলে—বাইরে থেকে বন্ধ। দাঁতে ঠোঁট চেপে মুহূর্তকাল কি ভাবলে। ব্যাপারটা যেন কিছুই অনুমান করতে পারছে না সে। তারই সঙ্গীরা কি শেষ পর্যন্ত—শেষ পর্যন্ত বিস্মৃত হ'ল মহাকালীর নামের শপথ! রামলালের লাঠিকে অবহেলা করার সাহস হ'ল? এতোবড় স্পর্ধা! এতো বড় বুকের পাটা!

বুকের মধ্যে রক্ত তখন উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। সমস্ত শরীর লোহার মতো শক্ত হ'য়ে গেছে, রামলালের। এতো সাহস কার হ'ল? দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করতে করতে রামলাল দ্বারমুক্ত করার প্রয়াস করতে লাগলো। এ সব কাজে রামলালের বেশি সময় যায় না। মিনিট দু'তিনের মধ্যেই দরজা খুলে বেরিয়ে এলো সে। বেরিয়ে এলো প্রশস্ত বারাণ্ডাটায়। এতোক্ষণ অন্ধকারে থাকার ফলে অন্ধকারটা চোখে সয়ে গিয়েছিল। তবুও তরিত হস্তে চোখ দুটো একবার মুছে নিয়ে দ্রুত ফটকের দিকে এগিয়ে চললো।

মাথার ভেতর আগুন জ্বলছে। সমস্ত শরীরের রক্ত টগবগ ক'রে ফুটছে রামলালের। দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে ছুটে চলেছে সে ফটকের উদ্দেশে।

হঠাৎ একটা ভারি কিসের ওপর ঠোক্কর লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে।

সঙ্গে সঙ্গে কে যেন আর্তনাদ ক'রে উঠলো: উঃ—মা গো!

ভয়ংকর চমকে উঠলো রামলাল। চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে তাকিয়ে দেখলে—সর্বনাশ! একটি বৃদ্ধা রক্তাক্ত কলেবরে ফটকের স্বল্প দূরে উঠানের ওপর পড়ে আছে।

ক্ষণকাল কেমন বিমূঢ় হ'য়ে গেল রামলাল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে কোনো রকমে জমিদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো।

কিন্তু কোন্ দিকে যাবে সে? কোন্ দিকে তার সত্যভঙ্গকারী সঙ্গীরা পালিয়েছে?

কঠিন মুষ্টিতে লাঠিটা চেপে ধরলে রামলাল।

না, পরিত্রাণ নেই! কোথাও পালিয়ে পরিত্রাণ পাবে না তারা রামলালের কাছে।

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে রামলাল।

কোথায় যাচ্ছে—কোনদিকে যাচ্ছে কিছুই লক্ষ্য নেই। কতো দূর এলো তাও জানে না। সহসা পিছনে এই সময় উপর্যুপরি কয়েকটা বন্দুকের শব্দ শোনা গেল। বোধ হয় জমিদার বাড়ি থেকেই শোনা গেল। দরোয়ানরা বন্ধ দরজা ভেঙে বেরিয়েছে তাহলে।

একটা বড় মাঠ অতিক্রম ক'রে এসে পড়লো রামলাল এক সুবিস্তৃত এবং জংগল সদৃশ্য আম বাগানের মধ্যে। কিছুদূর বাগানের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'য়ে কি ভেবে হঠাৎ এক স্থানে দাঁড়িয়ে পড়লো সে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই অতর্কিতে একটা প্রচণ্ড আঘাত পেলে বাম স্কন্ধের পার্শ্বে। আঘাতটা তীক্ষ্ণ বর্শার আঘাত। অলক্ষিত স্থান থেকে কেহ তার বক্ষদেশ লক্ষ্য ক'রে বর্শা ছুঁড়েছে সম্ভবতঃ।

একটু উনিশ বিশের জন্যে বেঁচে গেল রামলাল।

এমনটা কল্পনা করতে পারেনি সে। তাই প্রথমটা কেমন যেন এক রকম হতবুদ্ধি হ'য়ে গেল। আঘাতের আকস্মিকতায় একটা মৃদু আর্তনাদ ক'রে বসেও পড়লো সেইখানে। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্যে। তারপরেই নিজেকে সামলে নিলে। একবার আঘাতপ্রাপ্ত কাঁধটায় হাত বুলিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো।

অকস্মাৎ অদূরের ছায়ান্ধকারে কার পদশব্দ শোনা গেল যেন। উৎকর্ণ হ'য়ে উঠলো সে। হাতের লাঠিটা শক্ত ক'রে ধরে একটা বৃক্ষকাণ্ডের পাশে আত্মগোপন করলে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক ব্যক্তি পা টিপে টিপে সেইখানে এসে দাঁড়ালো এবং নিচু হ'য়ে কি যেন সন্ধান করতে লাগলো। 'সম্ভবতঃ তার শিকার রামলালের সন্ধান করতে লাগলো। তার অব্যর্থ

সন্ধান ব্যর্থ হয়নি তা সে দেখেছে। লোকটি আপন মনে বলে উঠলোঃ শালা এইখানেই তো পড়লো দেখলুম। গেল কোথায়? যা অন্ধকার! বর্শা খেয়ে শালা কোথায় পড়লো এখন খুঁজে পাওয়া দায়!-

একটা দেশলাই কাঠি বোধ হয় জ্বালতে যাচ্ছিল লোকটা কিন্তু তার ফুরসত পেলে না। রামলালের কঠিন লাঠির একটি আঘাতে মুহূর্তে সমস্ত উৎসাহের পরিসমাপ্তি ঘটে গেল তার। একটা আর্তনাদ করারও অবসর পেলে না সে।

লোকটি ডাকাত রামলালেরই একজন শপথ ভঙ্গকারী সঙ্গী। দুনিয়ার অন্ধকার থেকে মৃত্যুর অন্ধকারে অকস্মাৎ হারিয়ে গেল।

রামলাল ক্ষণকাল ভয়ংকর দৃষ্টিতে মৃত সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর তার মুখে একটা পদাঘাত ক'রে বাকী ক'জনের খোঁজে প্রবৃত্ত হ'ল। নিশ্চয় তারাও এই জংগলের মধ্যেই আছে বোলে অনুমান করলে সে।

প্রায় ঘণ্টা খানেক অনুসন্ধানের পর। জঙ্গলটার দক্ষিণ দিকে একটা মস্ত ভাঙা পোড়ো বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো সে। সেখানে কতকগুলো কুকুর এক জায়গায় জড়ো হ'য়ে তারস্বরে চিৎকার করছে। চিৎকার করছে বাড়িটার একটা দিক লক্ষ্য ক'রে।

রামলাল আস্তে আস্তে সেইদিকে এগিয়ে গেল। রামলালকে দেখতে পেয়ে কুকুরগুলো আরো জোরে চিৎকার শুরু করলে এবং একটু একটু সরে সরে যেতে লাগলো। হঠাৎ এই সময় বাড়িটার দিক থেকে একখানা আধলা ইঁট এসে কুকুরগুলোর মাঝে পড়ে তাদের ছত্রভঙ্গ ক'রে দিলে। রামলাল থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো এক জায়গায়। কুকুরগুলোর গতিবিধির ওপর দৃষ্টি রেখে একটু বোধ হয় অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিল রামলাল। বোধ হয় আজকের অভিযানটার

কথা আগাগোড়া একবার ভেবে দেখছিল। ভাবছিল—এতো বড় অধর্ম তার সঙ্গীদের দ্বারা কি ক'রে সম্ভব হ'ল ?

কতোক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়েছিল মনে নেই রামলালের। আরো কতোক্ষণ থাকতো বলা যায় না—যদি না এই সময় একটি স্পর্শ তাকে সচকিত ক'রে দিত।

পেছন থেকে সহসা কে তার কাঁধের ওপর হাত রেখে বলে উঠলো : এই ছট্টু! ছুঁড়িটার এখনো জ্ঞান হয়নি মাইরি। আর মদন শালা সেই যে গেছে এখনো—

স্প্রীংএর মতো লাফিয়ে উঠলো রামলাল। আর শোনবার ধৈর্য রইল না তার। হাতের লাঠিটা তার বাতাসের বুকে একটা শব্দ তুলে উন্মত্ত আক্রোশে লোকটির মাথায় এসে পড়লো। পূর্বের লোকটার মতো এও সেই নির্ঘাত আঘাতে একটা অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

লোকটা রামলালকে অন্ধকারে ঠাওর করতে পারে নি—ভেবেছিল তার সঙ্গী ছট্টুই হয়তো দাঁড়িয়ে আছে। রামলাল যে এমন স্থানে এতো দূরে তাদের অনুসরণ ক'রে আসতে পারে এ কথা তারা ভাবতেও পারেনি হয়তো।

এরপর রামলাল আর মুহূর্ত দেরি না ক'রে সেই ভাঙা বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলে। অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন ক'রে প্রবেশ করলে। পা টিপে টিপে এগিয়ে যেতে লাগলো। লাঠিটা শক্ত ক'রে ধরা আছে হাতে। কান উৎকর্ণ। বিশ্বাসঘাতকদের বিশ্বাস নেই। কখন কোন্ দিক থেকে হঠাৎ আক্রমণ করবে, কে জানে।

তারপর অনেক দেওয়াল পেরিয়ে। অনেক ভাঙা ইঁটের স্তূপ মাড়িয়ে অবশেষে অনেক কষ্টে মৃতকল্প একটি যুবতীকে আবিষ্কার করলে। তারপর…

রাত্রি তখন প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। কাজেই সকালের জন্য অপেক্ষা ক'রে রইলো রামলাল।

সকাল যখন হ'ল তখন সর্বপ্রথম যুবতীটির মুখের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলো সে। ভয়ংকর শিউরে উঠলো। এতো বড় মর্মান্তিক দৃশ্য জীবনে আর কখনো চোখে পড়েনি তার। একটা প্রস্ফুটিত শতদল যেন দলিত মর্দিত হ'য়ে পড়ে আছে। পড়ে আছে যেন কোন্ স্বর্গের দেবী শাপভ্রষ্টা হ'য়ে এই বনের মধ্যে। পৈশাচিক অত্যাচারে সর্ব অঙ্গ তার ক্ষত বিক্ষত। কিন্তু মানুষ এতো সুন্দর হয়! একে দেখে পশুগুলোর মায়া হল না!

ডাকাত রামলালের চোখ দুটো জ্বালা ক'রে জল গড়িয়ে এলো।

মৃত্যুর শেষদিন পর্যন্ত ভুলতে পারিনি রামলাল সেই বেদনাময় দৃশ্যের কথা। কেঁদে ফেলেছিল রামলাল। বালকের মতো কেঁদে ফেলেছিল সেই অত্যাচার নিপীড়িত সংজ্ঞাহীন রমণীটির দিকে চেয়ে চেয়ে। কিছুক্ষণের জন্যে কেমন যেন হ'য়ে গিয়েছিল সে। কেমন যেন বিমূঢ়ের মতো ফ্যাল ফ্যাল ক'রে মেয়েটির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর সে এক সময় সচেতন হ'য়ে উঠলো। কে যেন একটা চাবুকের ঘা মেরে তাকে কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন ক'রে দিলে। ছুটে গিয়ে সে মেয়েটির কাছে বসে পড়লো। তার স্খলিত বিপর্যস্ত বস্ত্রটি টেনে নিয়ে তার নগ্ন দেহ আবৃত ক'রে দিলে। মনে মনে বললেঃ আমার কোনো অপরাধ নেই মা—আমায় ক্ষমা করিস। তোর পুণ্য দেহের স্পর্শে ডাকাত রামলালের পাপ কলুষিত জীবন যেন পবিত্র হ'য়ে যায়। মায়ের পরশ ডাকাত রামলাল কখনো পায় নি। আজ তাই মা, তোর পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি—ডাকাতি আর কখনো করবো না—করবো না। আমি তোকে বাঁচাবো মা—যেমন ক'রে হোক বাঁচাবো। তারপর তোর পায়ের তলায় বসে সারা জীবন আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো।

বাস্তবিকই অক্ষরে অক্ষরে সে সত্য পালন করেছিল রামলাল।

রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই সেই জঙ্গলাকীর্ণ ভাঙা বাড়িটার ভেতর থেকে মেয়েটির অচৈতন্য দেহ ঘাড়ে ক'রে বেরিয়ে আসে রামলাল। এবং প্রায় মাইলটাক পথ ঊর্ধ্বশ্বাসে অতিক্রম ক'রে গঙ্গার তীরে উপস্থিত হয়। গঙ্গার তীরে এসে বহু আয়াসে একটি নৌকা সংগ্রহ ক'রে মেয়েটিকে নিয়ে কলকাতায় চলে আসে।

এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত।

কলকাতায় এসে মেয়েটিকে একটি হাসপাতালে দেয় রামলাল। মেয়েটি সন্তানসম্ভবা ছিল এবং তার অবস্থাও বিশেষ আশাপ্রদ ছিল না।

রামলাল অকাতরে অর্থ ব্যয় করেছে তাকে বাঁচাবার জন্যে। জীবনের সমুদয় সঞ্চয়, এমন কি ঘটি বাটি পর্যন্ত বিক্রি ক'রে তার চিকিৎসা চালিয়েছে সে। বড়লোকের মতোই চিকিৎসা চালিয়েছে।

কিন্তু সবই নিরর্থক হ'ল। মেয়েটিকে কোনো মতেই বাঁচানো গেল না। মাস দুই পরে হাসপাতালেই একটি কন্যা-সন্তান প্রসব করে সে। এবং আরো মাস দুই তিন পরে জীবনের শেষ নিশ্বাসে পৃথিবীর ঋণ পরিশোধ ক'রে চলে যায়। যাবার আগে দু' মাসের শিশু কন্যাটিকে রামলালের কোলে তুলে দিয়ে যায়।

সে এক বুকভাঙা বেদনার ইতিহাস! রামলালের বুকে খোদাই হ'য়ে গেছে সে ইতিহাস। যতোদিন বেঁচে ছিল রামলাল, সেই বেদনাকে বুকের তলায় লালন করেছিল।

সেদিনের সেই শিশু কন্যাই আজকের এই রূপসী উল্লাসী। অনিন্দ্যসুন্দরী জননীর গর্ভে উল্লাসীর জন্ম, তাই উল্লাসীর দেহে অতো রূপ। মার্জিতরুচি, শিক্ষিত এবং অভিজাত বংশের কন্যা উল্লাসী! তার রক্তের সঙ্গে বংশের ধারা মিশে আছে। তার কথায়, তার চালচলনে, তার হাবে ভাবে একটা স্বাতন্ত্র্য, একটা বিচিত্র বৈশিষ্ট্য বর্তমান। তাই সহসাই দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে সাধারণের। তাই এ দলের কারো সঙ্গে তার কোনো সামঞ্জস্য নেই। তাই সে

অশোকের ভাষায়—গোবরে পদ্ম! যদিও নিজের বংশ-পরিচয় তার কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এবং সব সময়েই সে নিজেকে রামলালের সম্প্রদায়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে চায়। ওদেরই অনুকরণে, ওদেরই গ্রাম্য ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করে, ওদের মতোই বেশভূষা করে—তথাপি দলের কারো সঙ্গে তার কোনো মিল নেই যেন। সে যেন দল ছাড়া।

জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সে চিনিছে রামলালকে। চিনেছে বিশাইকে। চিনেছে এই সার্কাস দলটিকে। আর জেনেছে সংসারে এরাই আমার আপন জন। নিজের সম্বন্ধে এইটুকু সে রামলালের কাছে শুনেছে যে, তার বাপ-মা কেউ নেই। তার মা মরবার সময় রামলালের হাতেই তাকে তুলে দিয়ে গেছেন। রামলাল তার পালকপিতা। এর অধিক নিজের সম্বন্ধে আর কিছু জানে না সে। জানবার আগ্রহও নেই।

সার্কাস দলে যোগদান করেছে সে নিজের ইচ্ছাতেই। রামলালের ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ।

রামলাল তাকে মানুষ করতে চেয়েছিল সম্ভ্রান্ত ভদ্র বংশের মেয়েদের মতো করেই। সাধ্যাতীত অর্থব্যয়ও করেছিল সে এজন্যে। খাশ কোলকাতায় একটা মেয়ে বোর্ডিংএ কয়েক বছর তাকে রেখে, তার লেখা পড়ার বন্দোবস্তও করেছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারে নি।

অপরিসীম পরিশ্রমে কিছুদিনের মধ্যেই তার শরীর ভেঙে পড়লো। আর ইস্কুল-বোর্ডিংএর খরচ যোগাতে পারলে না। তার ওপর কামিনীর বাক্য যন্ত্রণা। অমন একটা সুন্দরী মেয়ে দলে থাকলে নাকি সার্কাসের উন্নতি হ'য়ে যাবে। সুতরাং মেয়েটার পেছনে অমন বাজে খরচ না ক'রে দলে ভিড়িয়ে নেওয়াই সুবুদ্ধির কাজ।

তবুও রামলাল এতে রাজী হয় নি। হয়তো কোনোদিনই হ'তো না, যদি না উল্লাসী স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসতো।

উল্লাসীকে এপথে এগিয়ে আসতে প্রলুব্ধ করেছিল বিশাই। উল্লাসীর সান্নিধ্য ছিল বিশাইয়ের পরম কামনার বস্তু। উল্লাসীরও বিশাইকে ভালো লাগতো। উল্লাসীর বোর্ডিং-বাসের সময় রামলালের সঙ্গে প্রায়ই বিশাই যেতো তার কাছে। গল্প করতো; নিজেদের ভ্রাম্যমান জীবনের নানা গল্প, নানা অভিজ্ঞতার আশ্চর্য কাহিনী অনর্গল বলে যেতো। অবাক হ'য়ে শুনতো উল্লাসী। অবাক হ'য়ে ভাবতো অদ্ভুত দর্শন খর্বাকার বিশাইয়ের কথা। খারাপ লাগতো না কিন্তু বিশাইকে।

এমনি করেই আস্তে আস্তে তারা পরস্পর পরস্পরের মনের কাছে এগিয়ে গেছে। এমনি ক'রেই একটা মধুর সম্প্রীতি গ'ড়ে উঠেছে দু'জনের মধ্যে। তারপর একদিন যখন বিশাইয়ের সঙ্গে উল্লাসী এসে স্বেচ্ছায় যোগ দিলে সার্কাস দলে তখন রামলাল শুধু একবার ব্যথিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালে। কোনো প্রতিবাদ করলে না—কোনো কথা বললে না। শুধু সকলের অলক্ষ্যে এক ফোঁটা চোখের জল গোপনে মুছে ফেললে। মানসলোকে বারেকের জন্যে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো একখানি বেদনাপাণ্ডুর অশ্রুমুখী মুখ। অব্যক্ত বেদনায় অবরুদ্ধ হ'য়ে গেছে সে মুখের সব ভাষা। দৃষ্টিতে বিচ্ছুরিত কলুষস্পর্শের দাবাগ্নি। দেবকন্যা শয়তানের স্পর্শে অপবিত্র হ'য়ে যেন কালান্তক তপস্যায় শয্যালগ্ন। মুখে ভাষা নেই—দৃষ্টিতে আগুন।

রামলালের বুকের ভেতরটা একবার মোচড় দিয়ে উঠলো। মনে মনে একবার প্রণাম জানালে সে সেই মূর্তির উদ্দেশে। বললে: আমার কোন অপরাধ নেই মা। আমি তোমার মেয়েকে এপথে আনতে চাইনি—সে আপন ইচ্ছায় এসেছে। আমি আজ অক্ষম অকর্মণ্য, আমার বাধা দেবার শক্তিও নেই। ডাকাত রামলালের অপরাধ তুমি ক্ষমা ক'রে গেছ। তোমার পুণ্য স্পর্শে ডাকাত রামলাল নবজন্ম লাভ করেছে। সেই থেকে আর কোনো মন্দকাজ

করিনি—কোনো অধর্ম করিনি। তোমার মেয়েকে তোমার যোগ্য ক'রতে চেয়েছিলুম ; কিন্তু পারলুম না। কেন পারলুম না—তুমি দেবী, তুমি তো সবই জানো মা। আমি আজ অসমর্থ—তোমার মেয়ের ভার আজ থেকে আমি ভগবানের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলুম। আর আমার বিশাইকে তুমি আশীর্বাদ করো মা—সে যেন কোনো কারণে তোমার মেয়ের কোনো অমর্যাদা না করে। বিশাই আমার উল্লাসীকে বড় ভালোবাসে।

রামলালের মনের কথা, রামলালের মনের ব্যথা কেউ জানতে পারে নি। যতোদিন তারপর বেঁচে ছিল রামলাল—বিশাইকে আর উল্লাসীকে নানা সৎ শিক্ষা দিয়ে গেছে। বিশাইকে শিখিয়েছে—উল্লাসীকে শ্রদ্ধা করতে। উল্লাসীকে শিখিয়েছে—বিশাইকে স্নেহ করতে। কিন্তু কোনোদিন উল্লাসীর জন্মকাহিনী ভুলেও প্রকাশ করে নি।

নিজের জন্ম বৃত্তান্ত জানবার বিশেষ কৌতূহলও ছিল না উল্লাসীর। যেটুকু জেনেছে তাই যথেষ্ট মনে করে সে।

বোর্ডিংএ থাকতে কয়েকবার উল্লাসী বোর্ডিংএর মেয়েদের সঙ্গে থিয়েটারে গেছে, বার কয়েক সিনেমাও দেখেছে। ভারী ভালো লেগেছিল তার। যারা অভিনয় করে তাদের সম্বন্ধে একটা উচ্চ ধারণা ছিল তার মনে। অভিনেতা অভিনেত্রীরা গভীর রেখাপাত করেছিল তার অন্তরলোকে। যখন নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকতো সে তখন মনে মনে ভাবতো—যদি সে-ও অমনি অভিনয় করার সুযোগ পেতো! যে ইস্কুলে পড়তো সে সেখানকার কি কি ফাংশানে যেন অভিনয়ও করেছে কয়েকবার। এবং সে-অভিনয়ে অপূর্ব কৃতিত্ব দেখিয়েছে। দর্শকদের, শ্রোতাদের মনে আসন বিস্তার করা—তাদের মনোরঞ্জন করা কী সোজা ব্যাপার! এর যে কী মোহ তা উল্লাসী জানে। তাই বিশাইয়ের আহ্বান উপেক্ষা করতে পারে নি সে। সার্কাস দলে এসে যোগ দিলে। শুধু যোগ দিলে নয়,

সামান্য দিনের মধ্যে এমন দক্ষতা দেখালে যে তাকে দেখবার জন্যেই সার্কাসের তাঁবুতে ভিড় জমতে লাগলো।

অশোক যেন চুম্বকের মতো উল্লাসীকে আকর্ষণ করতে লাগলো।

অশোক অভিনেতা। অশোক থিয়েটারে অভিনয় করে—সিনেমায় অভিনয় করে। অশোক অভিনয়ের শিক্ষা দেয়—অভিনয় পরিচালনা করে। উল্লাসীর মনের সামনে প্রলোভনের সিং-দরজা উদ্‌ঘাটিত ক'রে দিয়েছে অশোক। উল্লাসীর নাকি অভিনয়ে ভবিষ্যৎ আছে। যদি সে অল্পদিন—অশোকের কাছে অভিনয়ের পাঠ নেয় তাহলে সারা ভারতবর্ষে তার সুখ্যাতি পরিব্যাপ্ত হ'য়ে পড়বে। এই ছোট্ট সার্কাস দলের সীমায়িত পরিবেশে তার প্রতিভা সম্যক স্ফুরিত হ'তে না পেরে ধীরে ধীরে নষ্ট হ'য়ে যাবে। তার ভেতরে যে কী বস্তু আছে অশোক তা বুঝতে পেরেছে এবং বুঝতে পেরেছে বলেই তাকে উপযুক্ত যোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। অশোকের কাজই এই। প্রতিভার সন্ধান এবং তাকে যথাযোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা। উল্লাসীর প্রতিভা তাকে বিস্মিত ক'রে দিয়েছে। অবাক ক'রে দিয়েছে। এ প্রতিভা এমন ভাবে নষ্ট হ'তে দেওয়া উচিত নয়। উল্লাসী যদি রাজী হয়—

বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে অশোকের পানে চেয়ে থাকে উল্লাসী। অশোকের কথা শুনতে শুনতে তার মনে একটা পুলক শিহরণ বয়ে যায় যেন। কোলকাতা দেখেছে সে—আজব নগর কোলকাতা তার অপরিচিত নয়। সেখানে নিত্য নতুন উৎসব।

কোলকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করবে সে। ছায়াচিত্রের পর্দায় দেখতে পাওয়া যাবে তাকে। কাগজে প্রকাশিত হবে—প্রচারিত হবে তার প্রতিমূর্তি। দেশের লোকের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করবে সে।

অশোক বলেছে—অভিনয়ে তার ভবিষ্যৎ আছে। অশোক তাকে অভিনয় শিখিয়ে দেবে। প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারবে সে। সেই অর্থে সে যা খুশী তাই করতে পারবে। কোনো ভাগিদার থাকবে না সে-অর্থের। সে-অর্থ একান্তই হবে তার। সেখানে সে স্বাধীন জীবন যাপন করবে। কামিনীর আজ্ঞাধীনে থাকতে হবে না। কামিনীর রক্তচক্ষুর ভ্রুকুটির তলায় দিনাতিপাত করতে হবে না। মুক্ত স্বাধীন জীবন।

এই নাম-যশহীন ঘৃণ্য সার্কাসওয়ালির জীবনে কী আছে? এর না আছে কোনো ভবিষ্যৎ—না আছে দেশ-জোড়া খ্যাতি। ছিঃ!

এ জীবন থেকে মুক্ত হবে সে। এর পরিবেশ অসহ্য। প্রতিদিন এক-ঘেয়ে খেলা। সেই চিমড়ে বুড়ো বাঘ, রোগা কুকুরগুলো, আধমরা ময়লা সাপটা। সেই একঘেয়ে নির্জীব জানোয়ারগুলো আর একঘেয়ে খেলা! এর মধ্যে না আছে বৈচিত্র্য, না আছে নতুনত্ব। এই ঘৃণিত পোশাক, এই জঘন্য বসবাস, এই নোংরা অমার্জিত সঙ্গীদল পরিবেষ্টিত হ'য়ে দুর্গন্ধ পরিপূর্ণ ছেঁড়া তাঁবুর মধ্যে দিনের পর দিন অতিবাহিত করা ক্রমেই অসহ্য বোধ হ'চ্ছে তার। এর থেকে আশু মুক্তি চায় সে। অশোক ঠিকই বলেছে, এ জীবন তার জন্যে নয়। এ কামিনীর শোভা পায়। তার নয়।

চলে যাবে উল্লাসী—নিশ্চয় চলে যাবে অশোকের সঙ্গে কোলকাতায়।

কিন্তু ভবানীকে কেমন যেন ভালো লাগে না তার। অথচ অশোক বলে—ভবানীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে। ভবানীকে চটালে তার ভবিষ্যতের পক্ষে অমঙ্গল হবে। কামিনীকে বিপুল অর্থ দিয়ে ভবানীই তাকে কিনে নিচ্ছে। কোলকাতায় গিয়েও যতোদিন পর্যন্ত না সে উপায়ক্ষম হবে ভবানীই তার ভরণ পোষণ করবে। ভবানী নাকি তাকে ভালোবেসে ফেলেছে।

ভয়ংকর হাসি পায় উল্লাসীর—যখনই মনে পড়ে অশোকের এই

কথাটা যে, ভবানী তাকে ভালোবেসে ফেলেছে। তাকে কোলকাতায় নিয়ে গিয়ে ভবানী রাজরাণীর মতো সুখে রাখবে। নিজে নতুন রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা ক'রে ভবানী তাকে নিয়ে অভিনয় করবে। অশোক থাকবে তাদের অভিনয়ের শিক্ষক। প্রয়োজন হ'লে অবশ্য সেও তাদের সঙ্গে যোগ দেবে অভিনয়ে।

বাস্তবিক কি মজাই হবে তখন! অনাগত সুদিনের কল্পনায় উল্লাসী তন্ময় হ'য়ে যায়। চক্ষু মুদ্রিত ক'রে কল্পনার জাল রচনা ক'রে চলে। সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি মুখ মনের পর্দায় ভেসে উঠে তাকে চঞ্চল ক'রে দেয়। কল্পনার রাজ্য থেকে তাকে টেনে আনে বাস্তবে।

সহসা বিশাইয়ের কথা মনে পড়ে যায় তার। বিশাই—তার আবাল্য সহচর বিশাই। কোথায় মনের মধ্যে একটু বেদনা অনুভূত হয়। বিশাইকে ছেড়ে যেতে হবে। বিশাইকে সঙ্গে নেওয়া যাবে না। বিশাইকে লুকিয়ে চলে যেতে হবে। সভ্য দুনিয়ায় বিশাইয়ের চেহারা নাকি অচল। অশোক এবং ভবানী দুজনেই বিশাইকে সহ্য করতে পারে না। তা ছাড়া সে নিজেও তো বিশাইয়ের চরিত্র জানে। বিশাইকে সঙ্গে নেওয়া নিরাপদ নয়।

আর কেনই বা নেবে? কি সম্পর্ক বিশাইয়ের সঙ্গে তার!

না, এখানের কাউকে সঙ্গে নিয়ে নতুন জীবন আরম্ভ করতে পারবে না সে। বিশাই তার সার্কাস নিয়ে সুখে শান্তিতে থাক—তাকে জড়াবে না সে।

আচ্ছা বিশাই কি তাকে ভালোবাসে? হয়ত বাসে। কিন্তু সে ভালোবাসায় আটকে থাকলে তো তার চলবে না। তাকে যেতেই হবে। এজন্যে বিশাইয়ের যা হয় হোক। কামিনী যখন ভবানীর কাছে টাকা নিয়ে তাকে বিক্রি করছে তখন বিশাইয়ের ব্যাপার সেই বুঝবে। সর্দারণীর ইচ্ছার ওপর তো কারো কিছু বলবার থাকতে পারে না। এখন ভালোয় ভালোয় এখান থেকে বেরুতে পারলেই নিশ্চিন্ত হ'তে পারে সে।

বিশ্বাস নেই—কিছুমাত্র বিশ্বাস নেই বিশাইকে। সে হয়তো তার যাওয়া পণ্ড করেও দিতে পারে। হয়তো অশোক কিংবা ভবানীকে—

হঠাৎ সেই চাটের দোকানের মুসলমান ছোকরার রক্তাক্ত ছিন্ন মুণ্ডটা চোখের সামনে যেন দেখতে পেলে সে। সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠে চক্ষু বুজিয়ে ফেললে! বিশ্বাস নেই—বিশাইকে এতোটুকু বিশ্বাস নেই।

কামিনীও সেদিন এমনি একটা যেন আশঙ্কার আভাস দিয়েছিল। তবে উল্লাসীর ক্ষতি চট ক'রে করতে চাইবে না বিশাই। তাহলেও বিশাইয়ের অলক্ষ্যেই সরে পড়তে হবে উল্লাসীকে।

মনে পড়লো উল্লাসীর অনেকদিন আগে রামলাল একদিন তাকে বলেছিলঃ আমার উলুমাকেও যে এমনি ক'রে আমাদের সঙ্গে জিমন্যাষ্টিক দেখিয়ে পয়সা উপায় করতে হবে তা কে ভেবেছিল! সবই ভগবানের ইচ্ছে। নইলে কার মেয়ে আজ কোথায়! রামলাল থাকলে নিশ্চয় তাকে তার উন্নতির পথে বাধা দিত না।

সেদিন ওই সব পাঁচ কথা ভাবতে ভাবতেই উল্লাসী যেন কোথায় যাচ্ছিল। একটা বুড়ো মোটা বটগাছের পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। গাছটার বিপরীত দিকে দুটি কণ্ঠের চাপা আলোচনা কানে যেতেই থমকে গেল সে।

দুটি কণ্ঠই পরিচিত তার। একটি বিশাইয়ের অপরটি একটি মেয়ের। মেয়েটি তাদেরই দলের এক খেলোয়াড়ের মেয়ে। কিছুদিন থেকে সে-ও খেলায় যোগ দিয়েছে।

মেয়েটি বেশ জোরের সঙ্গে বললেঃ আমি নিজের কানে শুনেছি। পাঁচ হাজার টাকা—

একটা অবিশ্বাসের হাসি শোনা গেল। তারপর শোনা গেল বিশাইয়ের গলা। খ্যান খ্যানে ভাঙা কাঁসীর মতো গলা।

—আমাকে না জানিয়ে, আমার উল্লাসীকে কামিনী বেচতেই পারে না।

—তোমার উল্লাসী কি রকম?

মেয়েটি প্রশ্ন করলে।

—আমার নয়তো কি—

বিশাই বললেঃ আমার বাবা ওকে মানুষ করেছে। আমি ওকে দলে নিয়ে এসেছি। খেলা শিখিয়েছি আমি। আমি ওকে ভালোবাসি। ওর সঙ্গে আমার বে' হবে। আমার বাবা বলে দিয়ে গেছে—উলি আমার বউ হবে। ও আমার নয় তো কি কামিনীর?

মেয়েটি বললেঃ তোমাকে বে' করবার জন্যে ওর বয়ে গেছে না। ও ঠিক চলে যাবে তুমি দেখো কেনে। এই আমি—

কথা শেষ করতে পারলে না মেয়েটা। হঠাৎ একটা আর্তনাদ ক'রে উঠলো। পরমুহূর্তেই বিশাইয়ের গর্জন শোনা গেলঃ ফের ওকথা বললে টুঁটি ছিঁড়ে ফেলবো। দাঁড়া, আমি এখুনি কামিনীকে জিজ্ঞেস করছি যেয়ে।

উল্লাসী তাড়াতাড়ি অন্য একটা গাছের আড়ালে আত্মগোপন করলে এবং তৎক্ষণাৎ দেখতে পেলে বিশাই ঝড়ের মতো তাঁবুর দিকে ছুটে চলেছে।

কি একটা ভয়ংকর অমঙ্গল আশঙ্কায় বুকের ভেতরটা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো উল্লাসীর। কিছুক্ষণ সেইখানে দাঁতে ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়ে থেকে সেও তাঁবুর দিকে দ্রুত চলে গেল।

॥ পাঁচ ॥

একটা আকস্মিক বিপর্যয়ে থম্ থম্ করছে সমস্ত বাড়িটা। গুমরে বেড়াচ্ছে একটা বুকচাপা কান্না এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে। অথচ আজ দীর্ঘদিন ধরেই প্রতি মুহূর্তে ঠিক এরই সংকেতে শঙ্কিত হ'য়ে ছিল সকলে। শঙ্কিত হ'য়ে ছিল জমিদার বাড়ির প্রত্যেকে। তবুও এই ব্যাপারটা আকস্মিক ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারলে না কেউ। এ যেন সহসাই একটা ভূকম্পন ঘটে গেল। একটা মহীধর যেন সে-কম্পনে ধ্বসে গিয়ে এপার ওপার একাকার ক'রে দিলে। তার ছায়াপ্রান্তে নিরুদ্বিগ্নে নিশ্চিন্তে এতাবৎ যারা কালাতিপাত করছিল, অকস্মাৎ তাদের দৃষ্টির সামনে মুক্ত হ'য়ে গেল সীমাহীন বিভীষিকা। আত্ম-প্রকাশ করলে বীভৎস বাস্তব নির্দয় নগ্নতায়।

রাজাবাহাদুর মহেশ্বর ঘোষালের মৃত্যুটা আকস্মিকও নয়, অভাবনীয়ও নয় এবং এর জন্যে প্রস্তুতিও চলছিল তাঁর দীর্ঘকাল ধরে। তবু যেন পরিজনেরা এটাকে স্বচ্ছন্দচিত্তে মেনে নিতে পারছিল না কিছুতেই। কী যেন একটা ভয়ংকর কিছু ঘটে গেল। যেন নিঃশেষ হ'য়ে ফুরিয়ে গেল একটা কী, যার আর কোনো পূরণ নেই। ঠিক এমনি একটা ভাব সকলের মনে।

বসুমতী দেবীর চোখের ওপর যেন সেদিনের ছবি স্পষ্ট ফুটে রয়েছে আজো। যেন দেখতে পাচ্ছেন তিনি। দেখতে পাচ্ছেন, যেন ওই মস্ত পালংটার মাঝখানে এখনো তাঁর স্বামী শুয়ে আছেন। শুনতে পাচ্ছেন স্বামীর কণ্ঠস্বর। শেষ কণ্ঠস্বর। যারপর আর কথা বলেন নি তিনি। সকল বলার শেষ বলা বলে বিদায় নিয়েছেন।

শোকান্বিতা বসুমতী চুপ ক'রে আকাশের দিকে চেয়ে বসেছিলেন।

বসে বসে আগাগোড়া সেই সব কথাই চিন্তা করছিলেন। আর ফোঁটার পর ফোঁটা লবণাক্ত অশ্রু তাঁর গণ্ড বেয়ে ঝরে পড়ছিল।

এই তো সেদিন! এখনো দশ দিন পূর্ণ হয় নি—অশৌচান্ত এখনো হয় নি।

রাত্রে আহারাদির পর, সংসারের খুটিনাটি কাজকর্ম সেরে, স্বামীর ঘরে এলেন তিনি। নিত্যকার মতো স্বামীর পদপ্রান্তে বসে তাঁর শারীরিক ক্লেশের কথা জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। বৈষয়িক চিন্তা এবং সাংসারিক চিন্তা না করবার জন্যে অনুরোধ করলেন। তারপর পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে নানা কথায় অনেক রাত হ'তে তিনি ঘরের মেঝেয় বিছানো আপন শয্যায় গিয়ে শয়ন করলেন।

কতোক্ষণ শুয়েছিলেন মনে নেই। বোধ করি একটু তন্দ্রা এসেছিল। হঠাৎ স্বামীর আহ্বানে ত্রস্তে উঠে বসলেন তিনি। গৃহকোণের কম্পিতশিখা ম্লান দীপালোকে স্বামীর পানে তাকিয়ে দেখলেন—স্বামী স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাঁর পানেই চেয়ে আছেন। তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন তিনি।

—আমায় ডাকছো?

—হ্যাঁ। আমার কাছে এসো!

অকারণেই কেমন যেন চমকে উঠলেন বসুমতী। কেমন একটা অনাগত আশঙ্কা মোচড় দিয়ে উঠলো বুকটার মধ্যে। কিন্তু কোন প্রশ্ন আর না ক'রে তিনি উঠে এসে বসলেন স্বামীর পাশে।

তারপর অনেকক্ষণ উভয়েই নীরব রইলেন। শুধু বসুমতী স্বামীর মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন আর স্বামী চক্ষু বুজিয়ে পতিব্রতার সেই ঐকান্তিক সেবা উপভোগ করতে লাগলেন।

বসুমতী মনে করলেন, হয়তো আবার অসুখটা বেড়ে উঠেছে তাই কিংবা হয়তো অন্য কিছু মনে ক'রে স্বামী তাঁকে কাছে ডেকেছেন। ছেলেদের কথাই হয়তো—অনেকদিন ছেলেরা কাছে

নেই—অসুস্থ মন চঞ্চল হওয়া বিচিত্র নয়। গৌরী একটানা এতোদিন বাইরে থাকে না কখনো—এই প্রথম। আজ সকালেই খবর এসেছে—তার ফিরতে এখনো পাঁচ সাত দিন দেরী হ'তে পারে। ভবানী—

কিন্তু ভবানীর জন্যে কর্তার বিশেষ ব্যগ্রতা নেই। ভবানীর চিন্তা এড়িয়েই যেতে চান তিনি। বসুমতী নিজেও চেষ্টা ক'রে ভবানীর সমস্ত চিন্তা পরিহার ক'রে চলেন। ভবানী দুর্ভাগা! ভবানী ঘোষাল-বংশের কলংক। ভবানীকে গর্ভে স্থান দিয়ে তিনিও সে কলংকের অংশভাগিনী। তবুও ভবানীর কথা মনে পড়তেই মনের কোন্ অজ্ঞাত প্রদেশে, কোন গুপ্ত স্নেহতন্ত্রীতে একটা ব্যথার মৃদু ঝংকার গুঞ্জন ক'রে উঠলো। বুকটার ভেতর কেমন যেন টনটন্ করতে লাগলো।

ছেলেটা বড় অসহায়। মা হয়েও তিনি তার প্রতি কম অবিচার করেন নি।

—বসু!

সহসা চমকে উঠলেন বসুমতী স্বামীর কণ্ঠে। সমস্ত চিন্তা সবলে দূরে সরিয়ে দিয়ে স্বামীর মুখের ওপর হেঁট হ'য়ে মৃদু কোমল স্বরে বললেন: বলো। কষ্ট হ'চ্ছে কি খুব? একবার ডাক্তারকে—

—নাঃ, থাক—ডাক্তারের আবশ্যক নেই।

পুনরায় স্বল্পক্ষণ নীরব হ'য়ে রইলেন মহেশ্বর ঘোষাল। তারপর আস্তে আস্তে একটা নিশ্বাস পরিত্যাগ ক'রে বললেন: ডাক্তার আর আমার কিছু করতে পারবে না। আমি ডাক শুনতে পেয়েছি।

শিউরে উঠলেন বসুমতী। কি যেন একটা ব্যাকুলভাবে বলতে গেলেন, কিন্তু বাধা দিলেন মহেশ্বর।

—ব্যস্ত হয়ো না। সৃষ্টির নিয়মই তো এই—আসা আর যাওয়া। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়ে এখানে কেউ আসে না! যার সময় শেষ হবে, তাকেই যেতে হবে। এর জন্যে অনুতাপ বৃথা।

একটু ম্লান হাসি ফুটে উঠলো মহেশ্বর ঘোষালের মুখে।

ব্যাকুলতা তবুও দমন করতে পারলেন না বসুমতী। জিজ্ঞাসা করলেন: কেন তুমি ওসব কথা বলছ? কী কষ্ট হ'চ্ছে তোমার?

—কষ্ট? না তো। আর কোনো কষ্ট আমার নেই। আমি প্রস্তুত হ'য়েই আছি যাবার জন্যে। তুমি ভয় পেয়ো না বসুমতী। আমার সংসার, আমার বিষয় সম্পত্তি, আমার ছেলেমেয়েদের সমস্ত ভার আজ আমি তোমার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে চলে যেতে চাই। আমার গৌরীশংকর, আমার ভবানীশংকর—

হঠাৎ কথা থামিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন তিনি। তারপর স্তিমিত দৃষ্টি বসুমতীর মুখের ওপর রেখে বিষাদক্লিশিত স্বরে বললেন: ভবানীর জন্যে বড় দুঃখ হয় বসুমতী! সে কেন এমন হ'ল? কিন্তু—কিন্তু—না, আমার আর সময় হবে না! তোমার ওপরই ভার দিয়ে যাচ্ছি—তার ভালোমন্দ তুমি দেখো। সে আমারই ছেলে! আমারই কোন্ অজ্ঞাত পাপের ফলে তার এমন মন্দ মতি হয়েছে।

বসুমতী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন: তার কথা তুমি ভেবো না—

—ভাববো না! নিরন্তর তার কথাই যে আমার সমস্ত ভাবনা জুড়ে আছে বসুমতী!

এক মুহূর্ত থেমে মহেশ্বর আস্তে আস্তে বললেন: তবে একটা সান্ত্বনা নিয়ে যাচ্ছি—গৌরী তার ভায়ের প্রতি অবিচার করবে না। কিন্তু ছোট বউমা—বড় লক্ষ্মী মেয়ে—তার জীবনটা নিষ্ফল হ'য়ে গেল। ভবানী নয়—সেজন্যে তুমি আমিই দায়ী।

পুনরায় একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করলেন তিনি। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকার পর আবার বললেন: আমার অসমাপ্ত কাজ তুমি শেষ কোরো! আমার সময় সংক্ষেপ হ'য়ে আসছে। কেমন যেন একটা—বসুমতী, আমার ছেলেমেয়েদের সব খবর দেওয়া

হয়েছে? একবার তাদের সব শেষ দেখা দেখে যেতে চাই। শেষ আশীর্বাদ ক'রে যেতে চাই।

এই সময় গলাটা কেমন ধরে এলো তাঁর। বার কয়েক কেশে গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিলেন। নিয়ে আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন: দীর্ঘকাল সুখে দুঃখে, আপদে বিপদে তুমি আমার পাশে পাশে ছিলে—আজ আবার তোমায় আমায় ছাড়াছাড়ি হবে। মঙ্গলময়ের ইচ্ছাই জয়যুক্ত হোক!

সমস্ত দেহটা যেন আস্তে আস্তে পাষাণে পরিণত হ'য়ে গেছে ধস্তুমতীর। স্বামীর কপালের ওপর সঞ্চালিত হাতখানা কখন থেমে গেছে জানতেও পারেন নি। নিস্তব্ধ নির্বাক হ'য়ে বসে আছেন তিনি। একবার ইচ্ছা হ'ল চিৎকার ক'রে লোকজনদের ডাকেন, কিন্তু সামর্থ্যে কুলালো না। কণ্ঠেও স্বর নেই।

মহেশ্বর তেমনি আস্তে আস্তে ব'লে চলেছেন: মঙ্গলময়ের ইচ্ছার 'পরে নিজেকে সমর্পণ করার যে কী তৃপ্তি!—কিন্তু ও কী? তুমি কাঁদছো? কেঁদো না, ছিঃ। কান্না তোমার শোভা পায় না। তুমি তো সবই জানো—তোমার পিতৃদেব তোমায় শিক্ষা দিতে তো কার্পণ্য করেন নি। জন্ম-মৃত্যু মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। এক একটি উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা এখানে আসি, আর তা শেষ হ'লেই চলে যেতে হয়। ভগবানের রাজ্যে এই নিয়ম। এর জন্যে অনুতাপ করা দেহ মনকে পীড়ন করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আবার কিছুক্ষণ মৌন থেকে বললেন: তবে দুঃখ হয় বইকি! এতোদিনের মায়া মমতা স্নেহ—এক মুহূর্তে সব কিছু নিঃশেষে পরিত্যাগ করার দুঃখও কী কম!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—কতকটা নিজের মনেই যেন তিনি বললেন: কিন্তু উপায় কী! সেই দুঃখ জয় করতে পারাই তো যথার্থ [illegible]রা। মরণকে আমার কোনো ভয় নেই। মরণকে প্রশান্তচিত্তে বরণ করার শিক্ষা আমি পণ্ডিত মশায়ের

কাছে পেয়েছি। এর জন্যে অনেকদিন থেকেই আমি প্রস্তুত হ'য়ে আছি।

বসুমতীর বুক নিংড়ে একটা সশব্দ নিশ্বাস নির্গত হ'য়ে গেল। টপ্ টপ্ ক'রে ফোঁটা দুই চোখের জল স্বামীর কপালে ঝরে পড়লো। বুকটার ভেতর কেমন যেন একটা অসহ্য বেদনা—যেন হৃৎপিণ্ডটা মুচড়ে মুচড়ে উঠতে লাগলো। উদ্দাম কান্নার আবেগ প্রাণপণে দমন করার প্রয়াস করতে লাগলেন তিনি অটল হ'য়ে বসে দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে ধরে। আর শুনতে লাগলেন মুমূর্ষু স্বামীর ক্ষীণ মৃদুকণ্ঠের কথা।

স্বামী তেমনি ভাবেই থেমে থেমে জড়িত স্বরে ব'লে যাচ্ছেন: আমার কোনো ভয় নেই! বসুমতী, তুমি হয়তো দেখতে পাচ্ছ না —ভাবতেও পাচ্ছ না হয়তো—আমার সামনে কী ঘটে যাচ্ছে পরের পর। আমার সামনে প্রগাঢ় অন্ধকার। কিন্তু বড় স্নিগ্ধ, বড় মনোরম! আর সেই অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছি আমি—মরণের পারে হারিয়ে যাওয়া কতো চেনা মুখ। এক একটি মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে। পণ্ডিতমশাইকেও যেন দেখলুম একবার। বসুমতী, আমার ভেতর কী যেন একটা হ'চ্ছে। মনে হচ্ছে—কী একটা বেরুবার জন্যে ঠেলাঠেলি করছে ভেতরে। নিশ্বেসটাও মাঝে মাঝে—উঃ! বড় গরম হ'চ্ছে! আচ্ছা, বাইরে বাতাস বইছে না? আলোটা একটু জোর ক'রে দেবে, বসুমতী! তাই তো—তাই তো, এতো শিগগির! ছেলেগুলোর সঙ্গে তবে বুঝি আর দেখা হ'ল না। তুমি—তুমি আমার আশীর্বাদ জানিও তাদের—

আর শুনতে পারলেন না বসুমতী—সংজ্ঞা লুপ্ত হ'য়ে গেল তাঁর। স্বামীর শয্যার ওপরই লুটিয়ে পড়লেন তিনি। তারপর কী হ'ল না হ'ল আর কিছু মনে নেই তাঁর।

জ্ঞান যখন ফিরলো তখন চারিদিকে দিনের আলো ঝলমল্ করছে। স্বামী ইতিমধ্যেই মহাপ্রস্থান করেছেন। তখনও স্বামীর

প্রাণহীন শীতল অনড় দেহ তাঁরই পার্শ্বে শায়িত। আত্মীয়-পরিজনদের বুকফাটা আর্তনাদে সমস্ত অট্টালিকা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

আস্তে আস্তে উঠে বসলেন বসুমতী। নিষ্পলক নেত্রে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলেন। তারপর তাঁর পায়ের ওপর মাথাটা লুটিয়ে দিয়ে আরো অনেকক্ষণ পড়ে রইলেন। মুখে কথা নেই, চোখে জল নেই। এমনি ক'রে আরো কতো সময় কেটে গেল। হঠাৎ অনুরাধার কান্নার স্বরে সংবিৎ ফিরে পেলেন তিনি। চোখ তুলতেই দেখলেন ঘরের কোণে উপুড় হ'য়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে অনুরাধা—

এখনো যেন সমগ্র দৃশ্যটাই চোখের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে বসুমতীর। ভেসে বেড়াচ্ছে আরো কতো অতীত বেদনার দৃশ্য। বিবাহ রাত্রের সেই অপ্রত্যাশিত ঘটনার কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে সেই অঘটনের কথা! কোথা দিয়ে কী হ'য়ে গেল যেন। কে কল্পনা করেছিল—বিখ্যাত জমিদার মহেশ্বর ঘোষালের গৃহিণী হ'য়ে তিনি এ গৃহে আসবেন! শুধু এই বিরাট সংসারের গৃহিণী হ'য়েই আসেন নি তিনি—সেই একই দিনে মায়ের গৌরবও লাভ করেছিলেন—গৌরীশংকরকে বুকে পেয়ে। তারপর কতোদিন, কতো মাস বর্ষ অতীত হ'য়ে গেল এই সংসারে। এ সংসারের প্রতিটি প্রাণী, প্রতিটি বস্তু কখন কোন ফাঁকে, কেমন ক'রে তাঁর একান্ত আপন হ'য়ে গেল কে জানে। এই বিশাল জমিদারী, এই বিরাট অট্টালিকা, এই অসংখ্য আত্মীয় পরিজন আর প্রজা সাধারণ গ্রন্থির পর গ্রন্থি রচনা ক'রে তাঁকে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে ফেলেছে। এর কোথাও এতোটুকু আঘাত লাগলে সে আঘাত তাঁর বুকে এসে বাজে। মৃত্যু ব্যতীত এ থেকে আর তাঁর পরিত্রাণ নেই। এর ওপর আবার এলো আর এক কঠিন কর্তব্য—স্বামীর অন্তিম আদেশ। তাইতো—

অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থেকে চোখ দুটো জ্বালা করতে লাগলো

বসুমতীর। নীল আকাশের দিক থেকে দৃষ্টিটা সরিয়ে নিলেন তিনি। কিন্তু ভাবনাটা সরলো না—সেটা একমনে জাল বুনে চলতে লাগলো।

অতীত চিন্তা ভালো লাগে বসুমতীর—ভালো লাগে স্মৃতির রোমন্থন করতে। সেই বিবাহের দিন থেকে এই বৈধব্যের দিন পর্যন্ত স্বামীর স্মৃতিগুলিকে একে একে উল্‌টে পাল্‌টে দেখতে বেশ লাগে। কিন্তু অবসর কই? স্বামীর মৃত্যুতে যে মহা দায়িত্ব সহসা তাঁর ঘাড়ে এসে পড়েছে, তাতে একটু একান্তে বসে শোক করারও অবকাশ নেই তাঁর। এই প্রকাণ্ড সংসারের, অগণিত আত্মীয় পরিজনের তত্ত্বাবধান সমস্তই তো তাঁর ওপর। তা ছাড়া শ্রাদ্ধের দিনও এগিয়ে এলো—মাঝে আর একটি দিন মাত্র বাকী।

কেমন ক'রে কী হবে ঈশ্বর জানেন। যেখানে যতো আত্মীয় কুটুম্ব আছেন সকলকেই প্রায় জানানো হয়েছে। আসবেনও সম্ভবত সবাই।

গৌরীশংকরের ইচ্ছা রীতিমত জাঁকজমক সহকারে পিতৃশ্রাদ্ধ করবে। আয়োজনও সেই রকমই করছে।

গৌরীর মস্ত বড় দুঃখ—মৃত্যু সময় সে পিতার পাশে থাকতে পারে নি। সংবাদ পেয়ে কোলকাতা থেকে বাড়ি ফিরলো সে পিতার মৃত্যুর একদিন পরে।

একটা মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে কোলকাতায় যেতে হয়েছিল তাকে। অবশ্য যেতে হয়েছিল পিতারই আদেশে—হাইকোর্টে একটা মকদ্দমার আপিল করতে। নইলে হাজার পাঁচেক টাকা আয়ের একটা বিষয় হাত ছাড়া হ'য়ে যাচ্ছিল। এতেও যে না যাবে এমন কথা জোর ক'রে বলা যায় না, তবে আশা—হয়তো ঠেকানো যাবে।

তার কাছে যখন এই অশুভ বার্তা গিয়ে পৌঁছল তখন সে কোর্ট থেকে সবেমাত্র ফিরেছে। তখনও জামা কাপড় ছাড়া হয়নি। সংবাদটি শুনেই বিদ্যুৎপৃষ্ঠের মতোই শিউরে উঠেছিল সে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোন কথা বলতে পারে নি—বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়েছিল।

তারপর মায়ের মুখখানা মনে পড়তেই বুকটার ভেতর উদ্বেল হ'য়ে উঠেছিল একটা চাপা কান্না।

আর মুহূর্ত বিলম্ব করেনি সে, তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়েছিল রাধানগরে তার বাড়ির উদ্দেশে। যেখানে তার শোকাবিভূতা জননী কঠোর কঠিন বেদনা হৃদয়ে ধারণ ক'রে তার পথ চেয়ে বসে আছেন।

রক্তজবার মতোই চোখ দুটোকে রক্তিম ক'রে বাড়ি ফিরেছিল সেদিন গৌরীশংকর। বাবাকে একবার শেষ দেখাও দেখতে পায়নি সে! একি তার কম দুঃখ! তার ওপর মায়ের চিন্তা তাকে আরো ব্যাকুল ক'রে তুলেছিল। সারাপথ শুধু এই কথাই সে ভাবতে ভাবতে এসেছে যে—না জানি এই শোক কতো গুরুতর হ'য়ে আঘাত হেনেছে তার মায়ের বুকে। যতোবারই কথাটা মনে হয়েছে, ততো বারই শিশুর মতো ফুলে ফুলে কেঁদে উঠেছে সে। তার মায়ের প্রকৃতি সে ছাড়া আর কেউ বোঝে না। ভবানীও না। তাঁর এই সীমাহীন শোকে কে সান্ত্বনা দেবে তাঁকে? তাঁকে বুঝতে পারে না কেউ। তিনি যে মা বসুমতী। তাঁর বুকের তলায় যখন ব্যথার সাগর তোলপাড় করে—যখন দুঃখের দাবানল দাউ দাউ ক'রে জ্বলে ওঠে, পাঁজরের তলায় তলায় ভস্মের স্তূপ স্তূপীকৃত হ'য়ে যায়, তখনো তাঁর মুখের চিরপ্রশান্ত স্নিগ্ধ হাসি তো মিলিয়ে যায় না। কে বুঝবে তার মায়ের বেদনার ভাষা?

বাড়ি ফিরেই গৌরী ছোট্ট ছেলের মতো চিৎকার ক'রে উঠলো: আমার মা—আমার মা কোথায়?

দোতলার খোলা বারান্দায় বসেছিলেন বসুমতী। স্থির নির্বাক হ'য়ে বসেছিলেন। দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল অনন্ত শূন্যে—যেখানে বিদায়ী সবিতার রক্তরশ্মি বিকীর্ণ হচ্ছিল। যেখানে নীলাম্বর রাঙা রবির বর্ণচ্ছটায় শোণিতাভ। বসুমতী নির্নিমেষ চোখে সেই দিকে চেয়ে বসেছিলেন।

বোধ করি বাহ্যজ্ঞানও ছিল না তাঁর।

অকস্মাৎ চমকে উঠলেন গৌরীর ব্যাকুল আহ্বানে। দৃষ্টি ফেরাতেই দেখতে পেলেন, উন্মত্তের মতো ওদিকের অলিন্দ অতিক্রম ক'রে ছুটে আসছে গৌরী—ছুটে আসছে তাঁরই সন্ধানে! দেখতে দেখতে গৌরী ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো তাঁর বুকের মধ্যে।

—মা গো! আমাদের কি হ'ল মা!

বহুক্ষণ মাকে না দেখে রোরুদ্যমান ক্ষিপ্ত শিশু যেমন করে—মায়ের দেখা পেলে তাঁর বুকে আছড়ে পড়ে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কেঁদে ওঠে, ঠিক তেমনি ক'রেই মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠলো গৌরী।

দুটি বাহুর সবল বেষ্টনে তার মুখখানা নিজের বুকে চেপে ধরলেন বসুমতী। চেপে ধরে অনেকক্ষণ নীরবে বসে অশ্রু বিসর্জন করলেন। তারপর এক সময় নিজেকে সংযত ক'রে নিয়ে ভিজে গলায় আস্তে আস্তে বললেন ঃ গৌরী! বাবা আমার—শান্ত হও বাবা!

—মাগো—

জননীর সান্ত্বনার স্বরে আরো উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো গৌরী।

বসুমতী তেমনি আস্তে আস্তে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলতে লাগলেন ঃ অধৈর্য হয়ো না বাবা আমার। অনেক কাজ যে এখন তোমার মুখ চেয়ে পড়ে রয়েছে, গোপাল। তুমি ছাড়া সে সব তো আর কেউ করতে পারবে না।—

আবার কিছুক্ষণের জন্য মাতাপুত্রের মধ্যে সেই অখণ্ড নীরবতা নেমে এলো।

সহসা কি একটা মনে পড়ে যেতে গৌরী সনিশ্বাসে উঠে বসলো! মায়ের মুখের ওপর জল ভরা চোখ দুটো স্থির-স্থাপন ক'রে চুপ ক'রে বসে রইলো। বর্ষার মেঘমুক্ত আকাশের মতো সে মুখ স্নিগ্ধ শান্ত। এই ক্ষণপূর্বে যে ঘন বর্ষণ হ'য়ে গেছে সেখানে—তার কোনো চিহ্নই আর বর্তমান নেই।

ম্লান একটু হাসলেন বসুমতী। হাসলেন গৌরীর মুখ-ভাব লক্ষ্য ক'রে।

—কী দেখছিস রে গৌরী?

—তোমাকে মা!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন ক'রে গৌরী বললে: মা—

কিন্তু বক্তব্যটা শেষ না করেই আবার মায়ের কোলের মধ্যে মুখখানা লুকিয়ে ফেললে।

বসুমতী তার মাথার চুলের ভেতর আঙুল চালাতে চালাতে স্নেহস্নিগ্ধ স্বরে বললেন: কী রে? কী বলছিলি বল?

—না, থাক। পরে বলবো।

—তাই বলিস্।

আরো একটু চুপ ক'রে থেকে গৌরী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে: ভবানী আসেনি মা?

—না।

—না কেন?

গৌরী উঠে আবার সোজা হ'য়ে বসলো। ভুরু দুটো কুঁচকে গেল তার।

—সে শোনেনি? তার কাছে—

—লোক গেছে। আজ বোধ হয় আসবে।

—বোধ হয়! তবে বুঝি তার কাছে খবর যায়নি? এটা কিন্তু তোমাদের ভারী অন্যায় মা। তাকে যেন কোনো ব্যাপারে তোমরা আমলই দিতে চাও না। কেন, সে কী করেছে তোমাদের? সঙ্গ দোষে একবার বিপথে গিছলো বলে চিরকাল কী সেই অপরাধে তার প্রতি তোমরা অবিচার করবে? পিতৃবিয়োগ কী শুধু আমারই হয়েছে—তার হয়নি!—না না, এ মোটেই ভালো নয়—এ অত্যন্ত অন্যায়। সে এজন্যে আমাকেই দোষারোপ করবে।

বলতে বলতে উঠে পড়লো সে। ঠিক সেই সময় সামনের বড়

হল ঘরখানার দিকে নজর পড়লো তার। দেখলে, বিষণ্ণ কাতর মুখে অনুরাধা দাঁড়িয়ে। উদাস ব্যথিত দৃষ্টি মেলে কী যেন দেখছে। হঠাৎ দুজনার চোখোচোখি হ'তেই ত্বরিত গতিতে অনুরাধা সরে গেল তার দৃষ্টির সীমানা থেকে।

—মা!

বসুমতী গৌরীর আহ্বানে মুখ তুলতেই সে প্রশ্ন করলেঃ বউমার কী অসুখ বিসুখ করেছে? বড্ড শুকনো শুকনো দেখলুম যেন।

নিরুত্তরে বসুমতী শুধু একটু হাসলেন।

গৌরী আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা না ক'রে চিন্তিত মুখে আস্তে আস্তে স্থান ত্যাগ করলে। কতোক্ষণ পরে পুনরায় ফিরে এলো মুখ চোখ লাল ক'রে! যেন কী একটা ঘটেছে!

—মা, শুনেছ? তোমার ছেলের কাণ্ড শুনেছ?

সপ্রশ্ন নেত্র তুলে বসুমতী তাকালেন তার দিকে।

—বাবু মৌগাছি থেকে সটান কোলকাতা চলে গেছেন।

—কে বললে?

—কে আবার? যে লোককে পাঠিয়েছিলে তুমি তার কাছে খবর দিয়ে, সেই এইমাত্র ফিরে এসে বললে! সেখানে শুধু করালী আর অশোক আছে! তিনি পরশু রাত্রে কোলকাতায় চলে গেছেন। পাড়াগাঁয়ে তাঁর স্বাস্থ্য টিকছে না। অশোক বলেছে—কাউকে কিছু না বলেই নাকি তিনি চলে গেছেন।

—তাহলে কোলকাতায় গেছে কী ক'রে ওরা জানলে?

—অনুমান। প্রথমে ওরা ভেবেছিল বাড়ি চলে এসেছে। কিন্তু এখানে যখন আসেনি জানলে তখন কোলকাতা ছাড়া আর কোথা যাবে? তা ছাড়া—

কথাটা অসমাপ্ত রেখেই গৌরী থেমে গেল।

বসুমতী ভুরু কোঁচকালেন।

—তা ছাড়া—কী?

—না, কিছু নয়। সে আর তোমার শুনে কাজ নেই। কিন্তু—না, ব্যাপারটা ভালো ক'রে জানা দরকার। লোক পাঠিয়ে হবে না—আমাকেই যেতে হবে।

গৌরী প্রস্থানোদ্যত হ'তেই বসুমতী ধীর গম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন: গৌরী, কী হয়েছে বল দিকি আমাকে ভেঙে! কোথায় লোক পাঠিয়ে হবে না—তোকে যেতে হবে?

—কোথায় আবার—মৌগাছিতে। সত্যি মিথ্যে ব্যাপারটা একবার ভালো ক'রে জেনে আসা দরকার তো। সকলেই যদি শত্রুতা করে তাহলে তার পক্ষে বেঁচে থাকা যে দুর্ঘট হ'য়ে পড়ে।

বলেই চলে যাচ্ছিল গৌরী, বসুমতী বাধা দিলেন।

—শুনে যা গৌরী! এরকম অবস্থায় হট ক'রে মৌগাছি গেলে তো তোমার চলবে না। সে সময় মতো ঠিক আসবে অখন। তার জন্যে ব্যস্ত হবার কোনো দরকার নেই।

—দরকার নেই!

আকাশ থেকে পড়লো যেন গৌরীশংকর।

—না। তা ছাড়া সে এসেই বা কী এমন রাজ্য জয় ক'রে দেবে? কাজকম্মের বাড়িতে তার না থাকাই ভালো। সে এলে আমিই তাকে এ বাড়িতে ঢুকতে দোব না।

সবিস্ময়ে গৌরী মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। মিনিট খানেক কোনো কথাই বলতে পারলে না। তারপর বললে: তুমি কী বলছ মা?

—আমি ঠিকই বলছি। সব কথাই শুনেছি আমি।

—শুনেছ হয়তো, কিন্তু এ কী বিশ্বাসের যোগ্য কথা মা?

—অবিশ্বাসেরই বা কী আছে! করালী মিছে কথা বলবে না।

—অশোক'ও যে বলেছে—

—অশোকের কথা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। অশোক ছেলে ভালো নয়। আমার মনে হয় অশোকের সঙ্গে সড় করেই

ভবানী একাজ করেছে। আর নিজের দোষ ঢাকবার জন্যে অশোক এখন ভালো মানুষ সাজছে।

অবিশ্বাসভরে মাথা নাড়তে নাড়তে গৌরী বললেঃ না, মা—এ হতেই পারে না। এ তোমার ভবানীর ওপর ভয়ংকর অবিচার হ'চ্ছে। এতো হীন ভবানী নয়। একটা ভুল একবার করেছে বলে তোমাদের সন্দেহ অবশ্য হ'তেই পারে; কিন্তু একাজ তার দ্বারা হ'তে পারে না। এ আমি একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বলতে পারি। বাবা যে অবিচার তার ওপর ক'রে গেছেন মা, তুমিও যেন আবার তার পুনরাবৃত্তি কোরো না—তোমার পায়ে পড়ি।

ছেলেমানুষের মতো মায়ের পা দুটো জড়িয়ে ধরলে গৌরী।

—তোমার কি এতোটুকু মায়া হয় না মা ভবানীর জন্যে? তাকে এমনি ভাবে কেন তোমরা তফাতে ঠেলে দিচ্ছ?

—তার নিজের দোষে—

—দোষ একবার করেছে বলে কি বার বার তাকে সন্দেহ ক'রে কষ্ট দিতে হবে? তুমি তো মা—

—গৌরী!

—মা।

—তুমি বড় হ'য়েছ, বুদ্ধি হ'য়েছে। গুরুজনের কাজের বিচার ক'রে—

—না, মা, আমি কাজের বিচার করছি না। শুধু তোমাকে অনুরোধ করছি—ভবানীর ওপর বাবার মতো তুমিও কঠোর হ'য়ো না। সে বড় অসহায়।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব। তারপর [illegible] নিশ্বাস মোচন ক'রে গৌরী বললেঃ কিন্তু তুমি যতোই [illegible] ভবানীর সম্বন্ধে তুমি ভুল ধারণা করছ। বাবাও—

—ভুল ক'রে গেছেন? কেমন না?

অদ্ভুত একরকম হাসি হাসলেন বসুমতী গৌরীর দিকে চেয়ে।

মাথা হেঁট ক'রে গৌরী বললেঃ আমার অপরাধ নিও না মা। তবে একথা আমি বলবো যে, বাবার কাছে ভবানী সুবিচার পায়নি।

বসুমতীর গলা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলোঃ গৌরী!

—না মা। ও তুমি যতোই রাগ করো। তবু আমি বলবো—বাবা ভুল করেই গেছেন! ভবানীকে তিনি—

হঠাৎ মায়ের মুখে দৃষ্টি পড়তেই গৌরীর কথা বন্ধ হ'য়ে গেল।

আবার কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা। তারপর—

একটু মলিন হাসি হাসলেন বসুমতী। এ হাসি যেন কান্নারই নামান্তর। বললেনঃ তিনি ভুল ক'রে যান নি গৌরী! তিনি ভবানীর ভবিষ্যৎ চোখের সামনে দেখতে পেয়েছিলেন। আর আমিও এর পর ভবানীর সম্বন্ধে কোনো দুর্বলতা মনের মধ্যে রাখবো না। ভবানী আমার গর্ভের কলংক—আমার লজ্জা!

—কিন্তু ব্যাপারটা সব না জেনেই—

—সব জেনেছি আমি গৌরী—সব জেনেছি। আর এ মিথ্যে নয়। আজ সকাল বেলা—একটা বেঁটে, বামন গোছের ছেলে ভবানীকে খুঁজতে এসেছিল। তাকেই জিজ্ঞেস ক'রে সব কথা জানতে পারলুম। তারই ভাবী-স্ত্রীকে নাকি নিয়ে পালিয়েছে ভবানী।

—সে কে? মৌগাছির লোক?

—না। ওখানের শিবমেলায় সার্কাস দেখাতে এসেছিল তারা। সে মেয়েটাও নাকি সার্কাসে খেলা দেখাতো।

বসুমতীর সারা মুখে একটা ঘৃণার ভাব পরিস্ফুট হ'য়ে উঠলো। বললেনঃ ভবানীর প্রবৃত্তি যে এতোখানি নিচে নামতে পারে তা আমি কোনোদিন ক[illegible]রি নি। কিন্তু গৌরী, কথাটা নিয়ে বেশি যেন আলোচনা [illegible]—অনুরাধার কানে না যায়।

চিন্তিত মুখে গৌরী চলে গেল এবং বসুমতী তেমনি আকাশে দৃষ্টি মেলে একটা অদম্য রোদনোচ্ছ্বাস দমন করার প্রয়াস করতে লাগলেন।

উঃ! কী অসহ্য অপমান! তাঁর গর্ভের সন্তান হ'য়ে ভবানী এ কি করলে!......

দেখতে দেখতে কটা দিন কেটে গেল—শ্রাদ্ধের দিন এগিয়ে এলো; কিন্তু ভবানী সত্যিই এলো না। তার কোনো বিশ্বাসযোগ্য সংবাদও পাওয়া গেল না।

॥ ছয় ॥

মার্জারের মতো লঘুপদে কামিনীর তাঁবুর পেছনে এসে দাঁড়ালো উল্লাসী। উৎকর্ণ হ'য়ে শুনতে লাগলো ভেতরের কথাবার্তা।

ইতিমধ্যেই বিশাই উপস্থিত হয়েছে সেখানে। উপস্থিত হ'য়েছে শুধু নয়—ভয়ংকর অবস্থায় উপস্থিত হ'য়েছে। যেন একটা আগুনের ঝলকানি তার সর্ব শরীরে হুহু ক'রে বইছে। চোখে মুখেও সে আগুনের আভাস। গলা দিয়ে যেন স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়ছে। তার উত্তেজিত কণ্ঠের স্বর অনেক দূর থেকেই শোনা যাচ্ছিল, এখন আরো স্পষ্ট হ'য়ে কানের মধ্যে আছাড় খেয়ে পড়তে লাগলো উল্লাসীর।

বিশাইয়ের এ স্বর তার মোটেই অপরিচিত নয়। শিউরে উঠলো সে। বুকের ভেতর যেন হাতুড়ির ঘা পড়তে লাগলো।

ভেতর থেকে বিশাইয়ের গর্জন শোনা গেল। ভাঙা কাঁসি যেন পাথরে আছড়াচ্ছে কে।

আলবাৎ! উ আমার সম্পত্তি। বাবা আমারে দিয়ে গেছে। কার হুকুমে তু ওরে বেচতে যাস্? কালকা

তার চেয়েও ভীষণ, তার চেয়ে ... একটা গলা খ্যাঁন্ খ্যাঁন্ ক'রে বেজে উঠলো। কামিনী সর্দারণীর সে গলা।

—উরে আমার সম্পত্তিবালারে!

একটা অবজ্ঞার হাসি হেসে উঠলো কামিনী। ...চেয়ে।

উল্লাসীর বুকের ভেতরটা কেমন ক'রে উঠলো যেন। গায়ের রোঁয়া খাড়া হ'য়ে উঠলো।

কামিনী তেমনি ভীষণ গলায় গর্জে উঠে বললে: উরে ছোঁড়া, তুর বাপ্ আমারে ডরতো—তু আল্‌ছিস্ চোখ দেখাতি! তুরে দয়া ক'রে রাখা করেছি কিনা এখানে, তাই—না?

—কী বললি?

পুনর্বার চিৎকার ক'রে উঠলো বিশাই।

—ঠিক বলছি।, শুন্ তবে বলি—ও উলিরে আমি আর দলে রাখবো নাই—উর বড় দেমাক হইছে। উর কুলেরও ঠিক নাই। দলের মেয়েরা উর সঙ্গে মিশে খারাপ হয়্যা যাবে। আর, তুমারেও আমি আর আমার খেলার দলে রাখবো নাই। সাফ্ কথা।

—তুর দল?

—নইলে কী তুর বাবার দল?

হঠাৎ বিকট চিৎকার ক'রে উঠলো বিশাই।

—চুপ!

বিশাইয়ের প্রকৃতি যেন আজ সম্পূর্ণ বদলে গেছে। চিরদিন ভালো মন্দ যে কাজই সে করেছে—চুপচাপ ক'রে গেছে। অতি অন্তরঙ্গকেও কোনোদিন বুঝতে দেয়নি তার অভিপ্রায়। এমন কি তাব প্রসন্নতা বা রোষও প্রকাশ পেতো না তার চোখে মুখে। প্রচণ্ড ক্রোধেও তার মুখে হাসির ঝিলিক খেলে গেছে, আবার খুশীর ব্যাপারে মুখে তার প্রস[illegible]তা দেখা দেয়নি—দেখা দিয়েছে ভ্রুকুটি। প্রকৃতিটা ছিল তার সাধা[illegible] অবোধ্য। দলের লোকেরা তাই তাকে ভয় ক'রে চলতো। [illegible] ভয় করতো। দুনিয়ায় একমাত্র বিশাই ছাড়া কামিনী বো[illegible] হয় আর কাউকেও ভয় করে না। কিন্তু দৃ[illegible] কামিনীরও যেন কি হয়েছে। বোধ হয় অর্থের লোভ তাকে লাগলেন। [illegible]। নইলে বিশাইয়ের মুখের ওপর এতো বড় কথা [illegible]তো না তার।

বিশাইও আজ মরিয়া। কামিনীর মুখে এতো বড় কথা শোনবার পর স্থির থাকা তার স্বভাব নয়।

বিশাই চিৎকার ক'রে বললেঃ মুখে লাগাম দে তু বলছি।

—তু এখান থেকে দূর হ বলছি।

কামিনীও সমানে চিৎকার ক'রে উঠলো।

—আমি এ দলের সর্দারণী জানিস্। তুর—উ কী—উ কী—উ—অঃ—অঃ—

সমস্ত শিরা উপশিরায় যেন একটা তড়িৎপ্রবাহ বয়ে গেল উল্লাসীর। কামিনীর অকস্মাৎ কী হ'ল! অমন বীভৎস স্বর তুলে থেমে গেল কেন কামিনীর কণ্ঠ?

একটু সরে গিয়ে একটা ছিদ্র পথে চোখ লাগিয়ে তাঁবুর ভেতরে দৃষ্টিপাত করলে উল্লাসী। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেহ তার অবশ হ'য়ে এলো—ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগলো হাওয়া লাগা বাঁশ পাতার মত। আতঙ্কে মূর্চ্ছার উপক্রম হ'ল তার। গলার ভেতরটা যেন শুকিয়ে কাট হ'য়ে গেল মুহূর্তে—জিভটা ভেতর দিকে টানতে লাগলো।

চোখের সামনে একি দেখছে সে! এ ভয়াবহ বিভীষণ দৃশ্য দেখার কল্পনাও তো করতে পারে নি সে কোনোদিন। একি করলে বিশাই!

ভয়ার্ত বিহ্বল দৃষ্টি মেলে উল্লাসী দেখলে, কামিনীর তাঁবুর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে বিশাই। চোখ দুটো থেকে তার যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে। হাতে তার রক্তমাখা একটা বাঁকা টাঙি। আর তারই পদপ্রান্তে কামিনী সর্দারণীর দ্বি[illegible] সুবিশাল বপু পড়ে আছে। রক্তে সারা ঘর ভেসে যাচ্ছে। তখনো কামিনীর হাতীর মতো প্রকাণ্ড দেহটা স্থির হ'য়ে যায় নি, ধড়ফড় করছে বলির পরে কবন্ধের মতো।

সেই দিকে চেয়ে চেয়ে একটা পৈশাচিক হ[illegible] চেয়ে।

বিশাইয়ের মুখে। তারপর তাঁবুর কাপড়ে রক্তাক্ত টাঙিটা মুছে নিয়ে বেরিয়ে গেল সে। বেরিয়ে গেল সম্ভবতঃ উল্লাসীরই খোঁজে।

ক্ষণকালের জন্যে উল্লাসীর সংজ্ঞা লুপ্ত হ'য়ে গেল যেন। চোখের সামনে কী দেখছে—আশেপাশে কী ঘটছে কোনোদিকে কোনো খেয়াল নেই। একই ভাবে তাঁবুর ছিদ্রপথে চোখ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সে। সংজ্ঞা ফিরলো নিজেরই বুকের তলা থেকে বেরিয়ে আসা একটা সশব্দ নিশ্বাসে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই অনেকগুলি লোকের সমবেত চিৎকার ধ্বনি শুনতে পেল সে।

সর্দারণীর তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়েই সব চিৎকার করছে।

কে একজন বলে উঠলোঃ ও লাশে এখন কেউ হাত দিও না—পুলিসে খবর পাঠিয়েছি। পুলিস এলে তারপর যা হয় হবে।

আর একজন বলে উঠলোঃ কিন্তু বিশাই-ছোঁড়া না পালায়—

—আরে না না—সে এখুনি পালাবে না। পুলিসে খবর দেওয়া হয়েছে সে জানতে পারে নি। উঃ, কী মিট-মিটে শয়তান! এখন বোঝা যাচ্ছে—খুন জখম করার কাজে ও একেবারে সিদ্ধ হস্ত!

—ঠিক ওর বাপের মতো। কিন্তু ওই যে খুন করেছে তার প্রমাণ কী? কেউ তো দেখেনি। তা ছাড়া খুন ক'রে মানুষ অমন নির্বিকার থাকতে পারে কি?

—সকলে না পারলেও ও পারে, ওর বাপ পারতো। এ কাজ ও ছাড়া আর কারো নয়। কী দুর্জয় সাহস!

—সে কথা বলতে! নইলে কামিনী সর্দারণীকেই—বাপরে! বলিহারী বুকের পাটা।

—কিন্তু ছোঁড়া গেল কোথায়?

দৃষ্টি ...পাড়ের দিকে গেছে। সে এখন উলিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে—

লাগলেন।

...কেও কাটবে নাকি?

—ভগবান জানেন। কিন্তু সবাই হুঁসিয়ার থাকিস। বিশের আজ খুন চেপেছে মাথায়—

পায়ের তলার মাটিটা যেন কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো—চোখের সামনে দৃশ্যমান বস্তুগুলি ঘুরপাক খেতে লাগলো—কানের মধ্যে কামিনী সর্দারণীর শেষ আর্তস্বর কামান-গর্জনের মতো বার বার প্রতিধ্বনি তুলে ফিরতে লাগলো। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না উল্লাসী, বিকৃত স্বরে একটা অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে চৈতন্য হারিয়ে পড়ে গেল সে সেইখানে।

ঘটনাটা যেন বাতাসে ভর ক'রে ছড়িয়ে পড়লো সমগ্র মেলাটার বুকে মুহূর্ত মধ্যে। ছড়িয়ে পড়লো ডাকুরাদার ওপারের গ্রাম মৌগাছিতে।

তখনও সন্ধ্যার অনেক বিলম্ব আছে।

অশোক দোতলার বড় হলঘরখানায় একাকী বসে ছিল। বসে বসে নিজের চেহারা নিরীক্ষণ করছিল সামনের দেয়ালে আঁটা প্রকাণ্ড আয়নাটার মধ্যে। ছেলেমানুষের মতো মুখ চোখের নানা ভঙ্গী ক'রে নিজেকে দেখছিল নিবিষ্টভাবে। এ্যাকটিংএর ভঙ্গীতে মাঝে মাঝে বিড় বিড় ক'রে কী যেন বলছিল। হাত দুটোও আন্দোলিত করছিল। নিজের চেহারা আরশির মধ্যে দেখতে বেশ লাগে। তাই দেখছিল আর মৃদু মৃদু হাসছিল। হঠাৎ আয়নায় ভবানীর মূর্তি প্রতিফলিত হ'ল। ওদিকের বারাণ্ডা দিয়ে তাকে উন্মত্তের মতো প্রায় দৌড়তে দৌড়তে আসতে দেখা গেল। এবং ব্যাপারটা কী ভাববার আগেই ঝড়ের বেগে ভবানী সেই ঘরে এসে ঢুকলো।

—অশোক, সর্বনাশ হয়েছে! সর্দারণী খুন হয়েছে!

—অ্যাঁ?

আচমকা কথাটা শুনেই ভীষণ চমকে উঠলো অশোক।

ঠিক বুঝতে যেন পারলে না। আশ্চর্য হ'য়ে তাকিয়ে রইলো ভবানীর দিকে।

ভবানী হাঁপাচ্ছে। তার শরীরও কাঁপছে ঠক ঠক ক'রে।

অশোক ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেঃ কে—কে খুন হয়েছে? কোন্ সর্দারণী?

—কামিনী সর্দারণী। উল্লাসীদের—

—কামিনী সর্দারণী!

বিস্ময়ে চোখ দুটো বড় বড় হ'য়ে উঠলো অশোকের। বিহ্বলের মতো তাকিয়ে রইলো সে ভবানীর মুখের দিকে। কথাটা যেন ভালো বুঝতে পারে নি এখনো সে এমনি ভাবেই তাকিয়ে রইলো।

ভবানী তখনও হাঁপাচ্ছে। কথা বলতে পারছে না।

এমনি মৌনতায় স্বল্পকাল কাটবার পর অশোক আবার জিজ্ঞাসা করলেঃ কখন খুন হয়েছে? কার কাছে খবর পেলে?

—উল্লাসীর কাছে। উল্লাসী পালিয়ে এসেছে লুকিয়ে—

—উল্লাসী! কোথায় সে?

—মালির ঘরে তাকে লুকিয়ে রেখে এসেছি। তাকেও নাকি খুন করবার জন্যে খুঁজে বেড়াচ্ছে বিশাই। উল্লাসী বললে, সে নিজের চোখে দেখেছে—বিশাই টাঙি দিয়ে কামিনীর মাথাটা ধড় থেকে নামিয়ে দিয়েছে। গোটা মেলায় হৈ হৈ পড়ে গেছে।

—চুলোয় যাক্‌গে মেলার হৈ হৈ। কিন্তু বিশাই হঠাৎ ক্ষেপলো কেন?

ভুরু দুটো কুঁচকে গেল অশোকের। দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ভবানীর মুখের দিকে তাকালে সে।

—ব্যাপারটা খুব ভালো মনে হচ্ছে না আমার ভবানী। আমার [illegible] এই খুনোখুনি উল্লাসীকে নিয়েই। বোধ হয় বিশাই সব [illegible] পেরেছে।

লাগলেন। [illegible] উপায়?

ভবানী প্রায় কেঁদে ফেললে।

গম্ভীর গলায় অশোক বললেঃ সেই উপায়ের কথাই তো ভাবছি তবে খুব সাবধান। বিপদ ভয়ংকর।

ভবানী কি একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বলা হ'ল না। হঠা জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে দৃষ্টি পড়ায় মুখের কথা মুখেই আটকে গে তার। সে দেখতে পেলে—ডাকুরবাদার থেকে তাদের বাড়ি আসবা যে সংকীর্ণ শর্টকাট মাটির রাস্তাটি আছে—হন হন ক'রে সেই রা দিয়ে বিশাই এগিয়ে আসছে তাদেরই বাড়ির দিকে।

এ পথ দিয়ে সাধারণতঃ কেউ আসা-যাওয়া করে না—একদা এট জমিদারের একান্ত নিজস্ব পথ ছিল। অবশ্য দীর্ঘকাল অব্যবহৃ থাকায় বর্তমানে পথটি নানা আগাছায় সমাচ্ছন্ন। পথটির একদিকে একটি মজা দীঘি, অন্যদিকে সুবিস্তৃত ফলের বাগান। পূর্বে এ বাগান রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে আধ ডজন মালী পুষতেন জমিদার এখন সে বাগান জঙ্গলের রূপ নিতে চলেছে। মালীরাও আর নেই তবে তাদের জীর্ণ আবাসস্থলটি আছে বাগানের প্রান্তে।

ভবানী উল্লাসীকে সেইখানেই রেখে এসেছে লুকিয়ে—

একবার শঙ্কিত চোখে অশোকের দিকে তাকিয়ে একটা ঢো গিললে ভবানী, তারপর আবার জানলার বাইরে দৃষ্টিপাত করলে।

ভবানীর ভীত অবস্থা লক্ষ্য ক'রে অশোক বললেঃ কী দেখ তুমি বাইরে?

—বিশাই—বিশাই আসছে। বোধ হয় উল্লাসীকে খুঁজতে আসছে।

—কই!

ধড়মড় ক'রে দাঁড়িয়ে ভবানীর দৃষ্টির অনুসরণ করলে অশোক।

বিশাই তখন অনেকটা কাছাকাছি এসে পড়েছে। সেই দি দৃষ্টি রেখে অশোক যেন একটু চিন্তিত ভাবেই বললেঃ বিশাইকে যে কেমন সুস্থ মনে হ'চ্ছে না দেখে। কেমন যেন শয়তানের মতো

দেখাচ্ছে। কিন্তু তোমার কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে বিপদ শুধু উল্লাসীরই নয়—আমাদেরও। বিশেষ ক'রে আবার তোমার।

—আমার? কেন?

চঞ্চল কণ্ঠে প্রশ্ন করলে ভবানী।

একটা অদ্ভুত বাঁকা হাসি ফুটে উঠলো অশোকের মুখে।

ওদিকে তখন বিশাই প্রায় বাড়ির কাছে এসে পড়েছে। তার দিকে দৃষ্টি রেখেই ভবানীর প্রশ্নের জবাব দিলে অশোক।

—কেন বুঝতে পারছো না? কামিনীকে খুন করবার উদ্দেশ্য কী বিশাইয়ের? বিশাই কোনো রকমে নিশ্চয় জানতে পেরেছে যে তোমার কাছে অনেক টাকা নিয়ে কামিনী বিক্রি ক'রে দিতে যাচ্ছে উল্লাসীকে।—উল্লাসীকে বিশাই ভয়ানক ভালবাসে। ওর ধারণা, ওর বাবা রামলাল উল্লাসীকে ওরই হাতে দিয়ে গেছে। সুতরাং—

ভবানীর বুকের ভেতরটা আতঙ্কে কেমন যেন গুটিয়ে এলো। অশোকের বক্তব্য শেষ হবার পূর্বেই সে ব্যাকুলভাবে তার একখানা হাত চেপে ধরে বলে উঠলো: কী হবে অশোক?

—তাই তো ভাবছি!

দাঁতে ঠোঁট কামড়ে অশোক বললে: বিশাই সম্বন্ধে যা শুনেছি, তাতে খুনটা ওর কাছে কিছুই নয়। তা ছাড়া প্রেমের দায়ে মানুষ সব কিছুই করতে পারে! কিন্তু কামিনীকে হত্যা করবে এটা ভাবতে পারিনি।

কুঞ্চিত ললাটে মুহূর্তকাল কি চিন্তা করলে অশোক, তারপর বললে: উল্লাসীকে আশ্রয় দিয়ে তুমি নিজের জীবন আরো বিপন্ন ক'রে তুলেছ।

—হ্যাঁ! তাহলে কি হবে?

—তাইতো ভাবছি।

দাঁতে ঠোঁট কামড়ে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ভাবলে অশোক।

ভাবনার স্বরেই বললেঃ আচ্ছা, এখান থেকে পুলিসের ফাঁড়ী কতো দূর ?

—ন' মাইল দূরে, চন্দনায়। আর এদিকে রাধানগরে থানা আছে।

—তাই তো, পুলিসে খবর পাঠানোও তো দেখছি একদিনের ফের। অথচ—

কিন্তু মেলায় তো চার জন পুলিস দু'তিন জন চৌকিদার আছে।

—আছে নাকি? তবে ঠিক আছে। তাই বোধ হয় বিশাই গা' ঢাকা দেবার জন্যে ওই বে-পথ দিয়ে আসছে। কিন্তু যাই বলে ভবানী, বিশাই রামলাল ডাকাতের ছেলে—সহজে ধরা পড়বে বলে মনে হয় না। আর উল্লাসীকেও সহজে নিষ্কৃতি দেবে না আমাদেরও না। হয় ও মরবে, নয় মারবে। অন্তত মরবার আগে মরণ কামড় দিয়ে মরবে। এ তুমি দেখে নিও।

ভবানীর মুখ আরো পাণ্ডুর হ'য়ে গেল। শঙ্কিত গলায় বললে: তাহলে—তাহলে কী হবে ?

—ভাবনার কথা বটে।

রাজ্যের গাম্ভীর্য জড়ো হ'য়ে এলো অশোকের মুখে। পেছনে হাত দিয়ে বার দুই ঘরের মধ্যে পায়চারি ক'রে একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগলো সে।

এই সময় আর একবার জানলার বাইরে দৃষ্টিক্ষেপ করলে কিন্তু বিশাইকে আর দেখতে পাওয়া গেল না।

—অশোক !

—চুপ। বাইরে যেন কার গলা শোনা যাচ্ছে না ?

উৎকর্ণ হ'য়ে শোনবার চেষ্টা করলে অশোক।

—বিশাই যদি এসে পড়ে, অশোক ?

ব্যাকুল স্বরে ভবানী বললে।

—এসে পড়ে মানে ?

একটা অদ্ভুত বিকৃত হাসি হাসতে হাসতে সিগারেটে টান দিলে অশোক। এক মুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললে: এসে পড়লো বলে। এখন তোমার কাছে দুটি পথ খোলা আছে। এক হ'চ্ছে উল্লাসীকে ছেড়ে দেওয়া। আর তা যদি না পারো, তাহলে আজই রাত্রে উল্লাসীকে নিয়ে পালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু অতি সাবধানে পালাতে হবে।

—আর তুমি?

—আমি? আমি এখন যাবো না। এক সঙ্গে দু'জনের যাওয়া চলবে না—লোকে সন্দেহ করবে। একজনকে যেতে হবে—হয় তুমি, নয় আমি। আমার চেয়ে তোমার যাওয়াটাই মনে হয় ভালো। এই অবস্থায় উল্লাসীর জীবন রক্ষা করলে তার ভালোবাসা পাওয়া তোমার সহজ হবে। আমি এখন কিছুদিন এখানে এবং কিছুদিন রাধানগরে থাকবো। থাকবো তোমারই স্বার্থের খাতিরে। কিন্তু শোনো—বিশাই আসবার আগেই তুমি কোথাও লুকিয়ে পড়ো। আমি বলবো তোমার খবর কিছু জানি না। আর এমন জায়গায় লুকোবে যেন কেউ না তোমার সন্ধান পায়—বাড়ির লোক পর্যন্ত না। রাত্রে সেইখান থেকেই সকলের অলক্ষ্যে একেবারে—

হঠাৎ বাইরে কার পায়ের শব্দ শোনা যেতেই অশোক থেমে গেল এবং চকিতে ভবানীর দিকে তাকিয়ে তাকে লুকোবার জন্যে ইঙ্গিত করলে।

প্রথমটা ভবানী কেমন থতমত খেয়ে গেল। কী করবে যেন বুঝতে পারলে না, তারপর অশোকেরই নির্দেশ মতো ঘরের ভেতর দিকের একটা দরজা দিয়ে অন্য এক ঘরে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

সিগারেটটায় উপর্যুপরি টান দিতে লাগলো অশোক ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

কিন্তু এভাবে থাকাটা ঠিক নিরাপদ নয়—লোকের সন্দেহ হ'তে পারে।

ঘরের একধারে অবস্থিত গ্রামোফোন যন্ত্রটার প্রতি দৃষ্টি পড়লো তার। তিন চার দিন হ'ল ওটা ওইখানে ওই অবস্থাতেই পড়ে আছে—ব্যবহার করা হয় নি।

ভ্রুকুটি করলে অশোক। এখন একটা গান চালালে মন্দ হয় না। লোকে ভাববে, যেন ওই কাজেই নিবিষ্ট আছে সে।

পায়ের শব্দটা ক্রমেই এগিয়ে আসছে।

আর কাল বিলম্ব না ক'রে যন্ত্রটার সামনে গিয়ে বসে পড়লো সে এবং হাতের কাছে যে রেকর্ডটা পেলে সেইটাই চড়িয়ে দিলে গ্রামোফোনে।

সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠলো যন্ত্রটা। বেজে উঠলো তারের বাজনায় এক মোহময় সুর। ঘরের আবহাওয়া যেন মুহূর্তে বদলে গেল। চক্ষু বুজিয়ে অশোক উপভোগ করতে লাগলো সেই অপরূপ সুরের মায়া।

—বাবুমশাই—

ডাকটা কানে যেতেই অশোকের বুকের ভেতরটা ছাঁৎ করে উঠলো। চিনতে পারলে অশোক ব্যক্তিটিকে! পরিচিত কণ্ঠস্বর। কিন্তু সেই সঙ্গে আশ্চর্যও বড় কম হ'ল না। বিশাই যে সটান এমন ভাবে একা ওপরে চলে আসতে পারে এটা সে ভাবতেও পারে নি।

একবার আড় চোখে তাকিয়ে দেখলে—ঘরের ঠিক দরজার ওপর এসে দাঁড়িয়েছে বিশাই। সম্ভবত তারই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ভালো করে দেখবার সাহস হ'ল না অশোকের। প্রত্যাসন্ন ঘটনার জন্যে এখনো নিজের মধ্যে তৈরি হ'য়ে উঠতে পারে নি। বিশাইয়ের আগমনের হেতুটাও এখনো পরিষ্কার হয় নি তার কাছে।

বিশাইয়ের ডাক যেন শুনতেই পায় নি সে, এমনি ভাবেই গ্রামোফোনের গানে মনোনিবেশ করলে। আগের মতো চোখ বুজিয়ে বাজনাটার সুরে সুর মিলিয়ে শিশ্ দিতে লাগলো।

—বাবুমশাই!

কিন্তু কোনো সাড়া নেই। যেন শুনতেই পায় নি অশোক এমনি ভাবে বসে রইলো।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। শুধু কলের গানের আওয়াজ।

তারপর পুনরায় আহ্বান ধ্বনিত হ'ল।

—বাবুমশাই!

আর চুপ ক'রে থাকা চলে না। রেকর্ডটাও এই সময় শেষ হ'য়ে আসায় চোখ খুলতেই হ'ল তাকে। এবং বিশাইয়ের দিকে তাকিয়ে যেন হঠাৎ ভয়ংকর রকম চমকে উঠলো। চোখ দুটো অস্বাভাবিক বড় বড় ক'রে বললে: আরে বিশাই মাস্টার যে! এমন হঠাৎ?

বিশাইয়ের মুখে উদ্বেগ চাঞ্চল্যের কোনো রেখা নেই। তার স্বভাবসিদ্ধ হাসির প্রলেপ মুখে লেগে রয়েছে! কোনো ভাবান্তর নেই।

অশোকের মুখের ওপর দৃষ্টি স্থির রেখে বললে: এই, এমনি আসা করলাম। আপুনি একলা যে? রাজাবাবু নাই?

—রাজাবাবু? না। সে তো আজ সকালে বাড়ি গেছে। তার বউয়ের ভারি অসুখ।—

হাসলে অশোক তার দিকে চেয়ে। তেমনি হাসি মুখেই বললে: তারপর তোমার খবর কী বলো? আজ কখন খেলা আরম্ভ হবে? আজ কিন্তু তোমার সেই তরোয়াল খেলাটা দেখাতে হবে—অনেক দিন হয় নি। বড় ভালো খেলা। উল্লাসীও বেশ তরোয়াল খেলে—তোমার মতো নয় অবশ্য; তাহলেও—আচ্ছা উল্লাসী তো তোমার কাছেই সব খেলা শিখেছে না? মেয়েটা কিন্তু ভারি ওস্তাদ!

একটানে অনেকগুলি কথা বলে গেল অশোক। কিন্তু যাকে বলা হ'ল তার কাছ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। অশোক লক্ষ্য করলে—উল্লাসীর নামোল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে বিশাইয়ের মুখের ভাব কেমন আস্তে আস্তে পরিবর্তিত হ'য়ে যেতে লাগলো।

ভবানী তাহলে মিথ্যে বলে নি। সত্যিই বিশাইয়ের মুখে চোখে কেমন যেন একটা শয়তানী ভাব উঁকি মারছে!

মনে মনে শঙ্কিত হ'য়ে উঠলো অশোক। তার চোখের সামনে, মাত্র কয়েক হাত ব্যবধানে একটা খুনী সদ্য খুন ক'রে এসে দাঁড়িয়ে আছে। এখনো হয়তো ওর গায়ে সর্দারণীর রক্তের গন্ধ! হয়তো রক্তের দাগও কোথাও না কোথাও ওর গায়ে লেগে আছে। এখনো হয়তো রক্তের নেশায় মাতাল হ'য়ে আছে ও। কামিনীর বুকের রক্তে রাঙানো ছুরিখানাও হয়তো ওর বস্ত্রাভ্যন্তরে লুকানো আছে—যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো মানুষের বুকে তার শান পরীক্ষা করতে পারে ও।

বিশুষ্ক অধরোষ্ঠ লেহন করতে করতে একটু হাসবার প্রয়াস করলে অশোক। একবার নিজের চার পাশে দৃষ্টিটা বুলিয়ে দেখে নিলে আত্মরক্ষার কোনো উপায় আছে কি না।

বিশাই তেমনি একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু হাসিটা তার মুখ থেকে মিলিয়ে গেছে। আর চোখ দুটো যেন কেমন ভয়াবহ হ'য়ে উঠেছে!

ক্ষণকাল মৌন থেকে নিজেকে প্রস্তুত ক'রে নিলে অশোক। তারপর আগের মতোই হাসিমুখে বললেঃ তুমি অমন চুপচাপ কেন বিশাই? ওখানেই বা দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন—ভেতরে এসে বসো। তুমি তো কোনো দিন আমাদের এখানে আসোনি—আজ হঠাৎ—নিশ্চয় কোনো দরকার আছে?

এতোক্ষণে কথা কইলে বিশাই।

—উল্লাসীকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই—

—পাওয়া যাচ্ছে না?

—না।

—তার মানে? গেল কোথায় তাহলে? নিশ্চয় মেলার মধ্যেই কোথাও আছে।

—না।

—সেকি? নিশ্চয়ই কোথাও গিয়ে থাকবে—আবার এখুনি এসে পড়বে।

—না।

—কি না?

—উল্লাসী আর আসবে না। সে পালিয়েছে।

—পালিয়েছে কি রকম?

—হ্যাঁ, পালিয়েছে। রাজাবাবুর সঙ্গে পালিয়েছে। কামিনী তাকে রাজাবাবুর কাছে বেচে দিয়েছে।

—অ্যাঁ! আরে না না। কি বলছো তুমি। রাজাবাবু তো আজ ভোর বেলায় একলাই বাড়ি চলে গেছে—আমি নিজে দেখেছি।

—তবে উল্লাসী কোথায়?

প্রশ্নটা বেশ ঝাঁজালো গলায় করলে বিশাই!

বুকটার ভেতর ধড়াস ক'রে উঠলো অশোকের। গলার মধ্যে কি যেন একটা তাল পাকাচ্ছে। দেহের ভেতরটা কাঁপছে।

আবার বিশাই তেমনি জোরের সঙ্গে প্রশ্ন করলেঃ উল্লাসী কই?

গলা দিয়ে যেন স্বর বেরুতে চাইছে না অশোকের। তবু জোর ক'রে মুখের হাসি বজায় রেখে বললেঃ কী বলছ তুমি বিশাই? উল্লাসীর খবর আমি কি ক'রে জানবো।

—হাঁ, আপুনি জানো।

হঠাৎ যেন মনে হ'ল কোমরে হাত দিয়ে কিসের সন্ধান করছে বিশাই।

বিপদ আসন্ন বুঝতে পারলে অশোক। কালান্তক যেন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আত্মরক্ষার কি উপায় অবলম্বন করবে মুহূর্তে স্থির ক'রে নিয়ে একটু কঠিন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা বিশ্রী হট্টগোল শোনা গেল। আশেপাশে কোথায়—ডাকুরবাদার দিক থেকেই যেন শব্দটা এলো।

অশোক দেখলে, বিশাই যেন একটু চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। একবার ডিঙি মেরে জানলার বাইরেটা দেখে নিয়ে জিহ্বা ও তালুর সংযোগে এক প্রকার বিচিত্র শব্দ ক'রে কতকটা আপন মনেই বললে: শালারা আমায় পুলিসে ধরা করাবে। রামলালের ব্যাটাকে ধরা অতো সোজা নয়। হুঁ!

হঠাৎ অশোকের দিকে তাকিয়ে বললে: আপুনি যাই বলো বাবু, উলী রাজাবাবুর সঙ্গে ভেগেছে। আমি রাজাবাবুর বাড়ি যাবো। উলীকে বার করবোই।

কথা শেষের সঙ্গে সঙ্গেই যেন ম্যাজিকের মতো অদৃশ্য হ'য়ে গেল বিশাই—স্তম্ভিত অশোকের দৃষ্টির সামনে থেকে।

অশোক সেইদিকে চেয়ে চুপ ক'রে বসে রইলো। কতোক্ষণ রইলো কে জানে।

সহসা এক সময় ভবানী আর উল্লাসীর কথা মনে পড়তে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো সে। এবং তাদের সন্ধানে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো।

কিন্তু কোথায় তারা তখন? হয়তো তখন অলক্ষ্যে বসে মহাকাল তাদের জীবন-নাট্যের নতুন দৃশ্য রচনায় মনোনিবেশ করেছেন।

অশোক তাদের পাবে কোথায়?···

॥ সাত ॥

একটা কী যেন ঘটে গেল অকস্মাৎ।

অবস্থাটাকে পরিপাক করতেই বেশ কিছু সময় লাগলো অশোকের। এমনটা ভাবতেই পারেনি সে। কামিনী সর্দারণীর অপঘাত সত্যিই, কী কল্পনা করা যায়? এমন আচম্বিত ঘটনার স্রোত যে উল্লাসীকে এনে একেবারে ভবানীর কামনার কমল-কাননে তুলে দেবে একথা কে ভেবেছিল? হাজার হাজার টাকা মূল্য দিয়েও যাকে পাওয়া সম্ভব হবে কী হবে না, এই যেখানে চিন্তার বস্তু ছিল—অবশেষে সেই স্বেচ্ছায় এসে ধরা দিলে!

ধরা দিলে অবশ্য প্রাণের দায়েই। তবুও ব্যাপারটা অচিন্তনীয়। কিন্তু তার চাইতেও ভবানীর অন্তর্ধানটা যেন আরো অদ্ভুত। আরো আশ্চর্যের।

এই স্বল্প সময়ের মধ্যে, সকলের অলক্ষ্যে, এমন কি অশোকের সাহায্য ব্যতিরেকে কেমন ক'রে যে ভবানী উল্লাসী সহ উধাও হ'ল সেইটাই কোনোক্রমে যেন অশোক বুঝতে পারছিল না। দীর্ঘদিন ঘনিস্ট ভাবে মেলামেশা ক'রে এতাবৎ ভবানীর চরিত্রের যেটুকু পরিচয় পেয়েছে অশোক তাতে তার মধ্যে সাহস বলে কোনো বস্তুর সন্ধান পায়নি। দুনিয়ার সর্বপ্রকার পাপের প্রতি তার একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ লক্ষ্য করেছে সে, কিন্তু তার মধ্যে কোথাও সাহসের নামগন্ধ দেখেনি। অত্যন্ত ভীরু প্রকৃতির মানুষ ভবানী। ভবানীর এই ভীরুতার সুযোগ নিয়েই অশোক আজ পর্যন্ত নিজের স্বার্থসিদ্ধির নানা প্রয়াস ক'রে এসেছে। সেই ভবানীকে আজ হঠাৎ এমন দুঃসাহসের পরিচয় দিতে দেখে সে আশ্চর্য হ'য়ে গেল। এবং নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও একটু চিন্তান্বিত হ'য়ে পড়লো।

উল্লাসীকে নিয়ে একটা বড় রকমের বাণিজ্য চালাবার কল্পনা মনে মনে গড়ে তুলেছিল সে। ভেবেছিল, নির্বোধ ভবানীর স্কন্ধে ভর ক'রে উল্লাসী সহ ডাকুরবাদার উল্লঙ্ঘন করবে সে। তারপর কোলকাতায় গিয়ে কিছুদিন ভবানীকে দোহন করবে এবং সেই অবকাশে উল্লাসী মেয়েটাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নেবে। কোনো রকমে চলন সই অভিনয় করতে পারলেই, ব্যস্। তাকে সিনেমা থিয়েটারে ভাড়া খাটিয়ে—

কিন্তু এ যে সব ওলোট পালট হ'য়ে গেল। শেষে ভবানীই বাদ সাধলে তার সাধে।

কেমন যেন একটু ঈর্ষার ভাব জেগে উঠলো অশোকের মনে। অনেক মেয়ের সংস্পর্শেই এসেছে অশোক—জীবনে অনেক মেয়েই দেখেছে সে, ভালোবাসার অভিনয়ও করতে হয়েছে তাকে অনেক মেয়ের সঙ্গে। কিন্তু ভালো কি কাউকে বাসতে পেরেছে সে? কোনো মেয়ে কি আকর্ষণ করতে পেরেছে তার চিত্তকে। তার প্রতি কোনো মেয়ের অবহেলা কোনোদিন কি ঈর্ষান্বিত ক'রে তুলেছিল তাকে?

—না; কেউ না। কেউ তা পারেনি। কোনোদিনই কোনো মেয়ের জন্যে অন্তরে ঈর্ষা অনুভব করেনি সে। এটা কেবল আজই এই প্রথম অনুভব করলে। অনুভব করলে উল্লাসী মেয়েটা আকস্মিক হাতছাড়া হ'য়ে যাওয়ায়।···

সেদিন সারা রাত একাকী ঘরের মধ্যে পায়চারি ক'রে বেড়িয়েছে অশোক। পায়চারি করেছে আর এই সব কথা ভেবেছে। ভেবেছে আর আশ্চর্য হ'য়ে গেছে।

তাকে না জানিয়ে, তার সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে ভবানী এই ভাবে উল্লাসীকে নিয়ে চম্পট দেবে—এটা যেন কোনো মতেই বিশ্বাস করতে চাইছে না তার মন। আজ পর্যন্ত বহু মেয়ের সঙ্গেই

যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছে সে ভবানীর। ভবানীর কামনার শ্মশান-চুল্লিতে কতো নারীকে ছলনায় প্রলুব্ধ ক'রে নিক্ষেপ করেছে সে। ভ্রুকুটি কুটিল চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে তাদের নারীত্বের নির্মম নিষ্ঠুর অপমান! দেখেছে তাদের নারীত্ব সেই শ্মশানাগ্নিতে জ্বলে পুড়ে ছাই হ'য়ে ছড়িয়ে পড়েছে বাতাসে। নিঃশেষ হ'য়ে গেছে তারা। তাদের মমত্ব, তাদের স্নেহ প্রীতি, তাদের ভালোবাসা সে আগুনে দগ্ধ হ'য়ে গেছে। লালসা কামনা আর ক্ষুধা সার ক'রে নতুন দৃষ্টিতে তারা পৃথিবী নিরীক্ষণ করতে শিখেছে। তারা আস্তে আস্তে তাদের মনকে সাপের মতো হিংস্র খল ক'রে তুলেছে। দংশন ক'রে ক'রে পৃথিবীর মাটিকে বিষাক্ত ক'রে তুলেছে।

তারা সুলোচনা চন্দনার দল!

ভবানীর কিন্তু তাদের চিত্তের স্পর্শ পায়নি—দেহটাকে ক্রয় করেছিল। তাই লেন-দেনের কারবার মিটে যাবার পরেই তারা গজভুক্ত কপিত্থের মতো ভবানীকে পরিত্যাগ ক'রে চলে গেছে।

তা যাক্! কিন্তু অশোকের যতো দূর মনে পড়ে, আজ পর্যন্ত নিজের কামনা পরিতৃপ্তির বাসনায় কোনো নারীর কাছে নিজে এগিয়ে যেতে পারেনি ভবানী। এ ব্যাপারে অশোকের সাহচর্য তার একান্ত প্রয়োজন হয়েছে।

আর আজ এ কী হ'ল!

ভবানী যে তাকে এমন বোকা বানিয়ে চলে যাবে এটা বাস্তবিকই তার কল্পনার অতীত। আরো বিস্মিত হ'ল, পরদিন সকালে যখন শুনলে যে করালীর তহবিল খোয়া গেছে। তহবিলে হাজার চারেক টাকা ছিল এবং করালী সে-টাকা অতি যত্নে লোহার সিন্দুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। টাকাটা এ অঞ্চলের প্রজাবৃন্দের কাছে এবং ডাকুরবাদার-সাময়িক প্রজাদের কাছে আদায় করা টাকা।

করালী বলছে, কাল সন্ধ্যায়ও টাকাটা যথাস্থানে ছিল সে শপথ

ক'রে বলতে পারে। শুধু তাই নয়; সে এমন কথাও বলছে যে, ইতিপূর্বে কয়েকবার ভবানী নাকি তার কাছে ওই থেকে কিছু টাকা চেয়েওছিল এবং না পাওয়ায় তার ওপর রীতিমত বিরক্তও হয়েছিল।

করালীর দৃঢ় বিশ্বাস এ কাজ ভবানী ছাড়া আর কেউ করেনি। কারণ একমাত্র ভবানীই জানতো সিন্দুকের চাবি কোথায় থাকে।

সমস্ত শুনে অশোক যেন তাজ্জব ব'নে গেল। ভবানীর চরিত্রের এ দিকটার সঙ্গে অশোকের পরিচয় ছিল না।

ব্যাপারটায় অশোক রীতিমত বিচলিতই হ'য়ে পড়েছিল।

জমিদার মহেশ্বর ঘোষালের মৃত্যু-সংবাদ বহন ক'রে যে লোকটা রাধানগর থেকে এলো, সমুদয় বৃত্তান্ত শুনে সে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। কিছুক্ষণ সাশ্চর্যে করালীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সহসা সে একটা নিশ্বাস পরিত্যাগ ক'রে ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করলে এবং কার উদ্দেশে যুক্ত কর ললাটে স্পর্শ করলে।

করালী তা দেখে জিজ্ঞাসা করলেঃ ওটা কি হ'ল খুড়ো? কাকে গড় করলে?

—কর্তামশাইকে। তিনি অন্তর্যামী ছিলেন। শুনতে পাই তিনি নাকি মরবার দিনও বলে গেছেন যে ছোটবাবুর মন্দ বুদ্ধি কোনোকালে বদলাবে না। কয়লার কয়লাত্ব যতোক্ষণ থাকবে তার বরণও কালোই থাকবে।

একটু থেমে খুড়ো বললেঃ কিন্তুন্ আমি এখন গিন্নীমাকে যেয়ে কী বলবো তাই বলো?

—যা শুনলে তাই বলবে। এ তো আর মিছে কথা কিছু নয়—

—তা নাই হোক মিছে কথা। আমি মরে গেলেও ওকথা গিন্নীমাকে এখন কিছুতেই বলতে পারবো না। না—ওরে বাবা—এ

অবস্থায়—আমায় কেটে ফেললেও বলতে পারবো না। তার চেয়ে তুমি চলো—

—আমি!

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ! তুমি। চলো—

—তা, হাঁ—মানে এ অবস্থায় তো যেতেই হবে—নিশ্চয় যেতে হবে। কিন্তু এখুনি যাই কেমন ক'রে? আদায় পত্তর যে এখনো অনেক বাকী—তার ওপর মেলায় একটা পুলিসী হাঙ্গামা চলেছে! শুনলে তো সবই!—কী ক'রে যাই বলো দিকি? তবে হাঁ—যাবো। পরশু তরশুর মধ্যে একটা যা হোক বন্দোবস্ত ক'রে যাবো।

অশোক নিকটেই দাঁড়িয়ে ছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের কথোপকথন শুনছিল! এইবার করালীর কথা শেষ হতেই সে বললেঃ আচ্ছা আমি কেন এই সঙ্গে চলে যাই না। এখানে আমার তো কোনো কাজ নেই এখন।

চোখ দুটো বড় বড় ক'রে তার দিকে তাকিয়ে করালী বললেঃ সর্বনাশ! তাহলেই আমি গেছি একেবারে। চারদিকের এই হাঙ্গামা—আপনি গেলে আমি একা সামলাবো কী ক'রে! এইতেই ভয়ে আমার পেটের ভেতর হাত পা' সেঁদিয়ে যাচ্ছে! আপনি গেলে পুলিসের উৎপাত ঠেকাবে কে?

একটা ঢোক গিলে সে বলতে লাগলোঃ আমার এই ছত্রিশ বছরের চাকরীর জীবনে মশাই, এমন ফ্যাসাদে কখনো পড়িনি। নাটক নভেলে খুন-খারাপী, রাহাজানির অনেক কথা পড়েছি বটে, তবে চাক্ষুস কখনো দেখিনি মশাই। এই প্রথম খুন কাকে বলে দেখলুম।

হঠাৎ দৃশ্যটা কল্পনা ক'রে শিউরে উঠলো সে।

—বাপরে! খুন বলে খুন!—অতো বড় লাশখানা একেবারে পৈতে কাটা।

অগত্যা বার্তাবহ একাকীই প্রস্থান করলে।

করালী নিজেও গেল না। অশোককেও যেতে দিলে না।

ব্যাপারটায় করালী সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিল। অশোকও নির্ভয় ছিল না, নিশ্চিন্তও ছিল না। এই কদিন সে শুধু এই কথাই ভেবেছে যে, বিশাই এখনো ধরা পড়েনি এবং যে কোন মুহূর্তে তার আবির্ভাব ঘটতে পারে। আর তার আবির্ভাবও পুলকের ব্যাপার হবে না নিশ্চিত। আরো চিন্তিত ক'রে তুলেছে তাকে ভবানীর অভাবনীয় অন্তর্ধান।

কিন্তু এখন ভাবনা হ'ল শুধু অতঃপর সে কী করবে? এখানে এই ভাবে আবদ্ধ হ'য়ে থাকার কোনো মানে হয় না আর। এর চেয়ে কোলকাতায় গিয়ে ভবানী ও উল্লাসীর সন্ধান করাই সমীচীন। তাতে আর কিছু না হোক, এখানকার গণ্ডগোল থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে।

কিন্তু নিষ্কৃতি লাভের অবসর ঘটলো না তার।

সেদিন—বেলা তখন দশটা এগারোটা হবে। দোতলার একখানা ঘরে বসে এই সব পাঁচ কথা চিন্তা করতে করতে আপন মনে সিগারেট টানছিল সে, হঠাৎ একটি অতি পরিচিত গম্ভীর কণ্ঠের আহ্বানে চমকে উঠলো। এবং ত্রস্তে হাতের সিগারেটটা এক দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চোখ তুলে তাকাতেই একেবারে গৌরীশংকরের চোখোচোখি হ'য়ে গেল।

—গৌরীদা।

গৌরী যে এই অবস্থায় এইভাবে এখানে আসতে পারে এটা সে একবারও ভাবেনি।

গৌরীকে—কি জানি কেন, বরাবরই সে রীতিমত সমীহ ক'রে চলে। গৌরীর চারিত্রিক উদার্যই হয়তো এর কারণ।

ক্ষণকাল তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে গৌরী সনিশ্বাসে বললেঃ করালীর কাছে সব শুনলুম। কিন্তু বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না যেন। এতোখানি উচ্ছন্ন গেছে সে—

অশোক মাথা নিচু ক'রে আস্তে আস্তে বললেঃ যা শুনেছো তুমি সবই সত্যি গৌরীদা'।

কুঞ্চিত ললাটে গৌরী অধর দংশন করতে লাগলো। তারপর উত্তরীওর মধ্য থেকে একটা কম্বলের আসন বার ক'রে ঘরের মেঝেয় পেতে বসে পড়লো।

—ব্যাপারটা কী সব খুলে বল্ দিকি! আমি যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না। অবিশ্যি জানি আগাগোড়াই তার স্বভাবটা বদ্। কিন্তু এতোটা যে বদ্ তা কোনদিন ভাবতে পারিনি।

একবার থেমে সবিশ্বাসে গৌরী বললেঃ আমার এতো আশা, এতো কল্পনা—সব নস্ট ক'রে দিলে! এতো হিতোপদেশ দিলুম তার কোনো দাম দিলে না! অথচ ওই ভাইয়ের জন্যে বাপ-মার কাছে পর্যন্ত—

কথাটা অসমাপ্ত রেখেই সে আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করলে।

ভবানীর প্রতি গৌরীর ভালোবাসা যে কতো গভীর তা জানে অশোক। জানে এমন ভাই—এমন দাদা অনেক তপস্যায় পেয়েছে ভবানী। কিন্তু এই দাদার ভালোবাসার মর্যাদা সে দিতে পারলে না।

হায়রে, অশোকের যদি এমনি একটা দাদা থাকতো।

অশোক কি একটা বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে গৌরী বলে উঠলোঃ এখন মাকে গিয়ে আমি কী বলবো বল্! এই অবস্থায় এ-কথা শুনলে কী মা আর বাঁচবে?—ছি ছি, এ কী কাণ্ড করলে শেষে ভবানী!

চোখ দুটো ছল ছল ক'রে এলো তার। একটু মৌন থেকে বললেঃ আর তোকেও বলি, তুই সঙ্গে থেকেও তাকে সামলাতে পারলিনে!···

সেইদিনই অশোককে সঙ্গে নিয়ে গৌরী রাধানগরে ফিরলো।

অশোকের রাধানগরে আসার মোটেই ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু গৌরী কিছুতেই ছাড়লে না।

করালীর প্রতি আদেশ হ'ল, মৌগাছির একটা যা হোক বন্দোবস্ত করে দু'একদিনের মধ্যেই সে যেন রাধানগরে যায়। কর্ম বাড়িতে তার থাকা একান্ত আবশ্যক।

॥ আট ॥

যে কোনো অবস্থায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার একটা অসাধারণ ক্ষমতা ছিল অশোকের।

অশোক সুঅভিনেতা। মাঝে মাঝে নিজের অভিনয়ে নিজেই বিস্মিত হ'য়ে পড়ে সে। কালকের নিজেকে আজকের জীবনে যেন খুঁজেই পায় না। সবসময়েই যেন অভিনয়ের অন্তরালে আপনাকে সংগুপ্ত রেখে পৃথিবীর নাটমঞ্চে ঘুরে বেড়ায় সে। এই তার অভ্যাস। মানুষের অন্তররাজ্যে কেমন ক'রে আসন বিস্তার করতে হয় এবং মুগ্ধপ্রীতি আহরণ করতে হয় সে-কৌশল তার ভালোই জানা আছে।

বসুমতী দেবী কোনোদিনই অশোকের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না। সন্দেহ করতেন তিনি অশোককে। ভাবতেন—ভবানীর অধঃপাতে যাবার মূলে অশোক। অশোকই তাকে মন্দ বুদ্ধি যোগায় এবং ভবানীর এবারের অপকর্মের জন্যেও তিনি অশোককেই দায়ী করতে দ্বিধা করেননি।

এবাড়িতে ইতিপূর্বেও বহুবার অশোক এসেছে। কিন্তু বসুমতী তার আগমনে প্রতিবারই বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। তার সান্নিধ্য এড়িয়ে চলবার জন্যে বধূদের সাবধান ক'রে দিয়েছেন। নিজেও তাকে পরিহার ক'রে চলেছেন। অবশ্য স্পষ্ট ভাষায় এ বাড়িতে

আসতে নিষেধ করেননি তাকে কখনো। নিষেধ করেননি এই ভেবে যে, পাছে তাতে গৌরী অসন্তুষ্ট হয়।

গৌরীর মাসতুতো ভাই সে। তাকে ভালোওবাসে গৌরী।

মৌগাছি থেকে যখন গৌরী সেই অশোককেই সঙ্গে ক'রে ফিরলো এবং ভবানীর বৃত্তান্ত সব বসুমতীর গোচর করলে, তখন ভুরু কোঁচকালেন বসুমতী। সারা মুখে তাঁর নিদারুণ বিরক্তি পরিস্ফুট হ'য়ে উঠলো। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা—অশোকই তাঁর পুত্রকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিয়ে নিজে সাধুতার ভান করছে। অশোকের অজানিতে এবং সাহায্য ব্যতিরেকে ভবানী কখোনই এমন কাজ করতে সাহস করতো না।

অশোক বসুমতী দেবীর মনের কথা অনুমান ক'রে মনে মনে হাসলে। সেই সঙ্গে বিস্ময় বোধও করলে কিছুটা।

আজ পর্যন্ত তাকে এ সব ব্যাপারে সন্দেহ বড় একটা কেউ করেনি। সে যাই কিছু অপকর্ম করেছে, মানুষের সন্দেহের উর্ধ্বে থেকেই করেছে। এবং মানুষের সন্দেহ ভঞ্জন করার শিক্ষাও তার আছে। এক্ষেত্রেও সেই শিক্ষা প্রয়োগ করলে সে।

অচিরাৎ সুফলও প্রসব করলে তার শিক্ষা। এতোটা আবার আশা করেনি সে।

ছেলেবেলা থেকে এ-বাড়িতে গতায়াত তার। দরিদ্র আত্মীয় সন্তান বলে গৃহকর্তা স্নেহ করতেন তাকে—অনুগ্রহ করতেন। অনেকবার সাহায্য করার চেষ্টাও করেছেন কিন্তু অশোক সে সাহায্য গ্রহণ করেনি।

সরাসরি সাহায্য নিতে আত্মসম্মানে বাধে অশোকের, অথচ বুদ্ধি প্রয়োগ ক'রে, দাবী প্রতিষ্ঠা ক'রে আদায় করতে ভালোবাসে সে।

প্রকৃতিটাই প্রকৃত অদ্ভুত তার।

বসুমতী দেবী তার আগমনে প্রথমটা খুবই বিরক্ত হয়েছিলেন,

কিন্তু দিন দুইয়ের মধ্যে সে বিরক্তি তাঁর কোথায় অন্তর্হিত হ'য়ে গেল। আশ্চর্য হ'য়ে গেলেন তিনি তার অপূর্ব সুন্দর ব্যবহারে। তার অসাধারণ কর্মক্ষমতায়। তাকে এতাবৎ সন্দেহের চোখে দেখে এসেছেন বলে নিজেই লজ্জিত হলেন।

এতো বড় কর্মবাড়ির এতো আয়োজন—এতো সমারোহ কেমন ক'রে নিষ্পন্ন হবে এই চিন্তা ভিতরে ভিতরে ব্যাকুল ক'রে তুলেছিল বসুমতীকে। অথচ এর প্রয়োজন আছে—জমিদারের সম্মান রক্ষার জন্যেই এর প্রয়োজন।

জমিদার মহেশ্বর ঘোষাল কতো বড় বড় কাজ কতো অবলীলা-ক্রমে ক'রে গেছেন—কোনোদিন কোনো কাজে এতোটুকু ত্রুটি দেখা যায়নি। আর আজ তাঁরই কাজে যদি কোথাও ত্রুটি প্রকাশ পায় তো অত্যন্ত লজ্জার কথা। প্রজা ও পরিজনদের পরিতোষ সহকারে খাওয়াতে ভালোবাসতেন তিনি।

বসুমতী দেবী ও গৌরীশংকর তাই পরামর্শ ক'রে তাঁর স্বর্গত আত্মার পরিতৃপ্তির জন্যে বিরাট ভোজের আয়োজন করেছিলেন—আয়োজন করেছিলেন দানসাগরের।

কিন্তু আয়োজন করার পর শঙ্কিত হ'য়ে পড়েছিলেন তাঁরা এই ভেবে যে কী ক'রে সব দিক সামলাবেন।

এমন কি জমিদার-সেরেস্তার প্রধান প্রধান কর্মচারীরা পর্যন্ত ভীত হ'য়ে পড়েছিলেন। গৌরীকে ডেকে এতো বাড়াবাড়ি না করার জন্যে বলেছিলেন। বলেছিলেন: কেমন ক'রে কী হবে কিছুই বুঝতে পারছি না। এতো বিরাট ব্যাপার সামলাবে কে?

—কেন?

সবিস্ময়ে গৌরী বলেছিল: আপনারা এতো লোক রয়েছেন। বাবার সঙ্গে কতো বড় বড় কাজ আপনারা করেছেন, আর আজ সামলাবার ভাবনা ভাবছেন কেন? আমি তো আপনাদের

ভরসাতেই এ কাজে নেমেছি। তা ছাড়া বাবার কাজ একটু আড়ম্বরের সঙ্গে না হলেই বা চলবে কেন ?

—সে তো ঠিক কথা। তবে কি না আড়ম্বরটা বড্ড হ'চ্ছে—এতোটা আবার—

দেওয়ান ত্রিলোচন বলেছিলেন ঃ আর কি জানো বাবাজী, কর্তা বর্তমানে যে সমস্ত কাজকর্ম হয়েছে—খুব জাঁকজমকের কাজই হয়েছে বটে, তবে সে তাঁরই কর্মক্ষমতায় সম্ভব হয়েছে। আমরা ছিলুম কেবল তাঁর আদেশ পালন করতে। দায়িত্ব কিছু ছিল না। তুমি ছেলেমানুষ, কখনো কোনো কাজকর্ম করোনি নিজের হাতে, তাই ভয় হয়। তোমার অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে—সব মানুষ তো আর সমান নয়—কে কোথায় কি ক'রে বসবে—বুঝলে না বাবাজী ! মাঠাকরুণের ওপরও কিছু ভরসা করা যাচ্ছে না—তাঁর এই শোকের ওপর শোক ! নইলে চিন্তার কোনো কারণ থাকতো না। অবিশ্যি কর্তার পুণ্যে তাঁর কাজ আটকাবে না মানি, তবুও কেমন যেন ভরসা পাচ্ছি না।

কিন্তু কর্তার পুণ্যে সত্যিই আটকালো না কিছু।

অশোক এ বাড়িতে পদার্পণ করেই গৌরীকে বললেঃ এ যে এলাহী কাণ্ড ক'রে বসেছ গো গৌরীদা'। শ্রাদ্ধ কবে ?

—পরশু ঘাট কামানো ! এ কদিন তোকে এখানে থাকতে হবে অশোক।

—তা তো হবেই। কিন্তু শুধুই থাকতে হবে ? কোনো কাজকর্মের ভার দেবে না ? এই ধরো ভাঁড়ার-টাঁড়ার—ব্রাহ্মণ বিদেয়-টিদেয় করার ভার—কি অন্য কিছু ! অনেক রকমের কাজই তো আছে ?

—তা আছে। তবে সে সব ভারটার দেবার মালিক তো আমি নই ভাই—মাথার ওপর মা আছেন। তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞেস করি চলো।

বসুমতী একে চটেই ছিলেন অশোকের ওপর তায় আবার এই প্রস্তাবে আরো চটে গেলেন। জীবনে একটি অতিথি সৎকারের অভিজ্ঞতাও যার নেই—সে এত বড় ব্যাপারে ভাঁড়ারের ভার চায়! ব্রাহ্মণ বিদায়ের ভার চায়! স্পর্ধাও তো কম নয়!

কিন্তু মুখে তিনি কোনো কথা বললেন না। মনের বিরক্তি মনে চেপে ম্লান একটু হাসলেন শুধু।

স্বল্পক্ষণ পরে কি ভেবে বললেন ঃ তা বেশ তো। অনেক কিছুই তো করবার রয়েছে, যেটা ভালো লাগে করুক না ও।

মনে মনে একটু অবজ্ঞার হাসি হেসেছিলেন তিনি। গোপনে গৌরীকে ডেকে বলে দিয়েছিলেন, সব কাজেই ওর ওপর একটু লক্ষ্য রাখা হয় যেন। ও ছেলে ভালো নয়! ওর জন্যে শেষে লোকজনের কাছে অপদস্ত না হ'তে হয়।

কিন্তু ভুলেও ভাবতে পারেননি বসুমতী দেবী যে, ওর দ্বারা অপদস্থ না হ'য়ে অপদস্থের লজ্জা থেকে রেহাই পাবেন। সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন তিনি অশোকের অমানুষিক পরিশ্রম—কাজকর্মের তদ্বির—অতিথি সজ্জনের পরিচর্যা—ব্রাহ্মণ বিদায়ের সুচারু বিধি-ব্যবস্থা—পবিত্র নারায়ণ সেবার তত্ত্বাবধান।

একটা মানুষ যেন একশত হ'য়ে সমস্ত কাজকর্ম ক'রে বেড়াচ্ছে। বেড়াচ্ছে শুধু নয়—হাসিমুখে বেড়াচ্ছে। এতোটুকু ক্লান্তি নেই, এতোটুকু অবসাদ নেই, এতোটুকু বিরক্তি নেই। সকলেরই মুখে অশোকের নাম—অশোকের প্রশংসা। যেদিকে অশোক নেই, সেইদিকেই কর্মে একটা না একটা বিঘ্ন।

দেওয়ান নায়েব থেকে আরম্ভ ক'রে বাড়ির দাসী চাকর পর্যন্ত পঞ্চমুখে অশোকের কথা বলছে। বলছে ঃ উনি না থাকলে এতো বড় কাজ কেউ সামলাতে পারতো না। আর কী মিষ্টি ব্যবহার। এতো খাটছেন খুটছেন একটু বেজার নেই গা!

—সত্যি ধন্যি মানুষ।

—একাই যেন একশো।

—হবে না। ও যে বড়বাবুর মাসতুতো ভাই গো।

—আহা, আমাদের ছোটবাবু যদি এমনটি হ'তো; তবে কি সুখেরই না হ'তো।

—চুপ। ছোটবাবুর কথা তুলিসনি। এখুনি মা'র কানে গেলে কুরুক্ষেত্তর করবে।

—আমরা দাসী চাকর। কিন্তু আমাদের সঙ্গেও অশোকবাবুর ব্যাভ্‌হার কেমন বল্‌ দিকি?

—সত্যি এমন দেখা যায় না।

এমনি কতো কথা, কতো আলোচনা, কতো প্রশংসা অশোকের। সকলের মুখেই শুধু অশোক আর অশোক।

আশ্চর্য হ'য়ে গেছেন বসুমতী দেবী অশোকের কর্মক্ষমতা দেখে। আরো আশ্চর্য হয়েছেন তার অতি অদ্ভুত ব্যবহারে। এতো অল্প সময়ের মধ্যে একটা লোক যে এতো আপনার হ'য়ে যেতে পারে, এ ধারণা তাঁর ছিল না। চুম্বকের মতো যেন তাঁর বুকের স্নেহ ভালোবাসা টেনে নিয়েছে অশোক মাত্র এই দুটো দিনের মধ্যেই।

বুঝি জাদু জানে অশোক!

স্বামীর বিয়োগ-বেদনা—পুত্রের মর্মান্তিক আচরণ, অনাগত দিনের দুশ্চিন্তা, সব কিছুই যেন ভুলিয়ে দিয়েছে অশোক। কথায় বার্তায়, হাসিতে গানেতে গোটা বাড়িটাকে মধুময় ক'রে তুলেছে সে। এ গৃহের সমস্ত শোক দুঃখ ব্যথা বেদনা কোথায় যেন অন্তর্হিত হ'য়ে গেছে তার আনন্দের বিপুল জোয়ারে।

বাড়ির প্রত্যেকটি লোককে একান্ত আপনার ক'রে নিয়েছে অশোক।

এতোকাল আসা-যাওয়া করছে অশোক এখানে, কিন্তু তার প্রকৃতির এই মধুর পরিচয় ইতিপূর্বে কেউ পায় নি। বসুমতী দেবী তো পানই নি। পাননি কারণ, তিনি কোনো দিন তাকে ঘনিষ্ঠ

হবার সুযোগ দেননি। অহেতুক ঘৃণায় এতদিন উপেক্ষাই প্রদর্শ করেছেন তিনি এবং ধারণা ক'রে এসেছেন তাঁর পুত্র ভবানী অধঃপাত যাত্রার পথে সে-ই পথপ্রদর্শক। আজ তাঁর সে ধারণা বদলে গেল। যে ছেলের স্বভাব এতো মিষ্টি সে কোনো মন্দ কাজ করতে পারে না। ছেলেটার প্রতি এতোকাল তিনি অত্যন্ত অবিচার ক'রে এসেছেন—একটা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে। আসলে তাঁর ভবানী মন্দ, ভবানীই দূষিত চরিত্র।

গৌরীর স্ত্রী নির্মলা এবং অনুরাধা এই ক'দিনের মধ্যেই অত্যন্ত অনুরক্ত হ'য়ে পড়েছে অশোকের। অবসর পেলেই তাদের হাসি তামাসা গল্পগুজব চলে। অনেক মনের কথাও হয়। স্বামীর সম্বন্ধে অনুরাধা অনেক গোপন অনুরোধও জানিয়েছে তাকে। বলেছে তিনি আমার প্রতি যেমন খুশী ব্যবহার করুন আমার কোনো আপত্তি নেই—কেবল আমাকে তাঁর কাছে থাকতে দিন। আমার যা কিছু আছে আমি সর্বস্ব তাঁকে দিয়ে দেবো—কেবল আমায় কাছে থাকতে দিন।

অশোক পরিহাস ক'রে বলেছে : তোমাকে তার পছন্দ হয় না বউদি। তুমি না পারো নাচতে, না জানো গান। আর অভিনয় তো করতে পারবেই না।

—কেন পারবো না। শিখিয়ে নিলে নিশ্চয় পারবো। অনেকের চেয়ে ভালোই পারবো। আর গান! বাবার আমি এক মেয়ে— আমাকে শেখাতে কিছু কসুর করেননি তিনি। বাড়িতে ওস্তাদ রেখে গান শিখিয়েছেন।

—বলো কী বউদি!

সবিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে বলে ওঠে অশোক : তুমি গান জানো? ওস্তাদ রেখে গান শিখেছ? কই এ তো আগে শুনিনি।

সলজ্জ-হাস্যে মাথা নিচু ক'রে, আঁচলের খুঁটটা আঙুলে জড়াতে

জড়াতে অনুরাধা বলেছিল ঃ ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে গিয়ে অনেক আসরে গান গেয়ে এসেছি। কতো প্রাইজ পেয়েছিলুম !

—আরে বাস্! না, আমি ছাড়ছি না! আজ তোমার গান আমার শুনতেই হবে।

—ধ্যেৎ! এখানে কখনো গান গাওয়া যায়!

—খুব যায়। কেন যাবে না শুনি ?

—এটা যে শ্বশুরবাড়ি! মা তাহলে আমায় ড্যাং ক'রে কেটে ফেলে দেবেন। এ বাড়িতে বউ-ঝির ওসব গান বাজনা কেউ পছন্দ করে না।

একবার অশোকের মুখে দৃষ্টিটা তুলে আবার নত ক'রে নিয়ে বলেছিল ঃ গান করতে আমার ভারী ভালো লাগে। আজ কাল কতো নতুন নতুন গান বেরুচ্ছে—এতো শিখতে ইচ্ছে করে। আমায় দু' চারটে আধুনিক গান শিখিয়ে দেবে ঠাকুরপো ? কিন্তু ভাই লুকিয়ে —কেউ যেন না জানতে পারে।

—আচ্ছা।

একটু কেমন অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিল অশোক। হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসেছিল ঃ তুমি বুঝি ক্ল্যাসিক গান শিখতে ? কার কাছে শিখেছিলে ?

আরো লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল অনুরাধা। তেমনি মাথা নিচু ক'রে সলজ্জে উত্তর দিয়েছিল ঃ বাবার এক মক্কেলের কাছে। রসিদ মিঞা। রসিদ মিঞার নাম শোনো নি ?

—শুনেছি।

—তবে মিঞা সাহেবের কাছে বেশিদিন শিখি নি। বছর খানেক। তারপর সেবার আমার ঠাকুরমার সঙ্গে কাশীতে গিয়ে প্রায় আড়াই বছর তিন বছর ছিলাম। তখন কাশীর এক প্রসিদ্ধ ওস্তাদ আমায় গান শেখাতেন। তাঁর নাম পণ্ডিত বামদেব মিশ্র।

—বামদেব মিশ্র ?

তড়িতাহতের মতো চমকে উঠে তার দিকে তাকিয়েছিল অশোক।

গুরুর নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অনুরাধা যুক্তকর ললাটে স্পর্শ ক'রে বলেছিলঃ হ্যাঁ, বামদেব মিশ্র। তুমি চেনো নাকি তাঁকে?

সবিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিল অনুরাধা।

অশোক সনিশ্বাসে উত্তর দিয়েছিলঃ শুধু চিনি নয়—রীতিমত চিনি। তিনি আমারো গুরু।

—তাই নাকি!

পুলকের আতিশয্যে বালিকার মতো হাততালি দিয়ে বলে উঠেছিল অনুরাধাঃ বারে মজা! তাহলে তুমি আমার গুরুভাই বলো? কিন্তু যাই বলো ঠাকুরপো, অমন গুরু পাওয়া অনেক ভাগ্যের কথা। কেমন তাই নয়?

—তা ঠিক! ভবানীর সঙ্গেও গুরুজীর পরিচয় আছে।

—থাকাই স্বাভাবিক! কেন না তিনি যখন তোমার গুরুজী তখন তাঁর সঙ্গে পরিচয় না থাকলেই আশ্চর্য হতুম।...

এরপর আরো অনেক আলাপ-আলোচনা চলে তাদের।

ক্রমেই যেন অন্তরঙ্গতা বেড়ে চলতে লাগলো।

এমনি ক'রেই দেখতে দেখতে দুটি মাস অতীত হ'য়ে গেল। অশোকেরও এখান থেকে যাবার তাড়া নেই—এরাও কেউ তাকে ছাড়তে চায় না। বিশেষ ক'রে আবার বসুমতী দেবীর আগ্রহই বেশি যেন তাকে আটকে রাখবার। একদিন তিনি যেমন উপেক্ষা করেছেন অশোককে আজ আবার তেমনি তাকে একান্ত আপন ক'রে বুকের কাছে টেনে নিতে চাইছেন।

ভবানীর শূন্যস্থান বুঝি এরি দ্বারা পূর্ণ ক'রে নিতে চান তিনি।

কিন্তু আর কতোদিন এখানে থাকা সম্ভব? একঘেয়ে জীবন কোনো কালেই পছন্দ করে না অশোক।

সেদিন হঠাৎ তাই কোলকাতায় ফেরার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো সে। কদিন ধরেই একটা ভাবনা কেবল তার মনের মধ্যে পাক খাচ্ছে—ভবানীটা উল্লাসীকে নিয়ে কোথায় কি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে? এতো দিনের মধ্যে তাদের কোনো খোঁজ খবর পাওয়া যায় নি। উল্লাসী এখনো ভবানীর হেপাজতেই আছে? না অন্য কোনো আস্তানা কেড়েছে?

তা ছাড়া, একটা নতুন সিনেমা কোম্পানি একখানা বই তাকে দিয়ে তোলাবে বলেছিল। কিছু টাকার অভাব ছিল তাদের—এতোদিনে হয়তো সে টাকা যোগাড় হ'য়ে গেছে। একবার খবর নেওয়া দরকার।

সিনেমার বই পরিচালনা করার একটা অদম্য নেশা আছে তার। অবশ্য সিনেমার চেয়ে থিয়েটারটাই পছন্দ করে সে বেশি।

কি রকম বই তারা নির্বাচন করবে কে জানে! বেদে টেদের জীবন নিয়ে কোনো বই হ'লে, উল্লাসীকে দিয়ে অভিনয় করিয়ে একটা চমক দেওয়া যেতে পারতো!

বসুমতী দেবী তার বিদায় নেবার ইচ্ছা জানতে পেরে সনিশ্বাসে বললেন: অনেকদিন হ'য়ে গেল আর তো তোমায় আটকে রাখতে পারি না বাবা। তবে মাঝে মাঝে এসে মাসিমার খোঁজ খবর নিয়ে যেও। আর যদি ভবানীর সঙ্গে—

কথাটা অসমাপ্ত রেখেই তিনি নীরব হলেন।

অশোক জিজ্ঞাসা করলে: যদি দেখা হয় কিছু বলবো তাকে?

—হ্যাঁ বলবে। বলবে রাধানগরের মাটি যেন সে জীবনে না মাড়ায়। এখানের কানা কড়িতেও তার কোনো অধিকার নেই। সে আমাদের ত্যাজ্যপুত্র।

চেষ্টা সত্ত্বেও বসুমতী তাঁর কণ্ঠস্বর পরিষ্কার রাখতে পারলেন না। শেষের দিকে কেমন ভারী হ'য়ে এলো।

অনুরাধা ইতিমধ্যে দিন আষ্টেকের জন্যে পিতার অসুখের সংবাদ পেয়ে পিত্রালয়ে গিয়েছিল, মাত্র গত কাল ফিরেছে। এবং ফিরেই অশোক চলে যাচ্ছে শুনে তাকে গোপনে ডেকে চুপি চুপি বললেঃ ঠাকুরপো, আমার একটা অনুরোধ রাখবে বলো।

—কী? ভবানীর খবর জেনে তোমায় জানাতে হবে এই তো?

বিষণ্ণ হাসি হেসে অনুরাধা বললেঃ তোমার অনুমান মিথ্যে নয়। তবে—

পুনরায় একটু হেসে থেমে গেল সে।

অশোক ভুরু কুঁচকে তার মুখের দিকে তাকালে।

ক্ষণপরে সে আবার বললেঃ কাউকে বলতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু তুমি তো 'সে-কাউ'র দলে নও। তা ছাড়া তোমায় বললে কোনো দোষ হবে না এবং তুমি প্রকাশও করবে না। তুমি তাঁরও বন্ধু, আমারও বন্ধু—বন্ধুর কাছে কিছু গোপন করতে নেই।

—ব্যাপারটা কী একটু পরিষ্কার ক'রে বলো দিকি!

—বলছি। আমি বাপের বাড়ি গেছলুম শুধু বাবার অসুখ বলে নয়।

—তবে?

—তিনি আমাকে ঐখানে দেখা করার জন্যে চিঠি দিয়েছিলেন।

—চিঠি দিয়েছিলেন! কে? ভবানী?

—হ্যাঁ।

লজ্জিত ভাবে মাথাটা নিচু ক'রে নিলে অনুরাধা।

অশোক স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। ক্ষণকাল সাশ্চর্যে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেঃ হুঁ। তারপর? দেখা হ'ল?

—হ'ল।

—কী ভাবে দেখা করলে? তোমার বাবা জানতে পারেন নি?

—না। তিনি অনেক রাত্তিরে লুকিয়ে এসেছিলেন। তখন কেউ জেগে ছিল না।

—বটে! কিন্তু দেখা করার উদ্দেশ্যটা কী? নিশ্চয় পত্নী প্রেমের আতিশয্যে ব্যাকুল হ'য়ে ছুটে আসেন নি তিনি। গূঢ় কোনো অভিসন্ধি ছিল। কেমন তাই নয়?

অনুরাধা নিরুত্তরে মাটির দিকে তাকিয়ে রইলো।

অশোক এক নজর তার দিকে তাকিয়ে বললেঃ বুঝেছি। কিন্তু আস্কারা দিয়ে কাজটা ভালো করলে না। কতো টাকা দিলে?

চমকে উঠলো অনুরাধা।

—কী ক'রে জানলে?

বিচিত্র হাসি হেসে অশোক বললেঃ ও সব জানতে আমাদের দেরি হয় না। যাক্ ভালোই করেছ। এখন মাঝে মাঝে অমনি উৎপাত সহ্য করো। হাজার হ'লেও স্বামীর চেয়ে বড় গুরু কেউ নেই। স্বামীর অসৎ কাজে অর্থ সাহায্য করলে পরকালের কাজ হবে। আর স্বামী দেবতাও নির্বিবাদে দুষ্কর্ম সাধন ক'রে যেতে পারবেন তাহলে। কিন্তু আমার কথা কিছু জিজ্ঞেস করে নি সে?

—করেছে।

অনুরাধা একবার পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তার পানে তাকিয়েই আবার দৃষ্টি নত করে নিলে। মুখে একটি ক্ষীণ বিষণ্ণ হাসির রেখা।

অনুরাধার বেদনা কোথায় জানে তা অশোক। জানে স্বামীকে সে কতোটা ভালবাসে। আরো জানে সেই স্বামীর কাছে তার সেই শ্রদ্ধা ভালবাসার বিনিময়ে কি পেয়ে আসছে সে। নিজেকেও কেমন যেন অপরাধী মনে হয় অশোকের এই সাধ্বীর সান্নিধ্যানে। কুণ্ঠায় মনটা যেন পাকিয়ে যায় বুকের ভেতরে। ভবানী—এই সাধ্বীর স্বামী ভবানীর বন্ধু সে। শুধু বন্ধু নয়—তার সর্বপ্রকার দুষ্কর্মের সহায়ক।

হয়তো তার সব কথা অনুরাধা জানে। হয়তো তাকে সন্দেহ করে।

কিন্তু আশ্চর্য ভবানীর সাহস। শেষ পর্যন্ত সে কিনা অনুরাধার কাছে—। নাঃ, মানুষ চিনতে এখনো অনেক বাকী অশোকের। অনুরাধার আচরণটাও লক্ষ্য করবার মতো। কেমন নীরবে সে স্বামীকে অর্থ সাহায্য ক'রে এলো! কোনো প্রশ্ন নেই, কোনো জিজ্ঞাসা নেই। কিন্তু অশোকের কথা কী বলে গেল ভবানী?

একটু কেমন ভয়ে ভয়ে সে জিজ্ঞাসা করলেঃ আমার কথা কি বলেছে সে?

—বলেছে, তোমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে। আর তোমার হাতে আরো কিছু টাকা দিয়ে দিতে।

—আমার হাতে!

শিউরে উঠলো যেন অশোক কথাটা শুনে। বোবা চোখে মুহূর্তকাল অনুরাধার দিকে চেয়ে থেকে বললেঃ আমি তোমার কাছ থেকে তার খেয়ালের টাকা বয়ে নিয়ে যাবো! আমায় কেটে ফেললেও আমার দ্বারা তা হবে না। বউদি, আমিও সাধুপুরুষ নই। সংসারের যতো কিছু জঘন্য নোংরা কাজ আছে সবই প্রায় আমি করেছি, কিন্তু একাজ আমি পারবো না।

একবার থেমে আবার বললেঃ সংসারে প্রকৃত স্নেহ ভালোবাসা কী বস্তু আমি জানতুম না। আজ জেনেছি। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আমার চিরদিনের ধারণা আজ বদলে গেছে। আজ বুঝেছি এরা কেবল মানুষকে নরকের ঠিকানাই বলে দেয় না—স্বর্গের আশ্বাসও দেয়।

সহসা কেমন হাসি পেল অনুরাধার। হেসে ফেলে বললেঃ তুমি এ নতুন তত্ত্ব কোথায় আবিষ্কার করলে ঠাকুরপো?

—তোমার কাছে। তুমি আমার সত্যিকারের বন্ধু! তুমি আমার গুরু।

খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো অনুরাধা।

তারপর হাসি থামতে বললে ঃ তাহলে গুরুদক্ষিণা দাও।

—দক্ষিণা ? না। বাহ্যিক দক্ষিণা দিয়ে আমি আমার গুরুকে ছোট করবো না। আমার গুরুর জন্যে আমার জীবন দক্ষিণা রইলো। যখন যে কাজে প্রয়োজন হবে আমাকে স্মরণ কোরো বউদি। প্রাণ দিয়ে তোমার সে কাজ করবার চেষ্টা করবো।

—ইশ ! বড্ড যে ভক্তি ! এতোটা আবার থাকলে হয় গো।

—আচ্ছা বেশ থাকে কি না দেখো।

বলেই একটু হেসে ফেলে অশোক বললে ঃ বয়েসে অনেক ছোট তুমি তাই লজ্জা করে, নইলে মাইরি বলছি, ইচ্ছে করছে তোমার একটু পায়ের ধুলো নিয়ে যাই মাথায় ক'রে। যা রক্ষাকবচের মতো সকল আপদ বিপদে আমায় রক্ষা করবে। আমায় সত্য পথ দেখাবে।

একটু গম্ভীর হ'য়ে অনুরাধা বললে ঃ এটা ঠিক শিষ্যের যোগ্য কথা হ'ল না। বয়েসে ছোট হ'লেও মান্যে আমি বড়। সুতরাং—

অশোক হাসতে হাসতে বললে ঃ হ'ও বড়, কিন্তু তোমার পায়ের ধুলো আমি নিতে পারবো না—ইচ্ছে করলেও না। তার চেয়ে, এইখান থেকেই নমস্কার ক'রে বিদায় হচ্ছি।

বলেই দুটি হাত জোড় ক'রে একবার কপালে ঠেকালে অশোক। তারপর আস্তে আস্তে চলে গেল অনুরাধার দৃষ্টির সীমানা থেকে। আর পিছন ফিরে তাকালে না, আর দেখলে না যে অনুরাধা কী করছে। তার বিদায়ে অনুরাধা প্রকৃতই দুঃখিত কিনা তাও জানার প্রয়োজন বোধ করলে না সে।

তার স্বভাবই এমনি। যখন যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন ক'রেই চলে যায়

॥ নয় ॥

কয়েকটি বছর অতীত হয়েছে তারপর। ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে পৃথিবীর। পরিবর্তন হয়েছে পৃথিবীর অধিবাসীদের। রাধানগরের পূর্বশ্রী আর নেই। অনেকেই গাঁ-ঘর পরিত্যাগ ক'রে শহরে চলে গেছে। গাঁয়ের প্রান্তে একটা প্রকাণ্ড কাপড়ের কল বসেছে। দিবারাত্রি তার চারপাশে কোলাহল—গ্রামের শান্তি ব্যাহত করছে।

জমিদার বাড়ির বারো মাসে তেরো পার্বন আর হয় না। জমিদার বাড়ি শ্রীহীন হ'য়ে পড়েছে।

বসুমতী দেবী আজ দীর্ঘদিন যাবৎ কাশীবাস করছেন। সংসারে আর কোনো আকর্ষণ নেই তাঁর।

গৌরীশংকর এখন গ্রামের জমিদার। সে বাড়িতেই থাকে। কিন্তু তার মনে যেন এতটুকু শান্তি নেই। সংসারের ওপর তার নিদারুণ বীতরাগ উপস্থিত হ'য়েছে। হ'য়েছে আজ প্রায় বছর-খানেক থেকে। কতকটা বৈরাগ্য তার মনে বাসা বেঁধেছে বলা যেতে পারে।

গৌরীর তিনটি সন্তান। একটি কন্যা এবং দুইটি পুত্র। কন্যাটি সর্ব কনিষ্ঠ: মাত্র বছর দেড়েক তার বয়স।

পরকালের চিন্তাটা এই অকালে যেন কোথা থেকে এসে গৌরীর স্কন্ধে ভর করেছে আজকাল। সাধন ভজন প্রভৃতি নিয়েই দিনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করে সে। মাঝে মাঝে আবার কাশীতে মায়ের কাছে গিয়েও কিছুদিন কাটিয়ে আসে।

সেরেস্তার পুরাতন কর্মচারীরা বলাবলি ক'রে, গৌরী ওর পিতার মতোই ধার্মিক হ'য়ে উঠেছে। পুরাতন কর্মচারীদের মধ্যে দেওয়ান

ত্রিলোচন ইতিমধ্যে পৃথিবীর মায়া কাটিয়েছেন। আরো কেউ কেউ তাঁর অনুগামী হয়েছেন।

কিন্তু ভবানীশংকর সেই থেকে আর রাধানগরে পদার্পণ করে নি।

অনুরাধাও আজ প্রায় বছর দুই পিত্রালয়েই বাস করছে। মাঝে মাঝে দু'একদিনের জন্যে এখানে আসে, আবার চলে যায় —থাকে না।

কেন থাকবে? কী আকর্ষণ আছে এখানে? আবশ্যকই বা কী? স্বামী থাকতেও সে স্বামীহারা।

বাস্তবিক কি দুঃখময় জীবন তার। সাহারার মতো ধূ ধূ করছে যেন তার জীবনটা।

এখানে সে দু'এক দিনের বেশি থাকতে পারে না। কেমন যেন অসহ্য হ'য়ে ওঠে। তাই আসে আর চলে যায়।

তার সম্পত্তি দেখাশুনা করেন তার পিতা। অবশ্য অনুরাধার অনিচ্ছাতেই। অনুরাধা চায় না যে তার পিতৃকুলের কেউ তার পারিবারিক এবং বৈষয়িক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে। ভাসুর গৌরীর ওপরই এ-ভার সে দিতে চেয়েছিল কিন্তু গৌরী রাজী হয় নি। অবশেষে গৌরীরই পরামর্শে তার পিতার প্রতি এই ভার অর্পণ করা হয়।

পিতা বিচক্ষণ ব্যক্তি, তার ওপর আইন ব্যবসায়ী—বিষয় সম্পত্তি কেমন ক'রে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয় জানেন। কাজেই অনুরাধা এবিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। কেবল একটি চিন্তা অনুক্ষণ তার চিত্তকে নিদারুণ পীড়িত ব্যথিত ক'রে রাখে—তার সকল শান্তির পথ বেদনার নিশ্বাসে নিশ্বাসে ভারাক্রান্ত ক'রে রাখে।

সে চিন্তা ভবানীর চিন্তা। অনুরাধা ভাবে, যে স্ত্রী, স্বামীর মনোরঞ্জন করতে পারে না—পথভ্রষ্ট স্বামীকে পথের নির্দেশ দিতে পারে না, সে সহধর্মিণী-জাতির কলঙ্ক। তার নারীত্বে ধিক, তার পত্নীত্বে ধিক।

এই সময়ের মধ্যে মাত্র বার পাঁচেক ভবানীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল অনুরাধার। অবশ্য দেখা হয়েছিল গোপনেই এবং ভবানীরই প্রয়োজনে। আর সে প্রয়োজন, অর্থের প্রয়োজন।

আশাতীত সুব্যবহার পেয়ে গেছে ভবানী অনুরাধার কাছে। দ্বিরুক্তি না ক'রে অনুরাধা তার চাহিদা পূরণ করেছে। শুধু প্রতিবারই কুণ্ঠিত অনুরোধ জানিয়েছে তাকে—মাঝে মাঝে দর্শন দেবার জন্যে এবং তার প্রতি বিমুখ না হবার জন্যে। বিনিময়ে সে তার সর্বস্ব তাকে দিয়ে দেবে। ত্রিজগতে একমাত্র ভবানীর একটু স্নেহ প্রেম ব্যতীত আর তার কোনো কাম্য নেই।

ভবানী প্রতি বারই তার কথা নিশ্চয়ই পালন করবে স্বীকার করেছে কিন্তু পরে আর সে সত্য পালন করে নি।

ভবানীর সঙ্গে শেষ দেখা হয় অনুরাধার প্রায় চার বৎসর পূর্বে। তারপর আর দেখা হয় নি। তবে ভবানীর সংবাদ সে ঠিক পায়। সংবাদ বিতরণ করে অশোক।

অশোক তার প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হয় নি। প্রায়ই সে অনুরাধার খবরাখবর নেয়। মাঝে মাঝে এসে দেখাও ক'রে যায় অবসর মতো। রাধানগরেও তার গমনাগমন স্থগিত হয় নি—সময় পেলেই গৌরীর সঙ্গে দেখা ক'রে আসে। এমন কি বার কয়েক কাশীতে গিয়ে বসুমতীর সঙ্গেও দেখা ক'রে এসেছে। কিন্তু গৌরীর সাক্ষাতে কিংবা বসুমতীর সাক্ষাতে সযত্নে সে ভবানীর প্রসঙ্গ পরিহার করে চলে। তাঁরাও যেন ইচ্ছা ক'রেই ভবানীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন না আর।

এমনি করেই এদিকের দিনগুলো কেটে যাচ্ছে একে একে। সুখে দুঃখে, হাসি কান্নায় মিশে এদিকের দিন কারো অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকছে না। আর ওদিকে—

পাঁচ বছর এমন আর কি বেশি সময় !

কিন্তু এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই উল্লাসী—সার্কাসওয়ালী উল্লাসী তার নতুনতর অভিনেত্রী জীবনে যে সাফল্য অর্জন করেছে—একজন সাধারণ অভিনেত্রী সারা জীবনের সাধনায় তা পায় কি না সন্দেহ। এতখানি প্রতিভা যে মেয়েটার মধ্যে আত্মগোপন করেছিল তা সত্যিই ভাবা যায় নি। ভবানী তো কল্পনাও করতে পারে নি।

তা ছাড়া আশ্চর্য মেধা মেয়েটার! বুদ্ধিও তেমনি প্রখর। সেদিনের সেই সার্কাসওয়ালী উল্লাসীর সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। চেহারায়, চাল চলনে—কথায় বার্তায়—কোথাও এতটুকু মিল নেই। এ যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি মেয়ে। এ যেন সারাজীবন শহরের আবহাওয়ায় শহরের শিক্ষা দিক্ষায় মানুষ হয়েছে। মানুষ হয়েছে যেন কোনো সুমার্জিত সুশিক্ষিত পরিবারের মধ্যে—তাদেরই মেয়ের মতো। সামাজিক আচার ব্যবহার রীতি নীতি সমস্তই কিছুই যেন আজন্ম সংস্কারের মতো শিক্ষা ক'রে নিয়েছে সে।

উল্লাসী এখন নতুন মানুষ। নতুন নামে এখন সে শহরের জনসাধারণের কাছে সুপরিচিত। সুবিখ্যাত অভিনেত্রী মালবিকা দেবীর নাম জানে না এমন নরনারী শহরের আধুনিক সমাজে বিরল। শুধু জানা নয়, অনেক যুবকের জপমালা ওই নাম।

তার মালবিকা নামকরণ করেছে অশোক। তার আজকের এই দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠার মূলেও অশোক। কিন্তু এরজন্যে সে নিজে যে সাধনা করেছে তারও তুলনা নেই।

মঞ্চ এবং চিত্রজগতে মালবিকার আবির্ভাব ধূমকেতুর মতোই।

কোলকাতায় আসার প্রায় দু' বছর পরে উল্লাসী মালবিকা নাম ধারণ ক'রে, ভবানী প্রতিষ্ঠিত বাণীশ্রী রঙ্গালয়ে প্রথম একটি ভক্তিমূলক নাটকে এক দেবদাসীর ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ ক'রে।

উঃ! সে কী দুশ্চিন্তা আর আশঙ্কার দিন গেছে উল্লাসীর!

কিন্তু সেই প্রথম অভিনয়ের প্রথম রাত্রিতেই অসামান্য সাফল্য অর্জন ক'রে অভিনেত্রী সমাজে চাঞ্চল্য এনে দিলে সে। আর সেই সঙ্গে দর্শকদের মনে গভীর রেখাপাত করলে।

এক রাত্রেই মালবিকার খ্যাতি সারা শহরে ছড়িয়ে পড়লো। দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার। সুদর্শনা অভিনেত্রী মালবিকা দেবীর নাম বড় বড় হরপে লেখা আছে তাতে।

খবরের কাগজের পাতায় সুহাসিনী মালবিকার লাস্য লীলায়িত ছবি। মুখে মুখে মালবিকার নাম। চায়ের দোকানে মালবিকা—ট্রামে বাসে মালবিকা—সর্বত্রই মালবিকার নাম!

অশোক অবাক্ হ'য়ে চেয়ে থাকে মালবিকার দিকে। অবাক্ হ'য়ে ভাবে—ডাকুরবাদার শিবমেলার কথা!

এই তো সেদিন! এখনো চোখের সামনে জ্বল্ জ্বল্ করছে সেদিনের ছবি। একটা কিম্ভূত-কিমাকার সাজ-পোশাক ক'রে এই মেয়েটা কামিনী সর্দারণীর সার্কাসে মাচায় দাঁড়িয়ে চিৎকার ক'রে লোক ডাকতোঃ আসুন বাবু, দেখে যান—বাঘের খেলা, সাপের খেলা—।

বাস্তবিক অদ্ভুত পরিবর্তন হ'ল মেয়েটার! এতোটা অশোক আশা করতে পারেনি কিন্তু। আশা করাও যায় না।

তবে অশোক উল্লাসীর ব্যাপারে বেশ গর্ব বোধ করে। সেই তো তৈরি করলে এমন একটা অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেত্রী। তারই তো হাতে গড়া শিষ্যা।

কম পরিশ্রম ব্যয় করেছে সে এই মেয়েটার জন্যে। অবশ্য ভবানীর সহায়তা এবং অর্থব্যয় না থাকলে উল্লাসী মালবিকা হ'তেও পারতো না আজ। অশোকও শিষ্যা তৈরির আত্মপ্রসাদের অর্ধাংশ পেতো না।

এই বাণীশ্রী রঙ্গালয়টি প্রতিষ্ঠা করতে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা গোড়ায় ঢালতে হয়েছে ভবানীকে। আর সে টাকা যে ভবানী

কী ক'রে সংগ্রহ করেছে তা ভবানীই জানে। অনেক মিথ্যা এজন্যে ভবানীকে বলতে হয়েছে অনুরাধার কাছে গিয়ে।

কতো ছলনা, কতো প্রেমের অভিনয়, কতো মিথ্যা প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে এই অর্থ অনুরাধার কাছে গোপনে সংগ্রহ করেছে ভবানী!

আজ সে সব কথা মনে পড়লেও হাসি পায় তার। স্বামীর আনুগত্যের ছলনায় ভুলে সরলা অনুরাধা সানন্দে হাজার হাজার টাকা তুলে দিয়েছে স্বামীর হাতে। আর স্বামী তার সেই অর্থে আপন খেয়াল চরিতার্থ করেছে।

ভবানী অনুরাধাকে আশ্বাস দিয়েছিল, তার থিয়েটারটা ভালো ভাবে চালু হলেই অনুরাধাকে কোলকাতায় নিজের কাছে নিয়ে যাবে সে।

অনুরাধাও স্বামীর সে আশ্বাসে বিশ্বাস করেছিল। স্বামী তার গান বাজনা ভালোবাসে বলে—স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্যে পুনরায় সংগীত সাধনায় মনোনিবেশ করেছিল।

কিন্তু সে যাই হোক! অনুরাধার কাছে শেষ দশ হাজার টাকা নিয়ে যাবার পরে আর দর্শন মেলেনি ভাবানীর। মেলেনি, কারণ অনুরাধার টাকায় আর তার প্রয়োজন হয়নি। তার প্রয়োজন মিটিয়ে দিয়েছে বাণীশ্রী রঙ্গালয়। তার প্রয়োজন মিটিয়ে দিয়েছে উল্লাসী আর অশোক।

অর্থের কোনো অভাব এখন আর নেই ভবানীর। সুতরাং অনুরাধার কথাও এখন মনে নেই আর। মনে নেই কোনো প্রতিশ্রুতির কথা।

প্রচুর অর্থের মালিক এখন ভবানী। এখন তার একাদশে বৃহস্পতি! একের পর এক নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে তার রঙ্গপীঠে আর অর্জন করছে অসামান্য সাফল্য। অর্জন করছে বিপুল অর্থ। এত অর্থ থিয়েটারে লাভ হ'তে পারে এ ধারণা তার পূর্বে ছিল না।

তাঁর এই অভাবনীয় অর্থাগম এবং সৌভাগ্য দেখে অন্যান্য থিয়েটার-ওলারা ঈর্ষান্বিত হ'য়ে পড়েছে।

তা'ছাড়া ভবানীর থিয়েটার শহরের সমস্ত থিয়েটারকে কানা ক'রে দিয়েছে।

ভবানীর এই সাফল্যের মূলে যে অশোকের নাট্য-পরিচালনা এবং চারুদর্শনা মালবিকার অপূর্ব অভিনয়-নৈপুণ্য একথা অপরাপর থিয়েটারওলাদের জানতে বাকী নেই। শুধু থিয়েটারওলারা কেন—শহরের আবালবৃদ্ধবনিতা জানে। তাই সম্প্রতি অন্যান্য থিয়েটার থেকে কেবলই প্রলুব্ধ আহ্বান আসছে অশোকের—আহ্বান আসছে মালবিকার।

ভবানী গোড়ার দিকে থিয়েটারটাকে দাঁড় করবার জন্যে বহু আয়াস করেছে, অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু যেদিন থেকে থিয়েটার চালু হয়েছে এবং একের পর এক নাটক মঞ্চ জগতে সাফল্যের ইতিহাস রচনা ক'রে চলেছে, প্রচুর অর্থাগম হ'তে আরম্ভ হয়েছে—সেইদিন থেকে ভবানী মহোৎসাহে বোতল আর নারী চর্চায় মনোনিবেশ করেছে।

মনোনিবেশ করেছে মালবিকার রূপে পৃথিবী বিস্মৃত হ'য়ে অবগাহন করতে। সেই সঙ্গে থিয়েটারের অন্যান্য মেয়েদের রূপ-যৌবন যাচাই করতেও ভোলেনি সে। থিয়েটার-মহলে তার নাম হয়েছে কলির সিরাজদ্দৌলা।

অন্য কোনোদিকে দৃষ্টি নেই তার। দৃষ্টি কেবল মালবিকার ওপর। সকল সময় তার আশঙ্কা—বুঝি বা কোন্ মুহূর্তে মালবিকা হাত ছাড়া হ'য়ে যায়। সে বেশ বুঝতে পারে মালবিকার মনের কথা। বুঝতে পারে যে অর্থের খাতিরে মালবিকা তার সঙ্গে প্রণয়াভিনয় করলেও অন্তরের সঙ্গে অশোককেই ভালোবাসে।

অশোককেও আজকাল বিশ্বাস করা চলে না। তার হাবভাবও কেমন যেন সন্দেহজনক হ'য়ে উঠছে ক্রমেই। পূর্বে নারী-বিদ্বেষী

ছিল সে, এখন যেন নারাদের প্রতি একটা বিশেষ দুর্বলতা প্রায় সময়ই প্রকাশ পায় তার মধ্যে। মালবিকার ওপর একটা আধিপত্য বিস্তার করতে সব সময়েই সচেষ্ট সে মনে হয়। যেন মালবিকা তারই সম্পত্তি।

এটা আজ বছর খানেক থেকে যেন আরো প্রকট হ'য়ে উঠেছে।

অবশ্য ওঠার কারণও আছে—বর্তমানে ভবানী প্রায় উত্থানশক্তি হীন। অবিরাম অত্যাচারে, অপরিমিত মদ্যপানে এবং অসম্ভব নারীসঙ্গদোষে তার দেহে নানা ব্যাধি আশ্রয় লাভ ক'রে ক্রমেই পরিপুষ্টি লাভ করছে।

ডাক্তার দেখে অভিমত প্রকাশ করেছেন—এই ভাবে আর সামান্য দিন চালালে রোগ রুগী দুই নিরাময় হ'তে পারবে। তথাপি ভবানীর চেতনা নেই।

রঙ্গালয়ের পাশেই একটি সুসজ্জিত মাঝারি গোছের বাড়িতে ভবানী থাকে মালবিকাকে নিয়ে। স্বামী স্ত্রীর মতোই থাকে। রঙ্গ-জগতে মালবিকাকে ভবানী আপন বিবাহিতা স্ত্রী বলেই পরিচয় দিয়ে থাকে। মালবিকারও তাতে তেমন আপত্তি দেখা যায় না। প্রতিবাদও করে না। মাঝে মাঝে ভবানীর ব্যবহারটা অবশ্যই অসহ্য হয়ে ওঠে তার, কিন্তু অশোকের নির্দেশমতো চুপ করেই থাকতে হয় তাকে।

অশোক সেখান থেকে কিছু দূরে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া ক'রে বাস করে।

কিছুদিন থেকে অশোকের সঙ্গে ভবানীর রীতিমত অন্তর দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। দুজনের কেউই কাউকে যেন সহ্য করতে পারছে না। ভবানীর মতে অশোক আজ যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে এ শুধু তার প্রতিষ্ঠিত থিয়েটারের কল্যাণে এবং তারই প্রযোজিত ছায়াচিত্রের দৌলতে।

আর অশোক বলে—ভবানীর থিয়েটার তারই অভিনয় চাতুর্যে এবং পরিচালনায় আজ দাঁড়াতে পেরেছে, নইলে কোথায় তলিয়ে যেত তার হিসেব নেই। সুতরাং তার কাছে ভবানীর কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আজ যদি সে ভবানীর থিয়েটার ছেড়ে দিয়ে চলে যায় তাহলে কাল আর এর অস্তিত্ব থাকবে না। ভবানীর ওই 'লাট্‌লবাবী' ঘুচে যাবে।

ইতিমধ্যে বার কয়েক বেশ বচসাও হ'য়ে গেছে তাদের। চলেও যেতে গিয়েছিল অশোক, কিন্তু যেতে পারেনি শুধু মালবিকার জন্যে। মালবিকা তার হাতে পায়ে ধরে তাকে নিবৃত্ত করেছে।

ইদানীং অশোকের মনে কেমন একটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। কেমন যেন একটা নিরানন্দ ভাব। তাছাড়া আরো আশ্চর্য ব্যাপার, যে অশোক এই সেদিন পর্যন্ত নারীবিদ্বেষী ছিল, মেয়েদের সম্বন্ধে অত্যন্ত কুৎসিত মনোভাব পোষণ করতো, আজকাল সেই অশোকই একেবারে বদলে গেছে। মেয়েদের আজকাল সে খাতির করে, সম্মান দেখায়। এমন কি নটীদের সম্বন্ধেও সে উচ্চ ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছে। বলেঃ মন আর দেহ এক জিনিস নয়। দুটোকে এক ভেবে এতো কাল ভুল করেছি।

অশোকের এই মানসিক পরিবর্তনের কোনো হেতু খুঁজে পায় না ভবানী। অনেক চেষ্টা করেও কিছু জানতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত নিজের মন এবং চরিত্র অনুযায়ী একটা হেতু স্থির ক'রে নিয়ে তাকে ঈর্ষা করতে শুরু করেছে। এবং মালবিকাকে সব সময়েই অশোকের কাছ থেকে দূরে রাখবার চেষ্টা করে।

উভয়ের এই বিদ্বেষটা ক্রমেই যেন চরমে উঠছে।

অশোকের গতিবিধির ওপরও আজকাল নজর রাখতে শুরু করেছে ভবানী। অশোকের কোনো প্রশংসা সে সইতে পারে না। শুনলেই ক্ষেপে যায় যেন। বিশেষ করে মালবিকার মুখে অশোকের নাম যেন তার কানে গরম সীসে ঢেলে দেয়।

অশোকের যে নানা রঙ্গমঞ্চ থেকে আজকাল আহ্বান আসছে সে কথা ভবানী বিশ্বাস করে না। সে বলেঃ ওসব ধাপ্পা! আমাকে ভড়্‌কি দেওয়া হচ্ছে! সবাই আমার মতো পাগল নয় যে, রাশি রাশি টাকা দিয়ে অশোকের মতো একটা লোক পুষবে থিয়েটারে।

সেদিন মালবিকার সঙ্গে ওই ব্যাপার নিয়েই আলোচনা চলছিল। মালবিকা একটা কি বই নাড়াচাড়া করতে করতে বললেঃ অশোকবাবু ছেড়ে গেলে কিন্তু তোমার থিয়েটারের ভয়ংকর ক্ষতি হবে।

—ছাই হবে।

ভবানী উত্তেজিত ভাবে বললেঃ ওর পেছনে যে পয়সা আমি ব্যয় করি তাতে ওর চেয়ে ঢের ভালো লোক পেতে পারবো।

মালবিকার মুখে একটা বাঁকা হাসি ফুটে উঠলো।

সেদিকে লক্ষ্য না করেই ভবানী বলে চললোঃ আর তা ছাড়া ও যাবেই বা কোথা? কোথাও পাত্তা পাবে না।

—কিন্তু আমি জানি বোম্বেতে উনি খুব ভাল চান্স্‌ পাচ্ছেন। একটা ছবি ডাইরেক্ট করবার জন্যে বোম্বের গোল্ডেন ফিল্ম কোম্পানি প্রচুর টাকা অফার ক'রে ডাকিডাকি করছে অশোকবাবুকে—

—মিছে কথা। তোমাকে ধাপ্পা দিয়েছে। ওর কি এমন কেপাসিটি আছে যে বোম্বেতে গিয়ে ছবি ডাইরেক্ট করবে? ছবি ডাইরেক্‌সনের ও জানে কী?

এবার স্পষ্টই হেসে ফেললে মালবিকা।

মিনিট খানেক তার মুখের ওপর চোখ দুটি রেখে হাসবার পর বললেঃ তা মন্দ বলোনি। যাকে দেখতে পারি না তার চলন বাঁকা। দেশশুদ্ধ লোক যার মঞ্চ এবং চিত্র পরিচালনার অজস্র সুখ্যাতি করছে, আর তুমি বলছো সে কিছু জানে না।

তেমনি বিরক্তি সহকারেই ভবানী বললেঃ সুখ্যাতি ওই সামনেই করে—পেছনে গাল পাড়ে। ওর ভাগ্যটা খুব ভালো তাই

আমার মতো একজন প্রেডিউসার পেয়েছিল—যা বুঝিয়েছে তাই বুঝেছি—

—তা না হয় বুঝেছ, কিন্তু তোমায় ভুল বুঝিয়ে তোমার ছবি তো খারাপ করেনি! প্রত্যেক ছবিটি হিট্ করেছে।

—সে কি ওর জন্যে নাকি? তোমার অভিনয়ের গুণে।

—আমার অভিনয়! তা বটে! কিন্তু আমার শিক্ষাও যে ওর কাছেই।

ভুরু দুটো কুঁচকে গেল ভবানীর। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে মালবিকার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেঃ হুঁ! গুরু ভক্তিটা বড্ড বেশি দেখছি। কিন্তু মতলবটা কি সত্যি ক'রে বলো দিকি?

—মতলব আবার কী?

মালবিকা বিচিত্র এক প্রকার হাসি হাসলে। তারপর মুহূর্তকাল কি চিন্তা ক'রে সহসাই উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ক্রমেই ভবানী শঙ্কিত হ'য়ে পড়ছিল। শঙ্কিত হ'য়ে পড়ছিল মালবিকার কথা চিন্তা ক'রে।

বেশ বুঝতে পারছে সে—মালবিকাকে আয়ত্তে রাখা তার পক্ষে আর সম্ভব হবে না। মালবিকার প্রতি এখন বহু লোকের দৃষ্টি পড়েছে। বহু প্রতিষ্ঠান থেকে তাকে টানাটানি শুরু করেছে। শুধু তাই নয়, ভবানীর এই বাণীশ্রী রঙ্গালয়েই অশোকের আমদানি করা একটি ছোকরা অভিনেতার প্রতি আজকাল তার হাবভাব কেমন সন্দেহজনক হ'য়ে উঠছে।

ছোকরার নাম বাসব রায়। অতিশয় সুন্দর—সুপুরুষ বললেই হয় বাসব রায়কে। অশোক তার ভেতর নাকি বিরাট সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছে। ভবানী কিন্তু সম্প্রতি অন্য সম্ভাবনা লক্ষ্য করছে তার মধ্যে। অনেক বারই অশোককে বলেছে সে, বাসবকে বিদায় করে দেবার কথা।

প্রতিবারই অশোক বলেছে ঃ ছেলেটা পার্ট করে ভালো।

—তা অবশ্য ভালোই করে, ভবানীও অস্বীকার করে না সে কথা। কিন্তু তলে তলে সে যে ভবানীরই অনুগ্রহের ছায়ায় বসে সুনাম অর্জন করবে অভিনেতা হিসাবে এবং ভবানীরই সর্বনাশ সাধন করবে মালবিকার সঙ্গে প্রেম ক'রে এ তো আর কোনো মতেই সহ্য করা চলে না। অথচ কী যে করবে কিছুই যেন ভেবে পাচ্ছে না ভবানী-শংকর।

বাসব সম্বন্ধে মালবিকারও যে বেশ খানিকটা দুর্বলতা আছে তারও প্রমাণ পেয়েছে কয়েকবার ভবানী। কাজেই সহসা বাসবকে থিয়েটার থেকে সরিয়ে দিলে ফল বিশেষ সুখের হবে না।

এ ব্যাপারের মীমাংসার জন্যে পূর্বে হ'লে অশোকের শরণাপন্ন হতো সে—এবং অশোকও সুমীমাংসাই ক'রে দিত। কিন্তু সে উপায়ও এখন আর নেই। থিয়েটার থেকে বাসবকে সরানোর চেয়ে অশোককে সরানোর প্রয়োজন অল্প নয় ভবানীর। অশোক এখন তার অসহ্ অসহ্য। তার জীবনের যেন অশুভ গ্রহ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে অশোক আজকাল। অশোক না গেলে তার শান্তি আসবে না। অশোক যেন জাদুমন্ত্রে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে মালবিকাকে। মালবিকাকে পরিপূর্ণ ভাবে পেতে হ'লে অশোককে তাড়ানো চাই সর্বাগ্রে, তারপর বাসবকে।

কিন্তু অশোককে তাড়ানোর ঝুঁকি নিতে হ'ল না ভবানীকে—নিজেই একদিন অশোক সামান্য একটি পত্রে নিজের বিদায় বার্তা জানিয়ে ভবানীর থিয়েটার থেকে অন্তর্ধান করলে। কোথায় গেল—কেন গেল, কেউ জানলে না। কাউকে কোনো কথা জানালে না। এমন কি উল্লাসীও জানলে না।

বাণীশ্রী মঞ্চে অভিনীত হবার জন্যে একটা নতুন নাটক মহড়া

দেওয়া হচ্ছিল। আজ বাদে কাল সে নাটকের অভিনয় শুরু হবে। চারিদিকে পোস্টার পড়ে গেছে। যুগান্তকারী নাটক।

অশোক বলেছে ঃ মঞ্চ জগতে সে আর এক ইতিহাস সৃষ্টি করবে এই নতুন নাটকে।

আজ সেই নতুন নাটকের পূর্ণ মহড়া। সারা রাত্রি ব্যাপি মহড়া চলবে। অশোকই এর ব্যবস্থা করেছে। আর আজই সকালে অকস্মাৎ সংবাদ পাওয়া গেল অশোক নিরুদ্দেশ। সংবাদটি যেমন আকস্মিক তেমনি অপ্রত্যাশিত।

ভবানীর ভুরু দুটো কুঁচকে গেল। মুখটা অস্বাভাবিক গম্ভীর হ'য়ে উঠলো। কিছুক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারলে না, গুম্ হ'য়ে মাটির দিকে তাকিয়ে বসে রইলো। তারপর একটা ছোট্ট হুঙ্কার ছাড়লে—হুঁ!

মালবিকা নিকটেই বসে ছিল। খবরটা শুনে সে যেন কেমন হ'য়ে গিয়েছিল। মাথার মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল!

অশোক চলে গেছে—কাউকে কোন কথা না বলে—বিশেষ ক'রে তাকে পূর্বাহ্নে কোনো রকম আভাস না দিয়েই চলে গেছে, এটা বিশ্বাস করতেই প্রবৃত্তি হচ্ছিল না তার। যে লোক গতকাল পর্যন্ত কতো আশ্বাসের বাণী শুনিয়েছে তাকে; জানিয়েছে তাকে না নিয়ে কোথাও যেতে পারবে না সে। ভালোবাসার কতো মধুর রাগিণী যখন তখন শুনিয়েছে তাকে! তার সামান্য একটু আপত্তিতে যে বোম্বের চিত্র পরিচালনার আহ্বান সহাস্যে প্রত্যাখ্যান করেছে, সে হঠাৎ এইভাবে চলে যাবে একি বিশ্বাস করা যায়! অথচ বিশ্বাস না ক'রে উপায় নেই—এ সত্য—রূঢ় সত্য।

মনে পড়লো মালবিকার কদিন পূর্বেকার একটি রাত্রির কথা।

সেদিন ছিল বাসবদত্তা অভিনয়—বাণীশ্রী রঙ্গমঞ্চে। উপগুপ্ত ছিল অশোক আর রাজনটার ভূমিকায় ছিল মালবিকা। সে যে কী

অপূর্ব অভিনয় হয়েছিল! মালবিকার অভিনেত্রী জীবনে অতো ভালো অভিনয় আর কোনোদিন করেনি।

আর অশোকের অভিনয়? তার তুলনা নেই। আজো যেন চোখের সামনে ভাসছে অশোকের সেই উপগুপ্তর মূর্তি।

অভিনয় শেষ হবার পর অভিনেতা অভিনেত্রীরদল যে যার গৃহে ফিরে গেছে। ভবানীও বাড়ি ফিরেছে মালবিকাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরবার তাড়া দিয়ে!

আরো কিছুক্ষণ কেটে গেল। মালবিকার বেশ পরিবর্তন অনেকক্ষণ হ'য়ে গেছে। সে তার সজ্জা-কক্ষের সামনে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। অপেক্ষা করছে অশোকের জন্যে। অশোক সেই যে অভিনয় শেষে তার নিজস্ব সজ্জাকক্ষে বেশভূষা পরিবর্তন করতে গেছে, এখনো সেখান থেকে ফেরেনি।

আশ্চর্য! এখনো অশোক কী করছে? দাঁতে ঠোঁট কামড়ে মালবিকা একবার ওপরে অশোকের ঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করলে। কিন্তু কিছু দেখতে পেলে না সেখান থেকে। কী একটা বেখাপ্পা সন্দেহ যেন তার মনে একবার ছাঁৎ ক'রে জেগে উঠেই মুহূর্তে মিলিয়ে গেল।

একটা নতুন মেয়ে এসে সম্প্রতি তাদের থিয়েটারে যোগ দিয়েছে। খাশা গান করে মেয়েটা। নাচও জানে। দেখতেও অতিশয় সুশ্রী। মেয়েটা নাকি ভদ্রঘরের মেয়ে। অবস্থার ফেরে পড়ে এ লাইনে আসতে বাধ্য হয়েছে। নাম তন্দ্রা।

অশোক মেয়েটাকে অনেক বুঝিয়েছিল এই লাইনে না আসবার জন্যে। কিন্তু সে একেবারে নাছোড়বান্দা।

ভবানীর ভারী মনে ধরেছে মেয়েটাকে। সেই একরকম জোর ক'রে তাকে নিয়েছে দলে। অশোককে বলেছিল: তুমি বাধা দাও কেন? ও নিজের ইচ্ছেয় আসতে চাইছে তো। আমরা তো আর জোর ক'রে ওকে দলে টানছি না!

অশোক আর কিছু বলেনি, একটু হেসেছিল। কিন্তু তারপর থেকে অশোক মেয়েটার সঙ্গে এমন ব্যবহার করে যা তার পক্ষে শোভন নয়। একটা নটীর প্রতি এমন সশ্রদ্ধ ব্যবহার অশোকের কাছে আশা করা যায় না।

ভবানী বলেঃ ও ডুবে ডুবে জল খায়। ভালো মেয়ে পেলে আমার চেয়ে উনি কম যান না। ওর পলিশি হ'চ্ছে সাধু সেজে মেয়েমানুষের মন জয় করা। এতোদিন ওকে চিনতে পারিনি। এখন আমি পরিষ্কার বুঝে নিয়েছি ও কী চিজ্।

মালবিকা সেকথা শুনে হেসেছিল, কিন্তু বিশ্বাস করেনি। আজ অশোকের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে হঠাৎ সেই তন্দ্রা মেয়েটার কথা মনে পড়তেই তার কপাল কুঁচকে গেল। তাহলে কি—সঙ্গে সঙ্গে আপন মনে বলে উঠলোঃ ধ্যেৎ! তা কখনো হয়! অশোক আর ভবানী অনেক তফাত। ভবানী যা পারে অশোক তা পারে না। অশোকের চরিত্রবল আছে। যে-কোনো মেয়ের সঙ্গে গায়ে পড়ে প্রেম করা অশোকের পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া থিয়েটারের সব মেয়েই অশোককে যমের মতো ভয় করে। তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবারই সাহস নেই কারো। তন্দ্রারও নেই।

কিন্তু এখনো কি করছে অশোক!

থিয়েটারের দরোয়ান ইতিমধ্যে বার তিনেক গেট বন্ধ করার সময় হয়েছে বলে জানিয়ে গেছে।

নাঃ! আর অপেক্ষা করা চলে না! কৌতূহলও আর চেপে রাখা যায় না। আস্তে আস্তে মালবিকা পা চালিয়ে দিলে অশোকের সজ্জাঘরের দিকে। মনের মধ্যে আবার সন্দেহ মাথা চাড়া দিয়েছে। অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে, চারদিকে শঙ্কিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে এগিয়ে চললো সে।

অশোকের বেশ পরিবর্তন হয়নি তখনো। একটা ইজি চেয়ারে দেহ এলিয়ে চক্ষু বুজিয়ে শুয়ে আছে সে। বোধ করি তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে

পড়েছে। ডান হাতের মধ্যমা আর তর্জনি দিয়ে একটা সিগারেট ধরা আছে। সিগারেটটা আপন মনেই পুড়ছে। বুকের ওপর একটা খোলা চিঠি পড়ে আছে। সেটা বাঁ হাত দিয়ে চেপে রেখেছে সে।

মালবিকা দরজার সামনে এসে পর্দা সরিয়ে ঘরের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে। সন্দিগ্ধ দৃষ্টি। কিন্তু না, ঘরে আর কেউ নেই তো! তবে? এখনো অশোক—ব্যাপারটা কী? কার চিঠি ওটা?

সন্তর্পণে পা টিপে টিপে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে সে। রুদ্ধশ্বাসে দাঁতে ঠোঁট চেপে অশোকের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘরের বাইরে থেকে দরোয়ানের কণ্ঠ আবার শোনা গেলঃ বাবুজি! রাত্তির অনেক বেজে গেলো। ফাটক বান্ধ হোবে।

—অ্যাঁ···হ্যাঁ!

কোন স্বপ্নের পর্বতশিখর থেকে যেন বাস্তবের কঠিন মাটিতে আছড়ে পড়লো অশোক। ধড়মড় ক'রে চেয়ারের ওপর উঠে বসলো সে।

—তাইতো—তাইতো, ভারি দেরি হ'য়ে গেছে। আমি এখুনি যাচ্ছি রামাশিস। এক মিনিট।

বলতে বলতেই অশোক উঠে দাঁড়ালো এবং হঠাৎ সেই সময় একটা চাপা শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দে পিছন ফিরে তাকাতেই মালবিকার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হ'ল। ত্রস্ত হাতে চিঠিখানা গুটিয়ে মুঠোর মধ্যে নিয়ে একটু হাসলে অশোক।

—কী? তুমি এখনো বাড়ি যাওনি! ভবানী যে কান্নাকাটি করবে।

—করুক্। ঘরে বাইরে অভিনয় আর আমার সহ্য হচ্ছে না।

অশোক আবার একটু হাসলে। দুর্বোধ্য হাসি! তারপর মালবিকার সামনে এসে দাঁড়ালো।

—সহ্য না করেও তো উপায় নেই মালবিকা। গোটা জীবনটাই

যে একটা প্রকাণ্ড অভিনয়। কিন্তু আর দেরি ক'রে কাজ নেই, চল যাই। বাইরে দরোয়ান দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মালবিকার পিঠে মৃদু আঘাত ক'রে তার একখানা হাত ধরে আকর্ষণ করলে অশোক।

আস্তে আস্তে আপন হাতটা মুক্ত ক'রে নিয়ে মুহূর্তকাল স্থির দৃষ্টিতে অশোকের দিকে তাকিয়ে রইলো সে। তারপর হঠাৎ কী হ'লো কে জানে—বিপুল উত্তেজনায় অশোকের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

—মোটে ভালোবাস না—তুমি আমায় মোটে ভালোবাস না। কেবল ধাপ্পা দিয়ে বাজে আশায় ভুলিয়ে রেখেছ। আমি আর কিছুতেই—

—ছিঃ!

সবলে তার বাহুপাশ মুক্ত ক'রে অশোক শান্ত গলায় বললেঃ ছেলেমানুষী কোরো না উল্লাসী। ধাপ্পা তোমায় আমি দিইনি—বাজে আশায়ও ভুলিয়ে রাখিনি। তুমি যা চেয়েছ—পেয়েছ। যেদিন তুমি মৌগাছি থেকে ভবানীর সঙ্গে লুকিয়ে পালিয়ে আস, সেদিনও আমার কথা তোমার মনে পড়েনি, আজও চেষ্টা করলে ভুলে যেতে দেরি হবে না।

একটু থেমে তেমনি হাসতে হাসতেই বললেঃ আমাকে কেন তুমি কামনা করো জানি না আমি। আমার গর্ব করবার মতো রূপ নেই—বিলাস করবার মতো ঐশ্বর্য নেই—ভালোবাসার মতো অন্তর নেই। তবুও কী চাও আমার কাছে জানি না।

হতবাক্ উল্লাসী স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে—নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। তার কথা যেন ভালো বুঝতে পারছে না।

অশোক বলে যাচ্ছেঃ জীবনে একমাত্র সাধনা আমার অভিনয়। আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয়। অভিনয় আমি করতে ভালোবাসি—

অভিনয় করাতে ভালোবাসি। আমার কাছে অভিনয়ের শিক্ষা পেয়ে কেউ ঠকেনি—তুমিও ঠকনি। প্রচুর প্রতিষ্ঠা পেয়েছ তুমি—আজ তুমি কোলকাতার একজন শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী। তোমার রূপ-যৌবনের হাটে নিজেকে বিকোবার জন্যে কতো রসিক প্রাণ উন্মুখ হ'য়ে আছে। শুধু ভবানীকে নিয়েই তো তোমায় সন্তুষ্ট থাকতে বলিনি। আর আমার আশায়ও কালাতিপাত করতে বলিনি।

এমন ভাবে অশোক ইতিপূর্বে কোনোদিন কথা কয়নি। তাই উল্লাসী বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিল। এতোদিন পরে আজ হঠাৎ একথা শুনবে আশাই করতে পারেনি সে। তবে কী সে আগাগোড়া ভুলই ক'রে এসেছে? যা এতাবৎ অশোক সম্বন্ধে ভেবে এসেছে অশোক তা নয়? কিন্তু অশোক তো ভবানীর বন্ধু!

সহসা একটা কথা মনে হ'তেই উল্লাসী দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে ধরলে। কী একটা বলবার চেষ্টা করলে কিন্তু বলতে পারলে না।

অশোক বললে: আর রাত ক'রে কাজ নেই—চলো যাওয়া যাক।

বলেই পকেট থেকে সিগারেট বার করতে গেল আর ঠিক সেই অসাবধানতার অবসরে হাতের মুঠিতে চেপে রাখা চিঠিখানা মাটিতে পড়ে গেল।

চকিতে উল্লাসী সেখানা তুলে নিলে এবং তেমনি চকিতে সেখানা জামার তলায় লুকিয়ে ফেললে।

শশব্যস্তে অশোক বলে উঠলো: ও কী করছো? ও চিঠি ভয়ানক দরকারি। দিয়ে দাও।

—না দোব না। কিছুতেই দোব না।

—কিন্তু ওতে তোমার কোনো কাজ হবে না উল্লাসী। তা ছাড়া ও চিঠির এতোটুকু অসম্মান করলে তোমার অকল্যাণ হবে।

—হোক অকল্যাণ। নটীর আবার কল্যাণ অকল্যাণ কী?

—তা বটে।

একটা শ্লেষের বাঁকা হাসি ফুটে উঠলো অশোকের মুখে। বললে: কেন মিছে সময় নষ্ট করছ উল্লাসী! রাত হ'য়ে যাচ্ছে—দরোয়ান রাগ করছে। দাও ওটা।

—যদি না দিই?

ভুরু দুটো কুঁচকে গেল অশোকের। একটা প্রচণ্ড বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠলো তার মুখে চোখে। কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলে না সে, কট্‌মট্ ক'রে তাকিয়ে রইলো উল্লাসীর মুখের দিকে।

—অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করছো তুমি। অবশ্য তোমার কাছে এর বেশি আশাও করা ভুল।

ঠিক সেই সময় পুনরায় দরোয়ানের আহ্বান শোনা গেল এবং সেই সঙ্গে শোনা গেল নিচে থেকে মোটরের হর্ণ।

—বাবু!

—ও হ্যাঁ। তুমি ঘর বন্ধ করো রামাশিস—আমার হ'য়ে গেছে। নিচে কার গাড়ির হর্ণ শোনা যাচ্ছে? ভবানীর নাকি?

—জী হুজুর। বড়বাবু গাড়ি ভেজিয়েছেন।

—ও!

আর কিছু না বলে এবং উল্লাসীর দিকে আর না তাকিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল অশোক। কিন্তু যেতে পারলে না—উল্লাসী বাধা দিলে।

—শোনো। এই নাও তোমার প্রেমপত্র।

বলেই চিঠিখানা ছুঁড়ে অশোকের পায়ের কাছে ফেলে দিলে সে।

ফিরে দাঁড়িয়ে চিঠিখানা সাগ্রহে তুলে নিয়ে অশোক বললে: প্রেমপত্র! হ্যাঁ, তাও বলতে পারো। কেন না প্রেমেরই অপর নাম ভালোবাসা। তবে সাধারণতঃ যে প্রেমের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় আছে এ প্রেম তা থেকে স্বতন্ত্র। এ প্রেমের মধ্যে কোনো দৈহিক কামনার গন্ধ নেই। এ প্রেম মা-ছেলের মধ্যে আছে—ভাই-বোনের মধ্যে আছে। এর রূপই আলাদা। কিন্তু এ তুমি বুঝবে না।

বোঝাবার মিছে চেষ্টা করেও লাভ নেই। তার চেয়ে যা বোঝো—তাই করগে'। ভবানী তোমার পথ চেয়ে আছে।

অশোক চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ উল্লাসী স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে। অসহ্য অপমানের বেদনায় বুকের ভেতরটা কেমন যেন করছিল তার। হয়তো নিজের অজ্ঞাতে কখন দু'ফোঁটা চোখের জলও গড়িয়ে পড়েছিল তার গাল বেয়ে।

তারপর এক সময় নিজেকে সামলে নিয়ে চলে এসেছিল সে থিয়েটার বাড়ি থেকে।

বাড়ি এসে যখন পৌঁচেছিল তখন ভবানী অত্যধিক নেশার বশে ঘুমিয়ে পড়েছে।

তার দিকে তাকিয়ে উল্লাসী যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো?

—যাক্, বাঁচা গেল। কেন দেরি হ'ল? কোথায় ছিলুম? কার সঙ্গে গল্প করছিলুম? এই সব সাত সতেরো বাজে কৈফিয়তের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল। আজকের মতো নিশ্চিন্ত।

উল্লাসী গিয়ে আপন শয্যায় দেহ এলিয়ে দিলে। কিন্তু ঘুমুতে পারলে না সে সারারাত। কেবলই একটা অদম্য কৌতূহল আর সেই সঙ্গে একটা অস্বস্তিকর বেদনা মনটাকে তার পীড়া দিতে লাগলো। কেবলই মনে হ'তে লাগলো অশোক তাকে অপমান করেছে—আঘাত করেছে তার মনে। কুঠারাঘাত করেছে তার ভালোবাসার মূলে। তার এতোদিনের স্বপ্ন—এতোদিনের প্রতীক্ষা আজ এক কথায় অশোক নিঃশেষ ক'রে দিয়েছে। অশোক নিশ্চয়ই অন্য নারীকে ভালোবাসে। কিন্তু কে সে ভাগ্যবতী? তন্দ্রা কী? তাহলে কি ভবানীর অনুমান মিথ্যা নয়?

এতোকাল যা অপ্রকাশ ছিল আজ তা প্রকাশ হ'য়ে পড়েছে। অশোক যাই বলুক—ও চিঠি নিশ্চয়ই তার কোনো প্রেমিকার। নইলে অতো কেন?

॥ দশ ॥

সে রাত্রে চোখে পাতায় করতে পারলে না সে—কেবলই ওই এক চিন্তা—এতোদিন অশোক ভুল বুঝিয়ে এসেছে তাকে। এতোদিন মিথ্যা আশার বাণী শুনিয়ে এসেছে।

নিঃসঙ্গ শয্যায় শুয়ে অনেক কান্নাই কাঁদলে সেদিন উল্লাসী।

অশোককে সত্যিই ভালোবেসেছিল সে—বড়ো ভালোবেসেছিল। কোনোদিন অশোকের অবাধ্য হয়নি—যা বলেছে, বিচার-বিহীন চিত্তে তাই শুনে এসেছে—দ্বিধা করেনি, সংকোচ করেনি, বিরক্ত হয়নি। ওই মাতাল দুশ্চরিত্র ভবানী—যার সংস্পর্শ সহ্য করতে পারে না সে—যাকে দেখলে ঘৃণায় সমস্ত দেহ কণ্টকিত হ'য়ে ওঠে তার। সেই মানুষের সঙ্গে নির্বিচারে এই দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেছে সে—তার শয্যা সঙ্গিনী হয়েছে—প্রেমের নির্লজ্জ অভিনয় ক'রে এসেছে। আর মনে মনে দিন গুণেছে—কবে এই ঘৃণ্য সংস্পর্শ থেকে মুক্তি পাবে—কবে অশোক স্বতন্ত্র স্বাধীন ভাবে তাকে নিয়ে ঘর বাঁধবে।

অশোক তাকে এতাবৎ শুনিয়ে এসেছে ঃ উল্লাসী, এখানে এমন ক'রে কেন পড়ে আছি জানো? শুধু বোকা ভবানীর পয়সায় নাম আর প্রতিষ্ঠা কেনবার জন্যে! এমন স্বাধীনতা অন্য কোনো সিনেমা থিয়েটারে পাবো না। নাম বাজাবার এমন সুযোগও কেউ দেবে না। আর নাম না হ'লে এ দেশের অভিনয় ব্যবসায়ীরা কেউ কলকেও দেবে না। আমার নিজের অভিনয় শক্তি সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট উঁচু ধারণা আছে এবং অহংকার আছে। আমি নিজে ভালো অভিনয় করতে পারি, অভিনেতা তৈরি করতে পারি। কিন্তু দেশের লোকের চোখের সামনে যতক্ষণ না আমার সেই বিদ্যার প্রমাণ দাখিল করতে পারছি ততক্ষণ কেউ আমায় বিশ্বাস করবে না—কেউ আমায় স্থান

দেবে না, মর্যাদা দেবে না। ভবানীর এখান থেকেই আমাকে সেই মর্যাদা উপার্জন ক'রে নিতে হবে।

—ভবানী আমাদের যোগ্য পয়সা দেয় না বটে, তবে নাম কেনবার সুযোগ দিয়েছে। আরো কিছুদিন এইভাবে থেকে তারপর—তারপর তুমি আর আমি—বলেই হেসে উঠেছে সে। হাসতে হাসতে বলেছেঃ গুরু শিষ্যায় আমরা তারপর হলিউডেও যেতে পারি চারিদিক থেকে তখন আমাদের চারপাশে সশ্রদ্ধ আহ্বান গুঞ্জন করবে। অর্থ বাহু প্রসারিত ক'রে এগিয়ে আসবে আমাদের মধুর আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করতে। তখন ইচ্ছা করলে আমরাও এমনি ভবানীর মতো একটা রঙ্গমঞ্চ তৈরি করতে পারবো।

আনন্দ-বিহ্বল চোখে উল্লাসী চেয়ে থাকতো অশোকের মুখের পানে। অবাক হ'য়ে শুনতো অশোকের সেই সব আশার আকাশ-কুসুম কল্পনা। আহ্লাদে সমস্ত বুকখানা তার দুলে দুলে উঠতো।

যতোবার সে বলেছেঃ এমন ক'রে প্রায় অনৈতিক অবস্থায় আর কতো কাল কাটাতে হবে। মাতালটা যে পয়সা কড়ি দেবার নাম করে না।

—নাই করুক, উল্লাসী—নাই করুক। মাতালটা পয়সা দেয় না বটে—নাম করতে দেয়। সেটাই কি কম কথা! অন্য কোথাও কী এ সুযোগ পাওয়া যাবে? আরো যে কদিন আমাদের কর্মভোগ আছে—এমনি ভাবেই আমাদের সামান্যে সন্তুষ্ট হ'য়ে কাটাতে হবে। তবে আর বেশি দিন নয়।

আর কোনো অভিযোগ করেনি উল্লাসী। অশোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আজ পর্যন্ত তা করে'ওনি কোনোদিন। শুধু মাঝে মাঝে প্রেম নিবেদন করতে গেছে ব্যাকুল বাসনা নিয়ে এবং পিঠ চাপড়ে অশোক তাকে ধৈর্য ধারণ করতে আর প্রতীক্ষা করতে উপদেশ দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছে।

হেতু এতোদিন বুঝতে পারেনি সে। বুঝতে পারেনি কেন

প্রতিবার অশোক একটা না একটা কিছু বলে তার লালসার স্রোতে বাধা দিয়েছে। স্পষ্ট ভাষায় অশোক তাকে জানিয়ে দিয়েছেঃ যতদিন আমরা ভবানীর এখানে আছি—ততদিন আমাদের মিলন সম্ভব নয়। শুধু মনে মনে দুজনে দুজনকে ভালোবাসবো—এর বেশি আর কিছু নয়। কিন্তু এর কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন ক'রে আমাকে বিব্রত কোরো না উল্লাসী। এ গণ্ডি ভেদ ক'রে কবে আমরা বেরুতে পারবো—সেই সুদিনের অপেক্ষা ছাড়া এখন আর অন্য কিছু নয়। আর এক কথা—আমাদের অভিপ্রায় যেন ভবানী ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে।

অবহেলা করেনি উল্লাসী সে কথার—এতোদিন ঘুণাক্ষরেও ভবানীকে জানতে দেয়নি তাদের গোপন অভিপ্রায়!

মাতাল ভবানীর কামনার আগুনে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপন দেহখানাকে বিলিয়ে দিয়ে এসেছে এতোদিন বিনা প্রতিবাদে; শুধু অশোকের আশ্বাস বাক্যে বিশ্বাস করে। কতো জায়গা থেকে কতো আহ্বান এসেছে—কতো প্রলুব্ধ আহ্বান, ভ্রূক্ষেপ করেনি সে। সমস্ত হাসিমুখেই প্রত্যাখ্যান করেছে—শুধু অশোকের জন্যে। নইলে ভবানীর এখানে ব্যাগার দেবার কী প্রয়োজন তার?

ভবানী বলে যে, তারই অভিনয়ের গুণে নাকি, ভবানীর থিয়েটার চলছে এবং সিনেমায় যে কখানা ছবি হিট্ করেছে তাও নাকি তারই অভিনয় নৈপুণ্যে। অথচ সেজন্য কী দাম দিয়েছে তাকে ভবানী? যা দিয়েছে এবং যা দেয় তাই কী তার যোগ্য মর্যাদা? তবুও এখানে পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে সে। মার খাচ্ছে কেবল অশোকের মুখ চেয়ে। তারই উপার্জনের পয়সায় তারই চোখের সামনে ভবানী আপন খেয়াল চরিতার্থ করছে—নারী আর নেশার পেছনে জলের মতো অর্থ ব্যয় করছে, কোনো কথা বলতে পারে না সে। নির্বাক দর্শকের মতো চুপ ক'রে তাকিয়ে কেবল দেখে যায়।

তার সামনে ভবানী কতো মিথ্যা ছলনার কথা বলে। বলে তাকে

ছাড়া আর কোনো নারীর প্রতি আকর্ষণ নেই তার—আর কাউকে অভিলাষও করে না সে।

সেকথা শুনে মনে মনে হেসেছে উল্লাসী। হেসেছে এই ভেবে যে, ভবানীর চরিত্র জানতে বাকী নেই তার। এবং এও জানে, তার চোখের অন্তরালে কতোগুলি নারী আসা যাওয়া করে ভবানীর কাছে। এখন আবার ওই নতুন মেয়েটা—তন্দ্রার ওপর নজর পড়েছে। আর নজর যখন পড়েছে তখন ওর আর নিস্তার নেই। ওকে খপ্পরে এনে ফেলবেই ভবানী। পারেনি এতোদিন শুধু অশোকের জন্যে। অশোক যেন আগলে রাখে মেয়েটাকে।

একদিন থিয়েটার শেষে মাতাল অবস্থায় হঠাৎ গ্রীনরুমের মধ্যে গিয়ে অপ্রস্তুত তন্দ্রাকে আক্রমণও করেছিল ভবানী।

সে এক বিতিকিচ্ছি কাণ্ড। গ্রীনরুমে তখন অন্য কোনো মেয়ে ছিল না একমাত্র তন্দ্রা ব্যতীত। দরজাটা ভেজানো ছিল। মেয়েটাও একটু যেন কেমন বেহায়া! শায়া পরে আর কাঁচুলি গায়ে বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে মুখের রং তুলছিল। আর হয়তো বা সেই সঙ্গে নিজের যৌবনটাও নিরীক্ষণ করছিল। হঠাৎ দরজা খুলে ভবানী প্রবেশ করলে এবং প্রবেশ করেই ক্ষুধিত শ্বাপদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো মেয়েটার ওপর।

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার ক'রে উঠে মেয়েটা সবলে তাকে ঠেলে দিলে।

মাতাল ভবানী সে ধাক্কায় টাল সামলাতে পারলে না, পড়ে গেল।

মেয়েটা তখন হাঁপাতে হাঁপাতে বিবর্ণ মুখে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো। পাশেই উল্লাসীর সাজঘর। অশোকও তখন সে ঘরে উপস্থিত ছিল। মেয়েটা সেই প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় সেখানে এসে কেঁদে ফেললে।

উল্লাসী তাড়াতাড়ি একখানা কাপড় নিয়ে তার গায়ে জড়িয়ে দিলে সলজ্জ হাসির সঙ্গে। তারপর সমস্ত ঘটনাটা শুনলে। শুনে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। এতোটা নিচে নেমে গেছে ভবানী!

অশোক উল্লাসীর দিকে চেয়ে একটা বিকৃত হাসি হাসলে।

উল্লাসী বললেঃ তোমার বন্ধু। আরো শুনবে তোমার বন্ধুর গুণের কথা? শোনো আজকাল আবার ও দালাল রেখেছে—মেয়েমানুষ সংগ্রহ ক'রে দেবার জন্যে। তারা নতুন মেয়েমানুষ আমদানি করে দেয় ওকে।

অশোক জিজ্ঞাসা করলেঃ কি করে জানলে?

—জানি। এখানেও একজন পুরুষ ও একজন মেয়েমানুষ আছে। যারা ওর জন্যে ভালো ভালো অ্যাকট্রেস্ সংগ্রহ করে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। আমি সব জানি। তুমি আমায় কোথায় কার কাছে রেখেছ একবার ভেবে দেখো।

হঠাৎ সেই কথাগুলো মনে পড়ে গেল আজ উল্লাসীর। সঙ্গে সঙ্গে একটা কুটিল হাসি ফুটে উঠলো তার মুখে। ভবানীকে চিনতে বাকী নেই তার। ভবানীকে ভালো করেই চিনেছে সে।

কিন্তু চুলোয় যাক ভবানী, গোল্লায় যাক্ তার সিনেমা থিয়েটার! এখন ভাবনা—অশোক কী করলে তার? অশোক কেন এমন প্রবঞ্চনা করলে? এমনি করেই কী অশোক তার ভালোবাসার দাম পরিশোধ করতে চলেছে?

না, নিশ্চেষ্ট হ'য়ে থাকবে না সে। এর প্রতিবিধান করতেই হবে তাকে। অশোকের কাছে এর কৈফিয়ৎ দাবী করতেই হবে! অশোককে ছাড়বে না সে। তারই চোখের সামনে যে অশোক আর একটা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করবে! এ কিছুতেই সহ্য হবে না তার। এ তার অসহ্য—অসহ্য।

সারা রাত্রি এই সব ভাবনায় অতিবাহিত ক'রে ভোরের দিকে কখন একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল উল্লাসী। যখন ঘুম ভাঙলো বেলা তখন প্রায় নটা।

সর্বনাশ! এতো বেলা হয়ে গেছে!

তাড়াতাড়ি উঠে সে বাথরুমে চলে গেল। চলে গেল আপন মনে গজগজ করতে করতে। অসংখ্য কাজ করবার রয়েছে—আর ঘুম ভাঙলো এই এখন। এখন গিয়ে হয়তো আর দেখাই হবে না অশোকের সঙ্গে। অথচ দেখা তার করতেই হবে—বোঝাপড়া একটা দরকার।

ঘণ্টাখানেক পরে স্নান, প্রসাধন ও যৎকিঞ্চিৎ প্রাতরাশ সেরে অশোকের বাসার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লো সে।

ভবানী তার অনেক আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। নতুন নাটকের মহড়া চলছে—সেই জন্যে বাণীশ্রীতেই গেছে। যাবার আগে বাড়ির বৃদ্ধা পরিচারিকাকে বলে গেছে—মালবিকা উঠলেই যেন তাকে থিয়েটারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ভবানী সেখানে থাকবে।

পরিচারিকা সেকথা জানাতে ভোলেনি উল্লাসীকে। উল্লাসীও জানতো তাকে রিহার্শেলে যেতে হবে। নতুন নাটকের সেই প্রধানা নায়িকা; সুতরাং তার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু তার চেয়েও প্রয়োজন সর্বাগ্রে রিহার্শেল মাস্টার অশোকের সঙ্গে সঙ্গোপনে একবার দেখা করার।

অশোকের বাসায় পৌঁছে দেখল—অশোক তার বসবার ঘরে একটা কৌচে আড় হ'য়ে পড়ে। বুকের ওপর খোলা আছে একখানা বই—বইখানা নাটক—যে নাটকের অভিনয় প্রস্তুতি চলছে ভবানীর থিয়েটারে। কিন্তু বইখানার প্রতি তার দৃষ্টি নেই। দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ হ'য়ে আছে একটি চিঠির ওপর। চিঠিটি সম্ভবতঃ কালকের সেই চিঠি। দু'হাতে চিঠিটি মুখের কাছে তুলে ধরে অর্ধনিমীলিত চোখে তাকিয়ে আছে। তার উপস্থিতি জানতেও পারলে না।

চুপ ক'রে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে একবার গলা খ্যাঁকারি দিলে

উল্লাসী। তারপর একটা চেয়ার সশব্দে টেনে নিয়ে তার সামনে বসে পড়লো।

চমকে উঠে ধড়মড় ক'রে সোজা হ'য়ে বসলো অশোক।

—কে—কে?—আরে—ও তুমি। তাই ভালো! আমি মনে করলুম—কিন্তু তুমি রিহার্শেলে যাও নি?

—না।

—না কেন?

চিঠিখানা ভাঁজ ক'রে পকেটে রেখে দিয়ে অশোক বললে: তুমি না গেলে রিহার্শেল হবে কেমন ক'রে? ভবানী গেছে তো?

—গেছে।

—তাহলে তুমি যাওনি কেন? ভবানী রাগ করবে যে।

—তা করবে। আরো করবে এখানে এসেছি জানতে পারলে। তবুও নিতান্ত প্রয়োজন আমার এখানে আসার; তাই এসেছি। তা ছাড়া আমি কারো কেনা নই—কারো রাগের তোয়াক্কা রাখি না।

—তা ঠিক। তোয়াক্কা রাখাও উচিত নয়।

—নয়ই তো।

উল্লাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে এবার হঠাৎ হেসে উঠলো অশোক। বেশ জোরেই হেসে উঠলো।

—হাসছ যে?

—হাসি পাচ্ছে বলে।

—শুধু শুধু আবার হাসি পায় নাকি কারো? শুধু শুধু হাসে পাগলে।

—তাহলে মনে করো আমি পাগল। কিন্তু তুমি অতো চটে উঠেছ কেন? মনে হচ্ছে তুমি যেন আমার সঙ্গে ঝগড়া করবে বলে প্রস্তুত হ'য়ে এসেছ! ব্যাপারটা কী বল দিকি?

—ব্যাপারটা কী তুমি জানো না?

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালে উল্লাসী অশোকের দিকে।

ভ্রূকুটি করলে অশোক। কী যেন একটা ভাববার চেষ্টা করলে, তারপর আবার তেমনি জোরে হেসে উঠলো।

—ও, সেই কথা। কিন্তু সে তো কালকের ব্যাপার কালকেই শেষ হ'য়ে গেছে।

—না, যায় নি। তুমি আমায় অপমান করেছ। আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছ।

—আমি? কী বলছ তুমি!

—ঠিকই বলছি। তুমি আমার ভালোবাসার অমর্যাদা করেছ। তোমাকে বিশ্বাস ক'রে আমি ঠকেছি।

আর একবার হেসে ফেললে অশোক। হাসতে হাসতে বললেঃ মালবিকা, তুমি আমায় কোনদিন ভালোওবাসনি বিশ্বাসও করনি। কারণ ও দুটো বস্তুর যে কী স্বরূপ তাই তুমি জানো না। সত্যিই জানো না।

মুখটা কেমন কঠিন হ'য়ে উঠলো উল্লাসীর। ভুরু দুটো কুঁচকে গেল। দাঁতে ঠোঁট চেপে স্বল্পক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেঃ সেটা আশা করি আপনার প্রিয়া জানেন? আমরা গেঁয়ো মুখ্যু মেয়েমানুষ—

—প্রিয়া!

চমকে উঠলো অশোক।

—প্রিয়া আবার কে?

—অতো অভিনিবেশ সহকারে যাঁর গোপন পত্র পাঠ করছিলেন! যাঁর পুণ্য হস্তের লেখা চিঠি স্পর্শ করলেও আমাদের মতো পাপীয়সীর অকল্যাণ হবার সম্ভাবনা!

—ও।

একটা বিচিত্র বাঁকা হাসি ফুটে উঠল অশোকের ঠোঁটের কোণে। ক্ষণকাল স্থির দৃষ্টিতে উল্লাসীর দিকে চেয়ে থেকে সে বললেঃ কিন্তু অমন কথা আর মুখে উচ্চারণ কোরো না মালা। এ

যাঁর চিঠি তিনি আমার প্রিয়া নন—আমার প্রণম্য দেবী। আমার মাতৃস্বরূপা! তুমি জানো না—তুমি ধারণাও করতে পারবে না—এঁর হৃদয় কতো বড়ো। কতো মহৎ এঁর অন্তঃকরণ। তুমি বলো, তুমি আমাকে ভালোবাসো এবং এমন ভালোবাসো যে আমার সুখের জন্যে সব কিছুই করতে পারো। কিন্তু আমি জানি, কিছুই তুমি করতে পারো না।

—পারি না!

—না। সে সাধ্যই তোমার নেই। তুমি চাও আমাকে একান্ত ক'রে পেতে এবং আমাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে। সেই চাওয়া যদি না পাও—অর্থাৎ যদি তোমার আশা ভঙ্গ হয় তাহলেই তুমি ক্ষুণ্ণ হবে। আমাকে হয়তো—হয়তো কেন নিশ্চয় তখন শত্রু ভাবতে শুরু করবে এবং অন্য কোনো পুরুষকে আমার আসনে প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে। তারপর তাকেও যদি অপছন্দ হয় কিংবা তার সঙ্গে যদি বনিবনা না হয় তখন আর একজনকে বেছে নেবে। এমনি ভাবে একের পর এক পুরুষ তোমাদের জীবনে, তোমাদের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি সাধন করতে আসা যাওয়া করবে। কারণ তোমাদের মনের ভালোবাসার চেয়ে দেহের ভালোবাসাই বড়। আমাকে হয়তো তুমি ভালোবাসো—আমাকে তোমার জীবনে কামনা করো, অথচ যৌবনধর্ম পালন করো ভবানীর সঙ্গে—যৌবনক্ষুধা তীব্র হলে ভবানী ছাড়াও অন্য পুরুষের সংসর্গ করে থাকো। সে ক্ষুধার তাড়নায় আমার কাছেও বহুবার বহুভাবে এসেছ।

—কিন্তু সে তো তোমারই আদেশে।

—আদেশে? হ্যাঁ তাই বটে।

আবার পূর্বের মতো একটু হাসলে অশোক। হাসতে হাসতেই বললেঃ কিন্তু আদেশ না দিয়ে আমার উপায় কী? তোমাকে বাধা দেবার সাধ্য নেই আমার। অধিকারও নেই।

—নেই কেন? তাহলে—

উল্লাসাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই অশোক বললেঃ নেই এইজন্যে যে তোমার ওপর আমার কোনো দাবী নেই। ভালো তুমিও আমায় বাসো না—আমিও না।

ভুরু দুটো কুঁচকে গেল উল্লাসীর। দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে ধরলে।

অশোক বলে যেতে লাগলোঃ তুমি আমায় ভালোবাসো না কামনা করো। আর আমি তোমায়—কিন্তু থাক্ সে কথা।

—না না, থাকবে কেন? বলেই ফেল—তুমি আমায় ঘৃণা করো।

কেমন যেন একটা তীব্র বেদনা মোচড় দিয়ে উঠলো উল্লাসীর বুকের মধ্যে। কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হ'য়ে এলো।

—তাহলে এতোদিন আমার সঙ্গে তুমি ভালোবাসার শুধু অভিনয়ই ক'রে এসেছ?

—অভিনয়ই তো আমার জীবনের পেশা মালা। শুধু আমার কেন; বিশ্ব-সংসার এই অভিনয়ের ওপরই চলছে। আমাকে আজ এখানে এই অভিনয় করতে দেখছ, কাল হয়তো অন্য কোথাও স্বতন্ত্র অভিনয়ে নামতে হবে। তারই প্রস্তুতি চলছে ক্ষণে ক্ষণে। কিন্তু তোমার সঙ্গে অভিনয় করলেও তোমায় আমি ঠকাইনি।

—ঠকাওনি? মিথ্যে কথা। তুমি আমায় ঠকিয়েছ—নিশ্চয় ঠকিয়েছ। আলবৎ—

কেঁদে ফেললে উল্লাসী। কাঁদতে কাঁদতে বললেঃ ভালো হয়তো তুমি আমায় বাসোনি—অভিনয় করেছ শুধু আমার সঙ্গে, কিন্তু আমার ভালোবাসার মধ্যে অভিনয় নেই।

বলেই উঠে পড়লো উল্লাসী এবং চলে যাবার জন্যে পা বাড়ালে।

অশোক ত্রস্তে তার একখানা হাত ধরে ফেলে বললেঃ রাগ কোরো না উল্লাসী। শোনো। ভালো কিন্তু তুমিও আমায় বাসোনি। ভালোবাসা কাকে বলে, তার একটা গল্প বলি শুনে যাও।

—থাক। তোমার গল্প তোমারই থাক। যে ভালোবাসতে জানে তাকে শুনিও।

কাপড়ের আঁচল দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিলে সে। তারপর অশোকের হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলো কিন্তু অপারক হ'য়ে শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত চেয়ারে বসেই পড়তে হ'ল আবার তাকে।

অশোক তেমনি মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে তার সামনে বসে বললে: একটি মেয়ে—বিদুষী মেয়ে, ধনীর মেয়ে এবং জমিদার বাড়ির বধূ। জীবনে কোনো দিকে কিছুমাত্র অভাব নেই তার, কেবল স্বামীর প্রীতির অভাব ভিন্ন। স্বামীকে মেয়েটি ভালোবাসে ঠিক ভক্ত যেমন ভগবানকে ভালোবাসে তেমনি। স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্যে অশেষ দুঃখ বরণ করতেও মেয়েটি প্রস্তুত। সমাজ সংসার খ্যাতি যশ অর্থ সমস্ত কিছুই হাসি মুখে পরিত্যাগ করতে মেয়েটি পা বাড়িয়ে আছে—শুধু স্বামীর প্রসন্নতা অর্জন করবার জন্যে। কিন্তু স্বামী তাকে চায় না। স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে মাঝে মাঝে গিয়ে ভালোবাসার ছলনায় তাকে ঠকিয়ে আসে মাত্র।

চুপ ক'রে শুনছিল উল্লাসী। মন্দ লাগছিল না। জিজ্ঞাসা করলে: স্বামী কোথায় থাকে?

—স্বামী থাকে অসংখ্য নারীর ভিড়ে ব্যভিচারে মত্ত হ'য়ে। অথচ স্ত্রী তার অসুন্দরী নয়। তেমন সুন্দরী সচরাচর চোখেও পড়ে না।

—তবু সে-স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করে না স্বামী?

—না। মেয়েটি স্বামীর চরিত্র ভালোই জানে। জানে তার স্বামী কোথায় কী ভাবে থাকে। তবুও স্বামীকে দেবতার মতোই ভক্তি করে সে। মনে প্রাণে স্বামী ছাড়া অন্য চিন্তা নেই তার। স্বামীই ধ্যান, স্বামীই জ্ঞান। স্বামীর প্রীতি, স্বামীর ভালোবাসা যেমন করেই হোক অর্জন করতেই হবে তাকে। এই তার জীবনের তপস্যা।

—কিন্তু কেন ?

উল্লাসী প্রশ্ন করলেঃ স্বামীর প্রতি তার এই প্রগাঢ় ভালোবাসা কেমন ক'রে সম্ভব হ'ল ? কতোদিন স্বামীর সঙ্গে ঘর করেছিল সে ?

—অতি অল্পদিন। আর ভালোবাসা সম্ভব হ'ল কেমন করে ? সে প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারবো না। সে দিতে পারবেন তিনি যিনি মানুষের বুকে ভালোবাসা দিয়েছেন। তবে আমার মনে হয় জীবনের প্রথম বসন্তে যাকে একবার মনের কাছে পাওয়া যায় তাকে আর ভোলা যায় না। বাস্তবিক একাগ্র প্রেমের যে কী রূপ তা আমার এই বউদিটিকে দেখলে বেশ বোঝা যায়—

—ইনি তোমার বউদি ?

বিস্ময়ে চোখ দুটো বড়ো বড়ো ক'রে তাকালে উল্লাসী।

অশোক বললেঃ বউদি বলে ডাকি। সম্পর্কেও বউদি হন। কিন্তু ইনি আমার গুরু। স্ত্রীলোকদের প্রতি বরাবর আমার মনে একটা বিজাতীয় ঘৃণা ছিল। আমার ধারণা ছিল মেয়েরা ভালোবাসতে জানে না। মেয়েরা যা করে কামনার বশে করে। আমার সে ধারণা বউদি উল্‌টে দিয়েছেন।

কেমন একটা আশ্চর্য দীপ্তি উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো অশোকের মুখে। চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সে বললেঃ তুমি প্রথম কাকে ভালোবেসেছিলে মালা ?

চমকে উঠলো উল্লাসী হঠাৎ কথাটা শুনে। তারপর বললেঃ জানি না। বোধ হয় কাউকে ভালোবাসিনি।

—কাউকে ভালো লাগতো না ?

—না।

বলেই কেমন একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়লো উল্লাসী। মনের আকাশে ক্ষণিকের জন্যে একটা মূর্তি দেখা দিয়েই চকিতে মিলিয়ে গেল। একটা দীর্ঘস্থায়ী নিশ্বাস পরিত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়ালো সে।

—দেরি হ'য়ে যাচ্ছে, রিহার্শেলে যাবে না ?

—হ্যাঁ যাবো। চলো এবার যাই। কিন্তু গল্পের শেষটা শুনলে না? যে চিঠি নিয়ে এতো কাড়াকাড়ি করলে তুমি সে-কার চিঠি শুনলে না?

—শুনতে হবে না, বুঝতে পেরেছি। তোমার সেই বউদির চিঠি।

—হ্যাঁ। বউদি আমায় আহ্বান জানিয়েছেন।···

রাস্তায় বেরিয়ে আর তাদের বিশেষ কথাবার্তা হ'ল না। কেবল থিয়েটারের গেটের কাছে এসে অশোক বললেঃ আমার একটা অনুরোধ রাখবে মালা?

—কী?

—আমার বউদির কথা এবং তাঁর চিঠির কথা কাউকে কোনো কারণে বোলো না। বলো বলবে না?

—আচ্ছা।

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো অশোক। উল্লাসী সবিস্ময়ে তার দিকে তাকাতে সে বললেঃ ভবানীর মনটা আজকাল ভয়ানক সন্দিগ্ধ হ'য়ে উঠেছে। দুজনকে একসঙ্গে যেতে দেখলে নিশ্চয় একটা কিছু মন্দ ধারণা ক'রে নিয়ে তোমায় হয়তো অসম্মানজনক কিছু বলে ফেলতে পারে। তার চেয়ে তুমি একটু এগিয়ে যাও—আমি পেছনে যাচ্ছি।

সর্পিনীর মতো ফোঁস ক'রে উঠলো উল্লাসীঃ আমি কী ভবানীর কেনা নাকি?

—না হ'লেও, যতোক্ষণ তার অধীনে আছি—তার পয়সায় খাচ্ছি—

—সে কী মুখ দেখে আমাদের পয়সা দেয়?

—তা হোক! তুমি একটু এগিয়ে যাও। লক্ষ্মীটি!

—বেশ, যাচ্ছি। কিন্তু তোমায় বলে দিচ্ছি, এতোদিন তোমার খাতিরে তার অনেক অপমান সয়েছি, আর সইবো না!

জোরে জোরে পা ফেলে উল্লাসী চলে গেল।

অশোক তার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলে তারপর পকেট থেকে একটা সিগারেট বার ক'রে ধরালে।

॥ এগারো ॥

সেবার প্রায় মাস ছয়েক একটানা কাশীতে মায়ের কাছে কাটিয়ে গৌরীশংকর রাধানগরে ফিরলো। আরো কিছু দিন হয়তো থাকতো কিন্তু চিঠির ওপর চিঠি গিয়ে তাকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুললে। এক জমিদারির হাজারো রকম ফ্যাচাং তার ওপর স্ত্রী নির্মলার কাঁদুনি। আর সর্বোপরি ছেলে-মেয়েদের ব্যাকুল আহ্বান তাকে টেনে নিয়ে এলো রাধানগরে পুণ্যতীর্থ কাশীধাম থেকে।

গৌরীশংকর এখন রীতিমত ভক্ত সাধক হ'য়ে উঠেছে যেন। সংসারের বন্ধন আর ভালো লাগে না তার। জপ তপ পূজা অর্চনা নিয়ে থাকতে পারলেই ভালো থাকে যেন। কিন্তু প্রতিবন্ধক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে এই পোড়া সংসার।

বিষয় বিষ থেকে কবে যে মুক্তি পাবে সে।

সেদিন সকালে সেরেস্তায় বসে প্রৌঢ় গোমস্তা করালীচরণ এবং নতুন দেওয়ান প্রবীণ হরিবল্লভবাবুর সঙ্গে সেই বিষয়েরই আলোচনা করছিল গৌরী।

—ভালো লাগে না আর বুঝলে করালীদা'—এ সব বাজে বৈষয়িক কাজে সময় নষ্ট করতে আর ভালো লাগে না। কী লাভ বলো না? এ সব তো আর আমার সঙ্গে যাবে না। কী বলেন হরিবল্লভবাবু?

সলজ্জ হাসি হেসে হরিবল্লভ বললেন: তা তো বটেই! তবে এরও তো প্রয়োজন আছে।

—কিছু না, কিছু না, হরিবল্লভবাবু এসব কিছু না। এর কোনো

প্রয়োজন নেই। এই সব স্ত্রী পুত্র পরিবার, বিষয় সম্পদ এর কিছুই কোনো কাজে লাগবে না। ভগবান এই সব দিয়ে মায়ার বন্ধন সৃষ্টি ক'রে আমাদের পরীক্ষা করছেন মাত্র। এ বন্ধন যে কাটাতে পারে সেই তো ধন্য।

—কিন্তু জীবন রক্ষাও তো মানুষের ধর্ম!

মনিবের পানে তাকিয়ে বেশ সম্ভ্রম আর বিনয়ের সঙ্গেই হরিবল্লভ বললেন: আমাদের কর্তব্যবুদ্ধি যাচাই করবার জন্যেই ভগবান এই সমস্ত মায়ার বন্ধন সৃষ্টি করেছেন বলেই আমার ধারণা। কর্তব্যে অবিচলিত থেকে—স্ত্রী পুত্র পরিবার, আশ্রিত পরিজনদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা ক'রে, দান ধ্যান প্রভৃতি ব্যাপারে ঐশ্বর্যের যথাযথ সদ্ব্যবহার ক'রে, যদি আপনি শেষ দিন পর্যন্ত ভগবানে স্থির মতি রাখতে পারেন, তাহলেই আপনার শিরে ভগবানের অকুণ্ঠ আশীর্বাদ ঝরে পড়বে।

একটু থেমে বললেন: রামকৃষ্ণ দেব বলেছেন—সংসারে থাকবে, সাংসারিক সমস্ত কর্তব্যই করবে কিন্তু জড়িয়ে পড়ো না। মনটাকে সংসারের ঊর্ধ্বে ভগবানের চিন্তায় নিবিষ্ট রাখবে। পাঁকাল মাছ যেমন পাঁকের ভেতর থাকে অথচ গায়ে পাঁক লাগে না, সংসারে তেমনি করেই অনাসক্তভাবে বাস করবে।

চমকে উঠলো করালীচরণ।

বিস্মিত গৌরী ভ্রুকুটি করলে।

হরিবল্লভ তাদের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন:

—কিছু মনে করবেন না। আপনার সঙ্গে আমার এ সব বিষয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়—

—কেন না?

—হাজার হলেও আপনি মনিব—আপনি—

করালী তাঁর অসমাপ্ত কথার মাঝেই বলে উঠলো: কিন্তু হরিবাবু আপনি এতো সব জানলেন কী ক'রে? এই তো মাত্র বছর চারেক

এখানে কাজ করছেন। আমাদের কর্তাবাবুকে বোধ হয় কোনোদিন চাক্ষুষ দেখেনও নি?

—না। কিন্তু তাতে এসব কথা না জানবার কারণ কী থাকতে পারে?

সবিস্ময়ে করালীর দিকে চাইলেন হরিবল্লভ।

—অন্য কিছু নয়। আমাদের কর্তাবাবু যে সব কথা বলতেন আপনিও ঠিক তাই বলছেন কিনা!

—অ।

হাসলেন হরিবল্লভ।

হরিবল্লভ রায় ভবানীশংকরের শ্বশুরের বন্ধু। একসময়ে তিনিও শহরের আদালতে ওকালতী করতেন। আইনজ্ঞান তাঁরও যথেষ্টই আছে। কিন্তু মুখের জোর না থাকায় পশার হয়নি। সেইজন্যে তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ ওকালতি ছেড়ে দিয়ে কোন এক জমিদার সেরেস্তায় নায়েবী করতেন। কিন্তু সেখানে বিশেষ সুখে ছিলেন না। রাধানগরের জমিদার সেরেস্তার বৃদ্ধ দেওয়ান ত্রিলোচন রায়ের মৃত্যুর পর ভবানীর শ্বশুরের আহ্বানেই তিনি সে চাকুরি ছেড়ে দিয়ে এখানে যোগ দেন। সে আজ বছর তিন চার পূর্বের কথা।

ত্রিলোচনের মৃত্যুর পর জমিদারিতে বেশ কিছুটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। হরিবল্লভ দেওয়ানী ভার গ্রহণ করেই অল্পদিনের মধ্যে সে অবস্থা আয়ত্ত ক'রে নেন এবং শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন।

হরিবল্লভ নিরহংকারী সাধু প্রকৃতির মানুষ। তা ছাড়া তাঁর মনটিও অতিশয় কোমল। মানুষকে দুঃখ দিতে পারেন না তিনি। নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও পরের ভালো করার প্রবৃত্তি তাঁর মধ্যে প্রবল। মাত্র এই কয় বছরের মধ্যেই রাধানগর জমিদারিতে প্রজা-সাধারণের মনে তিনি একটি বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে নিয়েছেন।

সেরেস্তার নিম্নপদস্থ কর্মচারী থেকে আরম্ভ ক'রে প্রজা-সাধারণ সকলেই তাঁকে ভালোবাসে শ্রদ্ধা করে।

গৌরীশংকরও তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে। তাঁর ওপর বিষয় সম্পত্তির ভার দিয়ে সে-ও বেশ নিশ্চিন্ত আছে। গৌরী অনেক কথাই তাঁর সম্বন্ধে শুনেছিল। শুনেছিল তিনি পণ্ডিত মানুষ, জমিদারি রক্ষার কাজে তাঁর দক্ষতার তুলনা হয় না। আরো শুনেছিল অনেক কথা, কিন্তু তিনি যে এমন ধর্মপ্রাণ মানুষ সেকথা শোনেনি। তাই তাঁর কথা শুনে একটু বিস্ময় বোধ করলে।

অনেকক্ষণ নীরবে তাঁর দিকে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে বললে: আপনার কথা ঠিকই—আমার বাবাও ঠিক এই উপদেশই দিতেন, কিন্তু আমার ভালো লাগে না সংসার। কেবলই মনে হয় সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে পালাই। কাশীতে এ ক' মাস বড় শান্তিতে ছিলুম।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস মোচন ক'রে বললেঃ হতভাগা ভবানীটা আজ যদি থাকতো—আপনাকে সত্যি বলছি হরিবাবু, আমি তাহলে তার ঘাড়ে সব চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে কাশীবাস করতুম মায়ের সঙ্গে। হতভাগা আমার সব দিকে সর্বনাশ ক'রে গেছে।

পুনরায় একটা নিশ্বাস পরিত্যাগ করলে সে এবং চক্ষু বুজিয়ে কাশীবাসের দিনগুলি বোধ হয় চিন্তা করতে লাগলো।

হরিবল্লভ যেন একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ চমকে উঠলেন করালীর কথায়।

করালী বললেঃ এই বংশের ছেলে কী ক'রে যে অমন হ'ল! আপনি আমাদের ভবানীকে দেখেননি হরিবাবু না?

—অ্যাঁ! ভবানীকে? হ্যাঁ দেখেছি বইকি। অনেকবার দেখেছি। তার বিবাহের দিনও আমি উপস্থিত ছিলাম। বাস্তবিক ছেলেটি যেন বংশ ছাড়া হ'য়ে গেছে।

—বংশ ছাড়া মানে?

গৌরী বললেঃ ও আমাদের বংশের কলঙ্ক। ওকে ভালো করার জন্যে কী কম চেষ্টা করেছি হরিবাবু! কিন্তু সবই নিরর্থক।

ওর জন্যে বাপ-মার কাছে পর্যন্ত মিথ্যাবাদী হ'তে হয়েছে আমাকে। কি করালী হয়নি ?

—সে কথা আর কে অস্বীকার করছে বড়বাবু! আপনি তার জন্যে যা করেছেন—কোনো ভাই তা করে না।

—ওই শুনুন হরিবাবু। আপনাকে কী বলবো বাঁদরটার জন্যে আমার মনে এতোটুকু শান্তি নেই। আজ আমার মাকে ঘর সংসার ফেলে কাশীতে পড়ে থাকতে হয় কেন? শুধু ওই বাঁদরের জন্যে।

উত্তেজনায় মুখ চোখ লাল হ'য়ে উঠলো গৌরীশংকরের। বার দুই কেশে গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বললেঃ আমাদের সংসারটাই মাটি হ'য়ে গেল ওর পাপে। আপনি বললে বিশ্বাস করবেন না—ছোঁড়াটার ওপর আমার আর এতোটুকু মায়া নেই। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় যেখানে আছে গিয়ে আচ্ছা ক'রে ঘা কতক দিয়ে আসি।

করালী একটা নিশ্বাস মোচন ক'রে বললেঃ অমন ক'রে যে উচ্ছন্ন যাবে ছোটবাবু কেউ ভাবতেই পারেনি। ও রকম পরমাসুন্দরী সতী-সাধ্বী স্ত্রী থাকতে—আবার শোনেন নি বোধ হয় বড়বাবু? ছোটবউমার কাছে ভোগা দিয়ে অনেক টাকা নিয়ে গেছে ?

—কেন শুনবো না। আরে বাপু, সেই টাকা দিয়েই তো থিয়েটার খোলা হ'য়েছে। শুনছি নাকি আজকাল বেশ পয়সা ক'রে ফেলেছে।

হরিবল্লভ মাথা নিচু ক'রে বসে বসে শুনে যাচ্ছিলেন তাদের উভয়ের কথাবার্তা, আর মৃদু মৃদু হাসছিলেন।

করালী বললেঃ পয়সা আর ওঁর বুদ্ধিতে হয়নি—হয়েছে অশোকবাবুর জন্যে। উনি তো শিখেছেন শুধু নেশা করতে আর—হুঁ! লজ্জা সরম বলতে কী কোনো বস্তু থাকতে নেই শরীরে! সকালে উঠে যার বাপের নাম করলে দিন ভালো যায়—সে কি না কতকগুলো যাচ্ছেতাই নষ্ট মেয়ে ছেলে নিয়ে—

—বলো না করালী, বলো না! হতচ্ছাড়ার নাম শুনলেও প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

একটু থেমে একটা সশব্দ নিশ্বাস পরিত্যাগ ক'রে গৌরী বললে: যাক্ গে—উচ্ছন্ন যাক্! আমার আর কী। ভালো ভাবে যদি তুই থাকতিস—বাবা যা ক'রে গেছেন, গেছেন। কিন্তু আমি কি তোকে বঞ্চিত করতে পারতুম! কখনোই পারতুম না।—হ্যাঁ, ভালো কথা—

হঠাৎ করালীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে: বউমার খবর কী করালী? অনেকদিন তাঁর কোনো চিঠিপত্র না পেয়ে মা বেশ উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়েছেন। আমাকে পই পই ক'রে মা বলে দিয়েছেন তাঁর খবর নিয়ে যেন পত্রপাঠ চিঠি দিই।

—বউমা ভালো আছেন। কদিন আগে শুনেছিলুম, তিনি কোলকাতা থেকে আসবেন—এয়েছেন কি না বলতে পারি না! আজকাল বউমা কোলকাতাতেই থাকেন কিনা। সেখানে একটা বড বাড়িও কিনেছেন।

একজন ভৃত্য এই সময় কতকগুলি ডাকের চিঠি এবং একদিন আগের খান তিনেক দৈনিক পত্রিকা এনে গৌরীর সামনে রেখে দিয়ে গেল।

—আজকাল ডাক আসতে এতো দেরি হয়?

গৌরী চিঠির তাড়াটা টেনে নিলে।

কাছারির কাজ শেষ ক'রে সবে মাত্র বাইরে পা দিয়েছে গৌরী, খবর এলো—ইস্টিশানে বসুমতী দেবী এসে অপেক্ষা করছেন, এখুনি তাঁকে আনবার ব্যবস্থা করা হোক।

খবরটা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লো গৌরী। চোখ দুটো বিস্ময়ে ঠেলে বেরিয়ে আসবার মতো হ'ল।

ব্যাপারটা সত্যিই অভাবনীয়। এখনো একঘণ্টা পুরো হয়নি, সে

বসুমতী দেবীর চিঠি পেয়েছে। ছোট বউমার সংবাদ দিতে বিলম্ব হওয়ায় তিনি রাগ ক'রে চিঠি দিয়েছেন। এখনো সে চিঠি তার হাতে। এর মধ্যে তাঁর আসবার কোনো কথাই তো লেখা নেই। এমন কী তার এতোটুকু আভাস পর্যন্ত নেই। আর অকস্মাৎ—

নাঃ, ব্যাপারটা নিশ্চয় ঘোরালো রকম কিছু হবে।

স্বল্পক্ষণের মধ্যেই নিজেকে প্রকৃতিস্থ ক'রে নিয়ে চেঁচামেচি জুড়ে দিলে গৌরী : পালকি—পালকি—এই কে আছিস, শিগগির পালকি ঠিক কর। ভূতো, ভূতো—ব্যাটা থাকো কোথায়? শিগগির বাড়ির ভেতর বলে আয় মা এসেছেন! আচ্ছা, তাহলে করালী তুমি আর দেরি কোরো না—পালকি নিয়ে বেরিয়ে পড়ো। না থাক, তোমার গিয়ে কাজ নেই আমিই যাচ্ছি।

হন্তদন্ত হ'য়ে অন্দরের দিকে চলে গেল গৌরী। কী কাজে গেল সেই জানে। মুহূর্ত মধ্যে আবার ফিরে এলো এবং তেমনি ব্যস্ততার সঙ্গে বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে গেল—ইস্টিশানের উদ্দেশে—মাকে আনতে।

মাকে নিয়ে যখন বাড়ি ফিরলো তখন বেলা আর বেশি নেই। পথে আসতে আসতেই মায়ের এই আকস্মিক আবির্ভাবের হেতু অবগত হয়েছিল সে।

মা স্বপ্নাদিষ্ট হ'য়ে ফিরে এসেছেন। ক'দিন পূর্বে এক রাত্রির শেষ—অর্থাৎ ভোর রাত্রে তিনি নাকি স্বপ্ন দেখেছেন। দেখেছেন এক অতি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। দাঁড়িয়ে বলছেন : বসুমতী, এ কাশীবাসে তোমার পুণ্যার্জন হ'চ্ছে না। তুমি ভুল করছো—তোমার উচিত বাড়ি ফিরে যাওয়া, এবং সেখানে একটি শিবালয় প্রতিষ্ঠা করা। তোমার অর্থ বল আছে—লোক বল আছে, এ কাজ তোমার পক্ষেই সম্ভব।

তা ছাড়া আমি তোমাদের মৌগাছির ডাকুরবাদার জলের তলায় ছ' মাস বড় কষ্টে থাকি। আমার পূজা হয় না—আরতি হয় না।

বাকী যে ছ' মাস পূজারতি হয় তাও নিতান্ত ব্যবসাদারী দেবার্চনা। ডাকুরবাদার মূর্তির মতো আমার আর একটি মূর্তি রাধানগরে তোমাদের বাড়ির দক্ষিণ দিকে যে পোড়ো মাঠটা পড়ে আছে সেইখানে মাটির তলায় চাপা পড়ে আছে। সন্ধান ক'রে সেই মূর্তি তুলে নিয়ে তোমাদের বাড়ির সামনের বাগানে একটি ভালো মন্দির তৈরি ক'রে প্রতিষ্ঠা করো এবং যথাযোগ্য পূজার্চনার ব্যবস্থা করো। আর প্রতি শিবরাত্রে—সেই বিগ্রহকে ডাকুরবাদার কাল-ভৈরবের পাশে নিয়ে গিয়ে উভয় মূর্তির এক সঙ্গে পূজার ব্যবস্থা করবে এবং চড়ক সংক্রান্তি পর্যন্ত সে পূজা চালু রাখবে। তাহলেই তোমার কাশীবাসের অধিক পুণ্য হবে। আর বিগ্রহের পরিচর্যার ভার দিও তোমার ছোট বউমা অনুরাধার ওপর। সে পরম সাধ্বী। তোমাদের সংসারের কল্যাণ হবে তাতে। ভবানীরও সুমতি হবে।

কথাগুলি বলেই মুহূর্তে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন ব্রাহ্মণ। বসুমতী দেবীরও ঘুম ভেঙে গেল।

এরপর আর একদিনও দেরি করেননি বসুমতী—এখানে চলে এলেন। উদ্দেশ্য সেই স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী কাজ করা।

সংবাদটি গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে বেশি দেরি হ'ল না। চারিদিকে একটা সাড়া পড়ে গেল।

মাস কয়েকের মধ্যেই বাড়ির সামনের বাগানে এক সুদৃশ্য এবং বৃহৎ দেবালয় গড়ে উঠলো।

দক্ষিণের প'ড়ো মাঠে খুঁড়তে খুঁড়তে এক প্রকাণ্ড জলাশয়ই খুঁড়ে ফেলা হ'ল। কিন্তু মূর্তি পাওয়া গেল না। নিশ্চয় কোথাও কোনো খুঁৎ হয়েছে। এই ভেবে বসুমতী দেবী প্রায় আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করলেন।

অবশেষে একদিন রাত্রে পুনরায় স্বপ্নাদেশ হ'ল বসুমতী দেবীর।

তিনি স্বপ্নে দেখলেন—পূর্বদৃষ্ট সেই অপরূপ সুন্দর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে। তাঁর দেহ হ'তে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হ'চ্ছে চৌদিকে। দীর্ঘায়ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অপার্থিব প্রশান্তি। অধরে প্রসন্ন হাস্য। কী মহিমময় রূপ! চোখ ফেরাতে পারলেন না বসুমতী।

ব্রাহ্মণ তেমনি মধুর গম্ভীর স্বরে বললেন: তোমার ভুল হয়েছে বসুমতী। এ ভাবে অনুসন্ধান করলে সারা জীবনেও তুমি মূর্তি আবিষ্কার করতে পারবে না। লোক দিয়ে এ কাজ হবে না। সংগোপনে এ কাজ তোমাকেই নিজের হাতে করতে হবে। আগামী পূর্ণিমার দিন রাত্রি বারোটায় স্নান ক'রে, শুদ্ধচিত্তে, মহারুদ্রের নাম জপ করতে করতে তুমি একাকী গিয়ে যথাস্থানে সন্ধান কোরো —মূর্তি পাবে।

ব্রাহ্মণ অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন!

বসুমতী দেবীর নিদ্রা ভেঙে গেল. তিনি ধড়মড় ক'রে বিছানার ওপর উঠে বসলেন। উত্তেজনায় তাঁর সর্বশরীর কাঁপছে। দেয়ালগিরির ক্ষীণালোকে ঘরের চারিদিকে তিনি ত্রস্ত চোখে তাকিয়ে দেখলেন —কেউ কোথাও নেই। কিন্তু তখনো ঘরের বাতাস সুরভিমণ্ডিত হ'য়ে আছে যেন।

রাত্রি তখন কতো কে জানে। খোলা জানলা দিয়ে বাইরে দৃষ্টিপাত করলেন বসুমতী।

পূর্বাকাশে তখন ঊষার স্নিগ্ধ স্বপ্নালোক! রাত্রির তমিস্রা ধীরে ধীরে দিনের আলোকের বুকে আত্মসমর্পণ করতে শুরু করেছে।

কী অপূর্ব দৃশ্য! চোখ ফেরাতে পারলেন না বসুমতী।

তারপর নির্দিষ্ট পূর্ণিমার রাত্রে তিনি শুদ্ধাচারে মহারুদ্রের নাম জপ করতে করতে মূর্তি আবিষ্কারে গেলেন এবং অতি অল্পায়াসে মূর্তি আবিষ্কার করলেন। মূর্তি যেন তাঁরই প্রতীক্ষায় ছিল।

যেস্থান ইতিপূর্বে সংখ্যাতীত বার সন্ধান করা হয়েছে—পাওয়া যায় নি কিছু। যেস্থান খনন করতে করতে একটা প্রকাণ্ড জলাশয়েরই

সৃষ্টি হ'য়ে গেছে—তবুও পাওয়া যায় নি। আর কি আশ্চর্য! বসুমতী দেবী গিয়ে যেমনই সেই খাদের একস্থানে হাত দিয়েছেন অমনি তাঁর হাতে উঠে এলো এক অপূর্ব কারুকার্য বিশিষ্ট শিব মূর্তি!

এ মূর্তি অবিকল ডাকুরবাদার মহাকালের মূর্তির মতো। এতোটুকু পার্থক্য নেই কোথাও।

উল্লাসে দিশাহারা হ'য়ে গেলেন বসুমতী।

মূর্তিটিকে বুকে চেপে ধরে অনেকক্ষণ সেইখানে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর বাড়ি ফিরে গৌরীকে ডাকলেন এবং নব নির্মিত মন্দিরে গিয়ে বিগ্রহ যথাস্থানে স্থাপন করলেন।

॥ বারো ॥

আজ কদিন ধরে এমন বাদলা শুরু হয়েছে যে বাইরে বেরুনো চলে না। চারিদিক প্যাচ প্যাচ করছে। এক পশলা তেড়ে বৃষ্টি হ'য়ে থেমে যা—তা নয়! দিবারাত্রি টিপটিপিনির আর বিরাম বিশ্রাম নেই।

বর্ষা মোটেই পছন্দ করে না অনুরাধা। বর্ষাকালে পাড়াগাঁয়ে থেকেও সুখ নেই—কোলকাতায়ও না। কোলকাতার আবার সব এমন রাস্তা আছে যেখানে পাঁচ মিনিট জল হ'লেই, বাস্—রাস্তা ডুবে গেল। গাড়ি ঘোড়া সব বন্ধ।...

ভবানীপুরে রসা রোডের ওপরই অনুরাধার বাড়ি। তিন তলা নতুন বাড়ি। কিছুদিন হ'ল নিজেই পছন্দ ক'রে এই বাড়িখানি কিনেছে অনুরাধা। কিনেছে নিজে বাস করবে বলে। দেশে কিছুতেই আর মন টেঁকে না তার। কী যেন একটা বিরাট শূন্যতায় সদাসর্বদা মনটা খাঁ খাঁ করতে থাকে তার দেশের বাড়িতে।

শ্বশুর বাড়িতেও মন টেঁকে না—বাপের বাড়িতেও না। বিশেষ

ক'রে বাবা মারা যাবার পর আর থাকতে পারলে না সে দেশে। কোলকাতায় চলে এলো। কোলকাতায় চলে আসার মধ্যে আরো একটা উদ্দেশ্য আছে তার। উদ্দেশ্য মনপ্রাণ দিয়ে সে সংগীত সাধনা করবে। গাঁয়ে ঘরে সে সাধনার অনেক বাধা।

ভগবানের অভিসম্পাতে যে জীবনকে বরণ করতে বাধ্য হয়েছে সে সেই জীবনের দীর্ঘ ভার বহন করবার জন্যে একটা অবলম্বনের প্রয়োজন। সংগীতকেই সেই অবলম্বন ক'রে নিয়েছে সে। গানের মধ্যেই প্রাণের সমস্ত দুঃখ ডুবিয়ে দিতে চায় এবং তারই সাধনায় মনপ্রাণ সমর্পণ ক'রে দিয়েছে।

আর এই কোলকাতায় বাসের মধ্যে আরো একটা গোপন আশা ঘোরা ফেরা করে তার মনের তলায়। আশা হয়তো একদিন সহসা কোথাও ভবানীর সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলেও যেতে পারে। ভালো ক'রে গান শিখে সে রেডিওএ গাইবে, রেকর্ড করবে—বড় বড় ফাংশানে গাইতে যাবে। তখন তার গানের খ্যাতি শুনে যদি কোনো দিন কোনো এক শুভ মুহূর্তে ভবানী তার গান শুনতে আসে! আসাটাও তো বিচিত্র নয়। তখন হয়তো—হয়তো—

ভাবতে ভাবতে তন্ময় হ'য়ে যায় অনুরাধা।

অনেকবার সে ভেবেছে, এই তো কোলকাতাতেই ভবানীর থিয়েটার 'বাণীশ্রী'—একবার গেলে হয় না! কিন্তু পর মুহূর্তে কঠিন বলে মনের সে ইচ্ছা দমন ক'রে নিয়েছে সে। দমন ক'রে নিয়েছে এই ভেবে যে, যদি সেখানে তার অসম্মান ঘটে। যদি ভবানী অপমান করে তাকে—না চেনার ভান করে!

তাছাড়া, অশোক তাহলে ভয়ানক রাগ করবে। অশোক পই পই ক'রে নিষেধ ক'রে দিয়েছে।

বলেছে—সে পাপের রাজ্যে যেন ভুল করেও সে কোনো দিন না যায়। সেখানে সম্মান থাকবে না তার। আরো শুনেছে—সেখানে কী অবস্থায় ভবানী বাস করে। ভবানী আর মানুষ নেই, সে পশুর

স্তরে নেমে গেছে। দিবারাত্রি মদ আর মেয়েমানুষ নিয়েই তার দিন কাটে।

উল্লাসীর কথাও অজানা নেই অনুরাধার। সেই সার্কাসের মেয়ে উল্লাসী অকস্মাৎ দুস্ট গ্রহের মতো আবির্ভূত হ'য়ে ভবানীর সমস্ত শুভ বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন ক'রে দিয়েছে! উল্লাসীকে ছেড়ে ভবানী নাকি এক মুহূর্তও থাকতে পারে না।

টাকার প্রয়োজন এখন আর ভবানীর নিশ্চয়ই নেই। থাকলে অবশ্যই তার কাছে আসতো এবং এলে সে তাকে ফেরাতো না—এ কথাও ঠিক। থিয়েটার এখন ভবানীর ভালোই চলছে হয়তো! এখন আর অর্থের জন্য ভাবতে হয় না!

কেমন আছে এখন ভবানী কে জানে! ভয়ংকর দেখতে ইচ্ছে ক'রে ভবানীকে অনুরাধার। মাঝে মাঝে মনে হয়—যা হয় হোক—একবার গিয়ে দেখে আসবে সে ভবানীকে। অপমান; হ'লই বা অপমান। স্বামীর কাছে অপমানে লজ্জা কী!

কয়েকবার 'বাণীশ্রী'র উদ্দেশে রওনাও হয়েছিল—কিন্তু মাঝ পথ থেকে ফিরে এসেছে। বার দুই একেবারে বাণীশ্রীর দোর গোড়া থেকে ফিরে এসেছে—ঢুকতে পারেনি। কে যেন জোর ক'রে ফিরিয়ে দিয়েছে তাকে।

মনে আছে তার শেষ যে বার ফিরে আসে সেখান থেকে, সেইবার ক্ষণকালের জন্যে দেখা হয়েছিল ভবানীর সঙ্গে। কিন্তু ভবানী না চেনার ভান ক'রে মুখ ফিরিয়ে চলে গিয়েছিল অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে গল্প করতে করতে। ভবানী তখন প্রকৃতিস্থ ছিল না বোধ হয়। হাবভাব দেখে সেই রকমই অনুমান হয়েছিল তার।

তখনও সন্ধ্যার বিলম্ব ছিল। থিয়েটার আরম্ভ হ'তে অনেক বাকী। অনুরাধা থিয়েটার বাড়ির স্বল্প দূরে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ভাবছিল—অতঃপর কী করণীয়? থিয়েটার দেখতে ঢুকবে কি না একখানা টিকিট কেটে?

ঠিক এমনি সময় তার সামনে একখানা মোটর এসে দাঁড়ালো। টর থেকে নামলো ভবানী। কী বিশ্রী চেহারা হ'য়ে গেছে! দেখে যেন কান্না পেলো তার। মুখে একটা সিগারেট। একটা মেয়ের কাঁধে হাত দিয়ে গাড়ি থেকে নামলো সে। অনর্গল অশ্লীল অশ্রাব্য ভাষা বলতে বলতে নামলো।

নেমে টলতে টলতে থিয়েটার বাড়ির মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। যাবার পূর্বে একবার অনুরাধার দিকে চোখ পড়ে যেতে মনে হ'ল যেন কেমন চমকে উঠেছিল সে। নিশ্চয় চিনতে পেরেছিল তাকে। ভ্রু দুটো একবার কুঁচকেও গিয়েছিল তার। তারপর একটা বিশ্রী শব্দ উচ্চারণ ক'রে ত্বরিতে মুখ ফিরিয়ে চলে গিয়েছিল।

ঘৃণায় লজ্জায় আর সেখানে থাকতে পারেনি অনুরাধা—চলে এসেছিল পর মুহূর্তেই।

সেই থেকে আর ওপথ মাড়ায়নি সে। কিন্তু তবুও তো ভুলতে পারেনি সে—ভুলতে পারেনি ভবানীকে! ভবানী যতোই তাকে জোর ক'রে দূরে ঠেলে দিচ্ছে সে ততোই যেন আঁকড়ে ধরতে চাইছে তাকে। মন তার অনুক্ষণ ভবানীর পাশে পাশে বিচরণ ক'রে মরছে। কিছুতেই তৃপ্তি নেই, কিছুতেই শান্তি নেই। এ যাবৎ ভবানীকে ভোলবার বহু চেষ্টাই তো করলে, কোনো ফল কি হয়েছে? হয়নি।

কতো তীর্থ পর্যটন করলে। কতো নতুন নতুন মানুষের সংস্পর্শে এলো। জীবনের কতো পরিবর্তন ঘটাল। গ্রাম থেকে মহানগরী কোলকাতায় এসে বাসা বাঁধল। কিন্তু কিছুতেই কিছুই হ'ল না তো? মনটাকে ভুলিয়ে রাখবার জন্যে সংগীত সাধনায় মনোনিবেশ করলে। বহু আয়াসে পুরাতন সংগীত গুরু বামদেব মিশ্রর সন্ধান ক'রে, প্রচুর দক্ষিণা কবুল ক'রে তাকে এখানে নিয়ে এলো। এখানে নিয়ে এসে গভীর মনোযোগের সঙ্গে সংগীত শিক্ষা শুরু করলে। ভাবলে সংগীত সাধনার অতলে ডুব দিয়ে বিশ্বসংসার ভুলে যাবে সে—ভুলে যাবে ভবানীকে। নতুন জীবনের নতুন আলোক ধারায় পুরাতনকে হারিয়ে

দেবে। ভাসিয়ে দেবে। কিন্তু পারলে না। ভবানীর চিন্তা মন থেকে সরাতে পারলে না। কিছুতেই পারলে না। অবশেষে অনেক চিন্তার পর অশোকের স্মরণাপন্ন হ'ল সে।

অশোককে পত্রপাঠ তার কাছে আসবার জন্যে আহ্বান জানালে। উদ্দেশ্য কী তা সে নিজেই জানে না। তবে বোধ হয় অশোকের কাছে স্বামীর সংবাদ সংগ্রহ কিংবা কি করলে স্বামীর মনস্তুষ্টি ঘটিয়ে স্বামীর সঙ্গে মিলনের পথ পরিষ্কার করা যায় তারই পরামর্শ!

একটা ইচ্ছার অঙ্কুর উদ্‌গম হয়েছে তার মনের মাটিতে—অভিনেত্রীর জীবন শুরু করলে কেমন হয়? তাতে হয়তো ভবানীর দৃষ্টি পড়লেও পড়তে পারে তার প্রতি। হয়তো ঘনিষ্টতাও সম্ভব হ'তে পারে!

অশোক তার পত্র পেয়ে যথা সময়েই আবির্ভূত হয়েছে এবং তার বাঞ্ছনার কথা শুনে হেসেছে। হেসে বলেছে: অসম্ভব কল্পনাকে মনে স্থান দিয়ে লাভ নেই বউদি। শুধু এইটুকু জেনে রাখো—তোমার সাধনা ব্যর্থ হবে না—হতে পারে না। ভবানীকে একদিন তোমার কাছে আসতেই হবে।

কিন্তু সে একদিন কবে?

একটা কথা আজ ক'দিন ধরে অনবরত ভাবছে অনুরাধা, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছে না। ক'দিন ধরে কেবলই ভাবছে কথাটা একবার খোলসা ক'রে জিজ্ঞাসা করবে অশোককে। পারছে না। কেমন যেন সংকোচ—অহেতুক সংকোচ তাকে বাধা দিচ্ছে—তার মুখ চেপে ধরছে। অথচ এ সংকোচ কেন তাও বুঝতে পারে না সে। নিজের স্বামীর শুভাশুভ জিজ্ঞাসা করা নিশ্চয় অপরাধ নয়? তা ছাড়া আরো একটা সন্দেহ তার মনের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

সন্দেহটা অশোক সম্বন্ধে।

অশোক তার চিঠির ডাকে সেই যে এসেছে—আর যেতে চাইছে না কেন? নিশ্চয় কোথাও কোনো গণ্ডগোল ঘটে থাকবে। আচ্ছা ভবানীর কোনো অনিস্ট হয়নি তো! তার থিয়েটার ঠিক চলছে তো? অশোক ঝগড়া ঝাটি ক'রে চলে এলো কি না তাই বা কে জানে!

এমনি নানা দুশ্চিন্তায় কদিন অতিবাহিত হবার পর একদিন স্পষ্টই জিজ্ঞাসা ক'রে ফেললে অনুরাধাঃ ঠাকুরপো, ব্যাপারটা কী সত্যি ক'রে বলো দিকি?

—কিসের ব্যাপার বউদি?—

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল অশোক অনুরাধার মুখের পানে।

অনুরাধা বললেঃ তোমাদের থিয়েটারের ব্যাপার?

অশোক হাসল। হেসে বললেঃ থিয়েটার যথা রীতি চলছে। তবে সে থিয়েটারের সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ নেই।

—সম্বন্ধ নেই কেন?

—আমি থিয়েটার ছেড়ে দিয়েছি। আর ওমুখো হবো না।

ভুরু দুটো কুঁচকে গেল অনুরাধার। খানিকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে অশোকের দিকে চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলেঃ তাহলে কী করবে এরপর—বায়োস্কোপে নাব্‌বে?

—না। অভিনয়ই আর করবো না। ও আর আমার ভালো লাগে না।

—কী আশ্চর্য! অথচ কিছুদিন আগেও তুমি বলেছ—অভিনয়ই তোমার প্রাণ! অভিনয়ে না ক'রে তুমি থাকতে পারো না।

—সে কথা মিছে নয়। শুধু আমি কেন বিশ্বসংসারের কেউ-ই বিনা অভিনয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। সারা জীবনটাই তো অভিনয় বউদি! সংসারের রঙ্গমঞ্চে আমরা সব সময়েই তো অভিনয় করছি। এর ওপর আবার শখড়তি অভিনয় কেন? এখন থেকে সোজা সরল জীবন যাপন করার চেষ্টা করবো।

হঠাৎ অনুরাধার অধরে একটু হাসি ফুটে উঠলো।

—তাহলে কি ঠাকুর-পো এবার বিয়ে থা ক'রে একটি সংসা পাতবে মনস্থ করেছ ?

—আরে দূর !

হেসে ফেললে অশোক।

—ও বাসনা আমার মোটেই নেই। ওতো সেই অভিনয়ে তাঁতাতেই ঘোরার শামিল। আমি আমার জীবনের প্রোগ্রাম ঠি ক'রে ফেলেছি।

—কী ঠিক করেছ ?

—এবার একটা নতুন জীবন শুরু করবো! ভ্রাম্যমান-জীবন তীর্থপর্যটনে বেরুবো। আর অবসর সময়ে সংগীত চর্চা করবো গুরুজীর সঙ্গে কথাবার্তা পাকা হ'য়ে গেছে।

গুরুজীও কী তোমার সঙ্গী হবেন নাকি ?

—না না। গুরুজীকে সঙ্গী ক'রে কী শেষে বুড়ো নেরে খুনে দায়ে পড়বো! আমি একাই বেরুবো। ঘুরতে ঘুরতে যখন ক অবসাদ অনুভব করবো তখন হয়তো গুরুজীর শরণাপন্ন হলেও হ'তে পারি। ইতিমধ্যে যদি তুমি তাড়িয়ে না দাও তাহলে গুরুজীর কাছে কিছু ভালো ভালো গান শিখে নেব।

—স্বচ্ছন্দে। কিন্তু গুরুজী তো চলে যাবেন শুনছিলুম ?

—হ্যাঁ, চলে যাবেন ঠিকই, তবে তার দেরি আছে। আর আমিও ঠিক করেছি গুরুজীর সঙ্গে সঙ্গেই রওনা দেব।

—আচ্ছা, আচ্ছা। সে যখনকার কথা তখন। এখন আসল ব্যাপারটা বল। তুমি থিয়েটার ছাড়লে কেন ?

সহাস্যে অনুরাধার মুখের দিকে তাকিয়ে অশোক বললে একটা চলতি কথা আছে—'ভবী ভোলবার নয়'! তোমার হয়েছে তাই। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই একই প্রশ্ন, থিয়েটার ছাড়লে কেন? বললুম ভালো লাগলো না তাই ছেড়েছি—না ছাড়লে কেন?

—ওগো তোমার ভয় নেই গো, ভয় নেই ; তোমার কর্তার সঙ্গে লাঠালাঠি ক'রে বেরিয়ে আসিনি। তিনি বেশ বাহাল তবিয়তে নর্মসঙ্গিনীদল পরিবেষ্টিত হ'য়ে কারণ-রস-সেবনে আনন্দ-সাগরে ক্রীড়া করছেন! আজকাল আবার থিয়েটার করবার—অর্থাৎ নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার সাধ প্রবল হয়েছে এবং সেই সঙ্গে পরিচালক হবার ইচ্ছাও হয়েছে। টাকা পয়সা কিছু হাতে জমে গেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমনই হ'য়ে থাকে অবশ্য! আমি থাকাতে তার ইচ্ছার পরিপূরণ হচ্ছিল না। তাই সরে এলুম। তা ছাড়া আমার আর ভালোও লাগছিল না। নিত্য নতুন সাজ সজ্জা ক'রে, মুখে চুন-কালী মেখে সং সাজতে আর ভালো লাগে না।

—কিন্তু—

একটা কেমন দুশ্চিন্তার ছায়া নিবিড় হ'য়ে ফুটে উঠলো অনুরাধার মুখে। কতোক্ষণ নিশ্চুপ থেকে দাঁত দিয়ে আঙুলের নখ কাটতে লাগলো।

তারপর বিমর্ষ ভাবে বললে : কিন্তু ঠাকুর-পো, তুমি ছিলে তবু আমার খানিকটে ভরসা ছিল। এখন কি যে করবে সে!

—সে বিষয় তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো বউদি। আমি থাকতে যা সে করছিল, তার চাইতে বেশি আর কিছু তেমন করবার নেই—করবেও না।

কথা শেষের সঙ্গে সঙ্গেই হেসে উঠলো সে।···

এরই কদিন পরে আবার একদিন এই আলোচনা উঠলো।

অশোক তখন নিবিস্ট মনে একটা ঘরে বসে তানপুরা সহযোগে গুরুজীর কাছে সত্য প্রাপ্ত একটা রাগিনী আলাপ করছিল। আলাপ করছিল গুণ গুণ করেই। অনুরাধা এসে সামনে বসলো।

—ঠাকুর-পো!

অশোক শুনতে পেল না। আস্তে আস্তে গলা ছেড়ে গাইতে আরম্ভ করলে।

অনুরাধা আবার ডাকলে ঃ ঠাকুর-পো ! শুনছো—ঠাকুর পো ।—

কিন্তু ঠাকুর-পোর তন্ময়তা ভাঙলো না। চক্ষু বুজিয়ে সে গেয়ে চললো। প্রায় আধঘণ্টা এইভাবে সংগীত আলাপের পর চমক ভাঙলো অশোকের। চমক ভাঙলো বোধ করি সুরের কোথাও ভুল হ'য়ে যাওয়ায়। জিব কামড়ে চোখ খুলতেই একেবারে অনুরাধার সঙ্গে চোখাচোখি হ'য়ে গেল।

—আরে, বউদি যে—কতোক্ষণ? মুখখানা অমন তিজেলের মতো ক'রে বসে আছ কেন?

—তোমার গান এর চেয়ে ভালো মুখ ক'রে শোনা যায় নাকি আবার?

বিরক্ত মুখে উত্তর দিলে অনুরাধা।

অশোক তানপুরাটা সযত্নে পাশে শুইয়ে রেখে বললে ঃ কী করবো বউদি, সুরটা কিছুতেই মক্‌শো করতে পারছি না। খালি ভুল হ'য়ে যাচ্ছে।

কিন্তু অনুরাধার মুখের পানে তাকিয়ে ভুরু কোচকালে সে।

—হঠাৎ কী হ'ল বউদি, অমন গম্ভীর হ'য়ে গেছ?

অনুরাধা তেমনি বিরক্তির সঙ্গে বললে ঃ হবে আবার কী? সংগীতাচার্য যে বউদির প্রতি লক্ষ্য দিয়েছে এই তো যথেস্ট। একটা কথা বলতে এসে একঘণ্টা হাঁ ক'রে বসে বসে ষাঁড়ের চিৎকার শুনছি।

হাসলে অশোক। হেসে বললেঃ কিন্তু কথাটা তোমার কী বল দিকি? নিশ্চয় ভবানী প্রসঙ্গ?

—কেন, ও ছাড়া কি আর আমার কথা থাকতে নেই?

—আছে হয়তো। তবে বড় একটা থাকে না কিনা তাই বলছি। এখন বক্তব্যটি পরিষ্কার ক'রে বলো দিকি শুনি। এই হাত জোড় ক'রে বসছি আমি।

তার বসার ভঙ্গী দেখে হেসে ফেললে অনুরাধা। বললে ঃ যাও আমি বলবো না। তোমার সব তাতেই খালি ঠাট্টা।—

কৃত্রিম রাগ ক'রে উঠে গেল সে। কিন্তু মুহূর্ত পরে পুনরায় ফিরে এলো। এবং একটু ইতস্তত ক'রে বললে: আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না ঠাকুরপো। আজকাল তো অনেক ভদ্র ঘরের মেয়েরা করে?

—করে, কিন্তু তোমার করা চলবে না।

—কেন চলবে না? আগে কথাটাই সব শোনো। তারপর মন্তব্য কোরো।

—আর শোনবার দরকার নেই—যা বলতে চাইছো, আমি বুঝেছি। ও পথ অত্যন্ত নোংরা পথ। তোমাদের জন্যে নয়। তোমরা মা, তোমরা বোন—তোমাদের আদর্শ ও নয়—। তোমরা জাতি সৃষ্টি করবে—সমাজ সংসারের ক্লেদ গ্লানি ধুয়ে মুছে দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। তোমাদের আদর্শে আকৃষ্ট হ'য়ে ভবানীর দল—ভবানীর সহচরীর দল ছুটে আসবে তোমাদেরই কাছে—তাদের পাপ কলুষিত জীবনের প্রায়শ্চিত্ত করতে। আসবে নতুন জীবনের দীক্ষা গ্রহণ করতে। তোমরাও যদি ওপথে যাও বউদি তাহলে সংসার মরুভূমি হ'য়ে যাবে।

স্থির হ'য়ে শুনে গেল অনুরাধা। কোনো কথা বললে না। কেবল একটা চাপা নিশ্বাস আস্তে আস্তে পরিত্যাগ করলে।

আজ কমাস ধরেই একটা বিরাট দ্বন্দ্ব চলেছে অনুরাধার মনে সংগোপনে। কী করবে সে? ভবিষ্যৎ জীবনের দিনগুলো কোন্ কাজে ব্যয় করবে? এতো কষ্ট ক'রে—প্রাণপাত ক'রে যে সংগীতের সাধনা করলে—কী কাজে লাগাবে তাঁকে? যে আশার গোপন নীড় মনে মনে রচনা করেছিল সে—যার জন্যে গ্রাম ছেড়ে কোলকাতায় বাস করতে এলো, এতো অর্থ ব্যয় ক'রে এই বাড়ি তৈরি করলে, এ'তো তাহলে কোনো কাজেই লাগলো না!

বাস্তবিক কী জীবন অনুরাধার! কী দুর্বহ দুঃসহ এ জীবনের

ভার! যতোদূর দৃষ্টি যায়—এ জীবনে পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে—তার জন্যে এতোটুকু আলো কোথায় নেই।

অশোক আজ সপ্তাহ দুই হ'ল এখান থেকে চলে গেছে। গেছে হরিদ্বারের উদ্দেশে গুরুজী বামদেব মিশ্রের সাথী হ'য়ে।

গুরুজীর ইচ্ছা—জীবনের অবশিষ্ট দিন কটা তীর্থক্ষেত্র হরিদ্বারেই অতিবাহিত করবেন। জনকয়েক ধনী শিষ্য শিষ্যা তার জন্যে কিছু কিছু মাসিক দক্ষিণার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন। অনুরাধাও মাসিক কিছু টাকা দক্ষিণার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সর্বসমেত দক্ষিণার যে প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন গুরুজী তাতে কেবল তাঁর জীবন কেন আরো কয়েকজনের ভরণপোষণ স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারে। এমন কি বিলাসিতা করেও চলে যায়।

গুরুজী তাঁর সঙ্গে অশোক এবং আর একটি শিষ্যকে মা◌ নিয়েছেন। অনেকেই যেতে চেয়েছিল কিন্তু আর কাকেও তিনি সঙ্গে নিতে রাজী হননি। বলেছেন—সাধন ভজনের অসুবিধা হবে।

স্থির হয়েছে অনুরাধা মাঝে মাঝে গিয়ে দু'এক মাস ক'রে থেকে আসবে তার কাছে।

ওরা চলে যাবার পর থেকে খালি বাড়িখানা যেন খাঁ খাঁ করে সমস্ত দিন। এমন বিশ্রী লাগে!

গুরুজী যে ঘরখানায় থাকতেন সেদিকে যেতেই পারে না অনুরাধা। অশোকের ঘরের দিকেও যেতে পারে না।

দিনরাত সংগীতের মধুর গুঞ্জন ধ্বনি যেখানে ধ্বনিত হতো—যেখানে প্রভাতে সন্ধ্যায় ভজন আলাপ শোনবার জন্যে কতো লোক ব্যাকুল আগ্রহে ছুটে আসতো—রাস্তার ধারে ভিড় জমে যেতো—সেখানে আজ প্রচণ্ড স্তব্ধতা বিরাজ করছে। যেতে পারে না অনুরাধা সেদিকে।

মাঝে মাঝে এমন কষ্ট হয় তার যা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

এতোদিন এক রকম কেটে গেছে। বেশ হৈ হৈ করেই

কেটেছে। অশোক যেন তার মনের সমস্ত দুঃখ ভুলিয়ে দেবার জন্যে হাসি দিয়ে, গান দিয়ে ভরিয়ে রেখেছিল সারা বাড়িখানা। সে চলে যাওয়াতেই আরো কষ্ট হ'চ্ছে তার।

ভারী মজার মানুষ অশোক।

সত্যিই অশোকের মতো দেওর পাওয়া, অশোকের মতো বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের কথা।

অশোক বলে, সেও নাকি খুব খারাপ লোক। তারও চরিত্র নাকি ভবানীর চাইতে কোনো অংশে ভালো নয়! অনেক মেয়েকে নরকের পথে নিয়ে গেছে সে।

কিন্তু এ যেন বিশ্বাস হয় না।

অশোকের দ্বারা যে কোনো মন্দ কাজ হ'তে পারে এ যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না অনুরাধা।

বড় ভালো লাগে তার অশোককে। উপায় থাকলে অশোককে আটকে রাখতো সে। যেতে দিতো না। কিন্তু লোক-নিন্দা আর—

আর এখানে থাকতে পারছে না সে। একটা ভারি পাথর যেন তার মনের কণ্ঠ রুদ্ধ ক'রে আনছে। মনটা কেবল পালাই পালাই করছে। কিন্তু কোথায় যাবে?

আচ্ছা কাশীতে শাশুড়ীর কাছে গেলে কেমন হয়? কিংবা রাধানগরে?

রাধানগরের কথাটা মনে পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে তার মনটা কেমন উদাস হ'য়ে যায়। বিয়ের পর থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাগুলো আগাগোড়া যেন জীবন্ত হয়ে ভেসে ওঠে তার মনে। ছাঁদনা তলায় বরবেশী ভবানীকে মনে পড়ে। মনে পড়ে সেই সলজ্জ শুভদৃষ্টির কথা! কিন্তু সেকি সত্যি শুভদৃষ্টি?

এমনি নানা চিন্তায় মনখানা যখন বিক্ষিপ্ত চঞ্চল ঠিক তেমনি সময় একদিন এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটলো।

অকস্মাৎ গৌরীশংকর একদিন এসে উপস্থিত হ'ল এবং

সাড়ম্বরে জননীর মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা—স্বপ্নাদেশের কথা—বহু আয়াসে দেবমূর্তি প্রাপ্তির কথা প্রভৃতি জানালে। জানালে, দেবতা নিজে তাঁর পরিচর্যার ভার দিতে চেয়েছেন অনুরাধাকে।—অনুরাধাকে যেতে হবে। অনুরাধা না যাওয়া পর্যন্ত দেবতার পূজার ব্যবস্থা করা সম্ভব হচ্ছে না। অনুরাধার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আছেন মা বসুমতী।

অবাক বিস্ময়ে গৌরীশংকরের সকল কথা শুনে গেল অনুরাধা। শুনতে শুনতে ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠতে লাগলো সে। একটা অপূর্ব পুলক শিহরণ তার সমস্ত দেহখানাকে নাড়া দিয়ে গেল বার কয়েক।

পৃথিবীর মানুষ যাকে অবহেলায় দূরে সরিয়ে দিয়েছে—দেবতা তারই পরিচর্যা চাইছেন! এতো বড় সৌভাগ্য যে কল্পনাই করা যায় না!

ঝর ঝর ক'রে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো তার। কিন্তু এ জল আনন্দের, না বেদনার?

॥ তেরো ॥

দেখতে দেখতে তিনবার পাক খেয়ে গেল পৃথিবী সূর্যদেবকে।

এই সুদীর্ঘ দিনে কতো এলো, কতো গেল—কতো আনন্দ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো—আবার কতো আনন্দ কান্নায় রূপান্তরিত হ'ল।

আমাদের কাহিনীও নানা উত্থান পতন বিপর্যয়ের পথ অতিক্রম ক'রে আজকের স্তরে উপনীত হয়েছে। কিন্তু তার বিশদ বিবরণের তেমন কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। সে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণের অভাবে কাহিনীর ছন্দপাত হবে বলেও আশঙ্কা হয় না। তবে সংক্ষেপে দু' একটি ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন।

সম্প্রতি মাস ছয়েক হ'ল ভবানীশংকরের বাণীশ্রী থিয়েটার হস্তান্তরিত হয়েছে। বহু চেষ্টা করেও ভবানী তা চালাতে পারলে না। না চলবার হেতু, প্রথমতঃ অশোক, দ্বিতীয়তঃ উল্লাসী অর্থাৎ মালবিকা। সেই সঙ্গে আরো কয়েকজনের অসহযোগিতা উল্লেখযোগ্য —যারা ছিল অশোকেরই একান্ত অনুগত। এরা যেন সকলে দল বেঁধে ভবানীর থিয়েটার বন্ধ ক'রে দিলে। শুধু বন্ধ ক'রে দিলে না— বছর দু'য়েকের মধ্যে ভবানীকে সর্বস্বান্ত ক'রে ছেড়ে দিলে।

অশোকের আকস্মিক অন্তর্ধানের কয়েক সপ্তাহ পরেই উল্লাসীকেও হঠাৎ আর পাওয়া গেল না। সেই সঙ্গে পাওয়া গেল না বাসবকে।

অনেক অনুসন্ধানের পর সংবাদ পাওয়া গেল তারা দুজনে বোম্বে চলে গেছে—কী একটা ছবির বিশেষ ভূমিকায় অভিনয় করতে।

খবরটা পেয়ে ভবানী কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারেনি। তারপর সনিশ্বাসে আপন মনে বলেছিল: বিশ্বাস নেই—কাউকেই বিশ্বাস নেই। সব নিমকহারাম! ওঃ, ওই উল্লাসী—কোথাকার কে—কে-ই বা চিনতো ওকে—ছোটলোকের দলের সঙ্গে গাঁয়ে গাঁয়ে সার্কাস দেখিয়ে বেড়াতো!

—উঃ, কী না করেছি মেয়েটার জন্যে। আমি না থাকলে হয়তো সেই বেঁটে শয়তানটা ওকে খুনই ক'রে ফেলতো। পাঁকের ভেতর থেকে তুলে এনে ওকে রাণীর আসনে বসিয়েছিলুম! এই ভবানীশংকর না থাকলে আজ অভিনেত্রী মালবিকা দেবী কোথায় থাকতো? কোথায় থাকতো আজ বোম্বের চিত্রপুরীর ছবির কনট্রাক্ট?

অসতর্কে দু'ফোঁটা চোখের জলও কখন গড়িয়ে পড়েছিল ভবানীর গাল বেয়ে। জামার হাতায় সে জলটুকু মুছে ফেলে সন্ধ্যার তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলো ভবানী। ভাবতে লাগলো —উল্লাসী কেমন ক'রে এমন কাজ করলে? প্রাণে কী তার একটু মায়া হ'ল না তাকে ছেড়ে যেতে? তাকে এমন ক'রে নিঃস্ব ক'রে

ছেড়ে যেতে পারলে উল্লাসী? তার মান সম্মান—তার অর্থ সম্পদ—তার কর্মশক্তি এমন ক'রে নিঃশেষ ক'রে দিয়ে গেল সে! একটু প্রাণ কাঁদলো না? এক ফোঁটা চোখের জল পড়লো না। যার জন্যে সর্বস্ব হারিয়ে সে সর্বহারা হয়েছে! গৃহ থাকতেও যে গৃহহীন হয়েছে—মা, ভাই, আত্মীয় পরিজন সকলকে পরিত্যাগ করেছে—অমন সাধ্বী পত্নী থাকতেও সে প্রায় পত্নীহারা আজ; কিন্তু কার জন্যে? কে দায়ী তার এই অবস্থার জন্যে?

বাস্তবিক কী কুক্ষণেই উল্লাসীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার!

না, আর কোনো নারীকে বিশ্বাস করবে না সে। কোনো নারীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবে না। উল্লাসী তাকে খুব শিক্ষা দিয়ে গেছে। প্রেমের ছলনায় তাকে পথের ভিক্ষুক বানিয়ে গেছে। যাক্! —কিন্তু ভালো হবে না তার—কখখোনো ভালো হবে না। একদিন এজন্যে তাকে অনুতাপ করতে হবে। করতেই হবে।

একটা চাপা কান্নার আবেগে ঘন ঘন নিশ্বাস প্রশ্বাস পড়তে লাগলো ভবানীর। কান্নাটাকে মুক্তি দিতে পারলে খানিকটা স্বস্তি পেতে পারতো হয়তো, কিন্তু পারলে না—পৌরুষে বাধলো।

আরো আশ্চর্য লাগছে এই ভেবে যে, উল্লাসীকে এতো ভালোবাসতো সে! এতোদিন তো কই তা বুঝতে পারেনি। এতো নারীর সংস্পর্শ করেছে কিন্তু তারা ছেড়ে যেতে তো কোনোদিন এমন করেনি তার প্রাণ! এ কি হ'ল তার।

আজ তার সব চেয়ে বেশি রাগ হ'চ্ছে অশোকের ওপর। মনে হ'চ্ছে—অশোকই কোনো রকম ছল ক'রে তাকে জব্দ করবার জন্যে উল্লাসীকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। অশোকেরই ষড়যন্ত্রে তার থিয়েটারের আজ এই অবস্থা। দুধ কলা দিয়ে কালসাপ পুষেছিল সে অশোককে। অশোক তাকে দংশন ক'রে গেছে—সর্ব দেহে তার ছড়িয়ে দিয়ে গেছে তীব্র বিষ। সে-বিষের অসহনীয় জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছে সে।

উল্লাসীকে ভালোবেসেছিল ভবানী। সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালোবেসেছিল। এমন ভালো আর কাউকে সে বাসতে পারেনি। পৃথিবীতে এমন কোনো কাজ ছিল না যা উল্লাসীর জন্যে সে না করতে পারতো। এই যে থিয়েটার এও তো উল্লাসীর জন্যেই। অশোককে সে যতো প্রশ্রয় দিয়েছে তাও ওই উল্লাসীর জন্যে। নইলে অশোক আজ কোথায় থাকতো! কে পুঁছতো অশোককে। এতোবড় একটা থিয়েটারের এতোবড় দায়িত্ব অশোককে সে দিয়েছিল কেন? যে পয়সা অশোককে সে দিয়েছে সেই পয়সায় অশোকের চাইতে ঢের বেশি অভিজ্ঞ ডিরেক্টর সে পেতে পারতো। শুধু উল্লাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে সে তা করেনি।

উল্লাসী বলতো: অশোকবাবু আমার অভিনয় শিক্ষার গুরু। অশোকবাবু ভিন্ন কেউ আমায় কিছু শেখাতে পারবে না। আমি শিখবোও না আর কারো কাছে।

নইলে কী দরকার ছিল তার অশোককে। অশোক না হ'লে যখন চলতো না তখনকার কথা আলাদা। এখন ভবানীর কোনো প্রয়োজন ছিল না অশোককে।

উল্লাসীর সন্ধান অবশ্য অশোকই দিয়েছিল—অশোকই দিয়েছিল উল্লাসীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে কিন্তু খুনে বিশাইয়ের হাত থেকে—বিশাইয়ের চোখ এড়িয়ে রাতারাতি উল্লাসীকে ভবানীই তো নিয়ে আসে কোলকাতায়। সেই সঙ্গে নিয়ে আসে করালীর তহবিল। অশোকের কোনো সাহায্যই তো সে নেয়নি। থিয়েটার পার্টি করেছে তাও নিজের বুদ্ধিতে—অশোকের কোনোই প্রয়োজন হয়নি। তবে হ্যাঁ, অশোক এসে উল্লাসীর অভিনয় শিক্ষার ভার নিয়েছিল এবং বাণীশ্রী নাম দিয়ে ভবানীর টাকায় নতুন থিয়েটার কোম্পানি ক'রে নিজে তার পরিচালক হ'য়ে শখ মিটিয়েছিল।

এ ছাড়া কী করেছে অশোক তার!

শেষ পর্যন্ত নিজে নাম ক'রে নিয়ে তার থিয়েটার ভেঙে দিয়ে

সরে পড়লো। শুধু সরে পড়লো? উল্লাসীকে শুদ্ধ নিয়ে পালালো।

ভবানীর দৃঢ় বিশ্বাস যে, উল্লাসী আর বাসব অশোকের পরামর্শ মতো এখান থেকে পালিয়েছে। এবং হয়তো বোম্বেতে গিয়ে অশোকের সঙ্গেই আবার মিলিত হয়েছে।

অশোকের অসাধ্য কিছু নেই। অশোক সব পারে।

অনেকদিন ধরেই ওদের পরামর্শ চলছিল।

কিন্তু ভবানী ছাড়বে না—কিছুতেই না। উল্লাসীকে সে খুঁজে বার করবেই এবং আবার তাকে নিয়ে নতুন জীবনযাত্রা আরম্ভ করবে। এর জন্যে দরকার হ'লে অশোককে সে খুন করতেও প্রস্তুত।

একটা কথা মনে পড়তে ঘৃণায় মুখখানা কুঁচকে গেল তার। অশোক সম্বন্ধে লোকে বলতো—নারীর প্রতি কোনো আসক্তি নেই নাকি তার। নারীদের ঘৃণা করে সে। উল্লাসীও অনেক বার বলেছে—অশোকবাবু সাধু চরিত্রের লোক। নেশাভাঙ্ করে না। মেয়েমানুষের সঙ্গ পছন্দ করে না। থিয়েটারের সমস্ত মেয়ে তাকে ভয় করে—ভক্তি করে। উল্লাসী নাকি অনেক রকমে তার চরিত্র বাজিয়ে দেখেছে—যাচাই করে দেখেছে।

ভবানীর মনে পড়লো, শুধু ওই উল্লাসীই নয়—সুলোচনা, চামেলী, চন্দনা সকলেই একই কথা বলেছে। আজ ভবানী বুঝতে পারছে, সবাই তাকে ধাপ্পা দিয়েছে।

অশোক মোটেই সাধু প্রকৃতির নয়। নইলে তার উল্লাসীকে নিয়ে সরে পড়ে।

অশোক যেদিন কাউকে কিছু না বলে সহসা চলে গেল, সেদিন সত্যই বড় আঘাত পেয়েছিল মনে উল্লাসী। ভাবতে পারেনি সে—অশোক এমন ক'রে চলে যাবে। এমন ক'রে তার আশার মর্মমূলে

কুঠার হেনে যে অশোক চলে যেতে পারে এ কোনোদিন কল্পনাই করে নি সে।

প্রথম যেদিন সে সার্কাসের তাঁবুর সামনে বিস্মিত অশোককে দেখেছিল—আজো মনে পড়ে—সেদিন কী এক প্রচণ্ড আকর্ষণ অনুভব করেছিল অশোকের প্রতি। বড় ভালো লেগেছিল অশোককে। এমন ভালো আর কোনো পুরুষকে লেগেছিল বলে স্মরণ হয় না তার।

অশোক প্রলুব্ধ করেছিল তাকে। জীবনের কতো মনোরম চিত্র তার চোখের সামনে তুলে ধরেছিল। সার্কাসের দল ছেড়ে কোলকাতায় গেলে কতো সম্ভব-অসম্ভব উন্নতির রঙিন আশ্বাস পেয়েছিল সে অশোকের কাছে। আনন্দে নৃত্য ক'রে উঠেছিল তার মন।

তারপর একদিন এক অভাবনীয় পরিস্থিতির মধ্যে সার্কাস দল ছাড়তে বাধ্য হ'ল সে। মনে আছে আজো—সে কী ভয়ংকর দিনই গেছে তার জীবনে। বিশাইয়ের সেদিনের বিভীষণ চেহারাটা মনে পড়লে আজো তার বুকের রক্ত হিম হ'য়ে আসে।

সেদিন বিশাইয়ের নাগাল ছাড়িয়ে পালিয়ে যাবার জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে পড়েছিল সে। পালিয়েও এলো। কিন্তু অশোকের সঙ্গে নয়—ভবানীর সঙ্গে। প্রাণের দায়ে পালিয়ে এলো।

কতো ভালো ভালো কথা বলেছিল তাকে ভবানী। বলেছিল: অশোক না এলেও কোনো অসুবিধা হবে না আমাদের জীবনযাত্রার এখানে। তোমায় রাণীর আদরে রাখবো। অশোক! অশোক কী কাজে লাগবে আমাদের? কী করতে পারবে অশোক আমাদের জন্যে? কতোটুকু সামর্থ্য অশোকের। অশোককে আর আমাদের মধ্যে না টানাই ভালো। আমরা দুজনে সুখের নীড় রচনা ক'রে থাকবো। তোমার কোনো অভাব রাখবো না।

ভুরু কুঁচকে তার দিকে চেয়ে বলেছিল উল্লাসী: আমি তাহলে

এখানে থাকবো না। অশোকবাবু যদি এখানে না থাকেন তাহলে আমি থাকতে পারবো না। অশোকবাবুর কাছে আমি অভিনয় শিখবো। অশোকবাবু—

—কেন? অভিনয় শিখতে হ'লে অশোক কেন? ওর চেয়ে কতো ভালো লোক রয়েছে।

—থাক। অশোকবাবু ছাড়া আমার অভিনয় শেখা চলবে না। অশোকবাবুকে চাই-ই! নইলে—

মনে মনে নিশ্চয় বিরক্ত হয়েছিল ভবানী। কিন্তু প্রতিবাদ করতে আর সাহস করেনি।

শেষে নিজেও হয়তো অশোকের প্রয়োজন অনুভব করেছিল। নিজের বুদ্ধিতে কিছু করবার যোগ্যতা যার নেই সেই অপরের বুদ্ধি ধার করতে বাধ্য হয়। ভবানীরও সেই অবস্থা।

এতোখানি বয়েসে কোনোদিন নিজের বুদ্ধি খেলিয়ে কোনো কাজ সে করতে পারে নি—বরাবরই অশোক সহায়তা ক'রে এসেছে। এমন কি মেয়েমানুষ সংগ্রহের ব্যাপারেও অশোকের সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে তার।

কার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হবে তাও শিখিয়ে দিয়েছে অশোক। আরো একটা আশ্চর্যের ব্যাপার—অনেক ভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখেছে ভবানী তাকে যে কোনো নারীর প্রতি কোনো রকম দুর্বলতা কোনোদিন প্রকাশ পায়নি তার স্বভাবের মধ্যে। অথচ ভবানী দেখেছে এমন নারী অতি অল্পই তাদের সংস্পর্শে এসেছে যে নাকি আকৃষ্ট হয়নি অশোকের প্রতি। কিন্তু উল্লাসীর ব্যাপারে কিছুতেই যেন মনের সংশয় কাটিয়ে উঠতে পারছিল না ভবানী।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত পারতেই হ'ল—উল্লাসীর জেদ এবং নিজের অবস্থা বুঝে অশোকের স্মরণ নিতে হ'ল।

সংবাদ পাঠানো হ'ল অশোককে এখানে আসবার জন্যে।

তারপর অশোক এলো—শুরু হ'ল উল্লাসীর নতুন জীবন।

বিশ্ব সংসার ভুলে সে অভিনয় শিক্ষা আরম্ভ করলে।

অশোক তাকে শেখালেঃ মানুষের জীবন অবিচ্ছিন্ন অভিনয়ের মধ্যে দিয়েই চলেছে। সংসারে যে সুঅভিনয় করতে পারে তারই জয়।

অশোকের কথাতেই সে ভবানীর সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার আরম্ভ করলে। ভবানীর কামনার যজ্ঞে দেহখানিও দান করলে। কিন্তু মন রইল অশোকের কাছে।

অশোকের আশ্বাসে বিশ্বাস ক'রে অশোক যা বলেছে শুনে গেছে সে। কতোবার কতোভাবে উদ্দাম যৌবনের বিপুল উচ্ছ্বাস নিয়ে অশোকের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে অন্তরের প্রেম নিবেদন করেছে।

কিন্তু কী লাভ করেছে সে? মৃদু তিরস্কারের সঙ্গে সেই পুরাতন আশ্বাসঃ এখনো সময় হয়নি। যেমন আছ তেমনি থাকো। সুদিনের প্রতীক্ষা করো। উত্তেজিত হ'য়ে আখের নষ্ট কোরো না। ভবানীর মনে সন্দেহের উদ্রেক হ'লে তোমারও ভবিষ্যৎ যাবে, আমারও! এখন শুধু ভবানীর সঙ্গে প্রেমের অভিনয় ক'রে যাও। তারপর তুমি আ'র আমি—

আজ উল্লাসী সবিস্ময়ে ভাবে—অশোকের ভ্রান্ত আশ্বাসে কেনই বা সে বিশ্বাস করেছিল, আর অশোকই বা কেন তাকে অমন মিথ্যা ছলনার জালে জড়িয়ে রেখেছিল। কী লাভ হ'ল তাতে অশোকের!

সত্যিই অশোককে বিশ্বাস ক'রে ভুল করেছে সে। আশ্চর্য হ'য়ে তাই আজ ভাবে সে—কী অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ ওই অশোক। চলে গেল একবার জানিয়েও গেল না। অথচ ওই অশোককে প্রাণের চেয়েও অধিক ভালোবেসেছিল সে। কতো জায়গার কতো প্রলুব্ধ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছে কেবল অশোকের কথায়। সেই অশোক—

একটা প্রগাঢ় দীর্ঘশ্বাস বুক নিঙড়ে বেরিয়ে গেল তার। চোখের জলে গাল ভেসে যেতে লাগলো।

আচ্ছা, এবার তাহলে সে-ও তার রাস্তা খুঁজে নেবে। ওই পাজী

মাতাল দুশ্চরিত্র ভবানীটার সংসর্গে পড়ে থেকে কেন নিজের জীবনটাকে নষ্ট করবে? তা ছাড়া, অশোককে দেখিয়ে দেবে সে যে সে-ও পারে। অশোকের সাহায্য ব্যতিরেকে নিজের পথ নিজে খুঁজে নিতে পারে।

এবার জীবনটাকে পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করবে সে। আর তার প্রথম শিকার হোক বাসব। তারপর ভবানীর মতো সেও কিছুটা নিশ্চিহ্ন হ'য়ে হারিয়ে যাবে অত্যাচারের অতল গভীরে। মনের মধ্যে কণ্ঠরোধ ক'রে হত্যা করবে অশোককে।

এরই কয়েকদিন পরে সহসা একদিন উধাও হ'ল উল্লাসী। সেই সঙ্গে বাণীশ্রীর নবাগত সুদর্শন অভিনেতা বাসব রায়ও। ব্যবস্থা আগে থেকেই কিছুটা স্থির হ'য়ে ছিল বোধ হয় উল্লাসীর। তাই কোলকাতার কোনো চিত্র কিংবা মঞ্চ প্রতিষ্ঠানে যোগ না দিয়ে সটান বোম্বে রওনা দিলে।

বোম্বে পয়সাও আছে আমোদও আছে। ল্যাং বোটের মতো সঙ্গে সঙ্গে চললো বাসব।

বাসব উল্লাসীর অনুগ্রহ প্রার্থী। উল্লাসীর এক ফালি হাসি কিংবা একটু স্পর্শ, কিংবা একটু মিষ্টি কথা বাসবকে স্বর্গের আশ্বাস দেয় যেন।

রীতিমত অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে বাসব। বড়লোকের ছেলে সাধারণত যেমন একটু শৌখিন হয়, একটু আদুরে হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে একটু উচ্ছৃঙ্খল—বাসবও তেমনি। চরিত্রের কোনো দৃঢ়তা নেই বাসবের। লেখাপড়া বিশেষ হয়নি। সঙ্গদোষে বেশ একটু উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে গেছে তার স্বভাবটা।

সম্প্রতি অভিনয় করবার প্রবল বাতিক হয় এবং অনেক সুপারিশ ধরে অশোকের সংস্পর্শে আসে। তার চেহারাখানি দেখে অশোকের বড় ভালো লাগে। কণ্ঠস্বরও মন্দ না। এ্যামেচারে অভিনয় করার

অভ্যাসও আছে। সুতরাং বাণীশ্রীতে সে অভিনেতা হিসাবে যোগ দিতে সমর্থ হয়।

ভবানীর কিন্তু কেন জানি না—গোড়া থেকেই ভালো লাগেনি বাসবকে। আরো ভালো লাগেনি উল্লাসীকে তার সঙ্গে মিশতে দেখে। কিন্তু উপায় ছিল না—অভিনেতা অভিনেত্রী নির্বাচনে অশোকের ওপর কোন কথা চলতো না তার। শর্তই ছিল এ ব্যাপারে কারো কোনো মন্তব্য চলবে না। অন্ততঃ অশোক যতোদিন বাণীশ্রীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকবে। তবুও ভবানী আপত্তি জানিয়েছিল।

অশোক বলেছিলঃ ভয় নেই বন্ধু, ওকে রাখলে তোমার উপকারই হবে। ও বড়লোকের ছেলে। সময় অসময়ে অনেক কাজে লাগবে।…

কিন্তু ভবানীর অসময়ে বাসব কোনো কাজেই লাগলো না। সে তখন উল্লাসীর প্রেমের কাঙাল হয়ে—উল্লাসীর সঙ্গী হ'য়ে বোম্বেতে বসে রইলো।

একদিন যেমন উল্লাসীর জন্যে পাগল হয়েছিল ভবানী—বাসবও ঠিক তেমনি পাগল হ'য়ে তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে লাগলো। উল্লাসীর একটু সন্তুষ্টির জন্যে একটু প্রশান্তির জন্যে বুঝি হেলায় প্রাণখানাও বিসর্জন দিতে পারে সে।

উল্লাসীও বোঝে তার দুর্বলতা। বুঝে মনে মনে হাসে।

বাসব তার শিকার। শিকারকে খেলানোয় শিকারীর একটা পৈশাচিক আনন্দ থাকে এবং থাকাই স্বাভাবিক।

বোম্বের চিত্র জগতে উল্লাসী নতুন নাম গ্রহণ করেছে—কাবেরী।

পর পর দুখানি ছবিতে অভিনয় করে অভাবনীয় খ্যাতিও অর্জন করেছে এবং সেই সঙ্গে করেছে অর্থোপার্জন। শুধু তাই নয়—ইতিমধ্যে অসংখ্য পুরুষ বন্ধুর সংশ্রবে এসেছে সে। তারা নিত্য আসা যাওয়া করে তার আস্তানায়। তার একটু প্রসন্নতা লাভ করতে তারা সদাই ব্যস্ত।

কেউ কেউ সাফল্যও অর্জন করেছে। তাদের মধ্যে আছে কয়েকজন বিখ্যাত অভিনেতা এবং কয়েকজন প্রসিদ্ধ পরিচালক।

বাসব এসব সহ্য করতে পারে না। তার অন্তরে জ্বালা ধরে। নিষ্ফল প্রতিবাদও করেছে অনেকবার। মিনতির স্বরে বলেছে : এ সব তুমি কী করছ? এ কিন্তু ভালো নয়।

—কেন?

সবিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে উল্লাসী বলেছে : কী ভালো, কী মন্দ এ নিয়ে আলোচনা করার মতো সম্পর্ক তো তোমার আমার নয়।

হঠাৎ চাবুক খেলে মানুষের মুখের যে অবস্থা হয় তেমনি মুখ করে তাকিয়ে থাকে বাসব। চোখ দুটো ছল ছল করতে থাকে তার।

তার সে অবস্থা দেখে হেসে ফেলে উল্লাসী। বোধ হয় একটু মায়াও হয়; তাই ব্যাপারটাকে একটু মোলায়েম করার চেষ্টা করে।

—ও, তোমার হিংসে হয় বুঝি? অবিশ্যি তা হ'তেই পারে। কিন্তু—

বাসবের গালটা আদর ক'রে টিপে দিয়ে সোহাগের ভঙ্গীতে গলাটা জড়িয়ে ধরে বলে : ওদের হাতে না রাখলে ভালো চান্স পাবো কী করে?

—কোনো দরকার নেই।

বাসব বলে : তুমি কোলকাতায় ফিরে চলো। আমি তোমায় নিয়ে ফিল্ম কোম্পানি তৈরি করবো। তার নাম দেব—কাবেরী চিত্র প্রতিষ্ঠান। তুমি হবে তার সর্বেসর্বা।

—তাই নাকি? আমার জন্যে তুমি একটা ফিল্ম কোম্পানিই খুলে ফেলতে পারো?

—নিশ্চয়। তোমার জন্যে পারি না এমন কোনো কাজ আছে নাকি? তুমি কোলকাতায় ফিরে চলো লক্ষ্মীটি!

—কোলকাতায়? তোমার বুঝি বাড়ির জন্যে মন কেমন করছে?

—দূর! তা কেন। আমি এখানের ওই লোকগুলোকে সহ্য করতে পারছি না। ওরা কেন তোমার সঙ্গে অতো মাখামাখি করবে?

—করলেই বা, ক্ষতি কী? আমি তো আর তোমার বিয়ে করা বউ নই যে অন্য পুরুষের সঙ্গে মিশলে তোমার সমাজে নিন্দে হবে। আমি যখন এই পেশা নিয়েছি তখন আমায় পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশাও করতে হবে—তাদের সঙ্গে হাসি ঠাট্টাও করতে হবে। নির্জন নিরালায় গলা ধরাধরি ক'রে প্রেমের অভিনয়ও করতে হবে। আপত্তি করলে চলবে কেন? তবে হ্যাঁ, তুমি যদি আমায় বিয়ে করো—

বলেই খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে উল্লাসী। হাসতে হাসতেই বলেঃ কী, রাজী! বিয়ে করবে আমাকে? কিন্তু বিয়ে ক'রে তোমাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আমায় রাখতে হবে। তা যদি পারো, তাহলে মাইরি বলছি—

—বাড়িতে! কেন বিয়ে ক'রে যদি তোমায় নিয়ে আমি অন্য জায়গায় সংসার পাতি?

—না, তা হবে না। তোমার বাড়িতে গিয়ে তোমার প্রকৃত স্ত্রীর অধিকার নিয়ে আমি থাকতে চাই। শ্বশুর শাশুড়ী ভাসুর দেওর ননদ সকলের মাঝখানে আমি থাকবো। সংসার করার সত্যি আমার বড় সাধ হয়েছে। দেবে আমায় সে সম্মান? পারবে আমার সে সাধ পূর্ণ করতে?

বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল বাসব তার উত্তেজিত সুন্দর মুখখানার দিকে। স্তব্ধ হ'য়ে শুনেছিল তার কথা। শেষের প্রশ্নটা কানে যেতেই বলে ফেলেছিলঃ পারবো। তোমার জন্যে আমি সব করতে পারি।

বলেই সাগ্রহে তাকে বুকের মধ্যে সবলে টেনে নিয়ে বলে উঠেছিলঃ বলো—বলো, তুমি আমার হবে? আর কারো—

কথা শেষ করতে পারেনি সে, উল্লাসীর আকস্মিক উচ্ছ্বসিত তীক্ষ্ণ হাসির শব্দে থেমে গিয়েছিল তার কথা।

হাসতে হাসতে বলেছিল উল্লাসী ঃ যতো সহজে পারবো বললে, অতো সহজ নয়। আজকে আমায় যে চোখে দেখছো, কাল বিয়ে করার পর আর তেমন দেখবে না। তখন নিজের ভুলের জন্যে আপসোস করতে হবে! রূপ যৌবন আমার চিরস্থায়ী নয় বাসব। একদিন এর শেষ আছে। আজ যেমন আমার বুকে বুক দিয়ে মুখের কাছে মুখ নিয়ে প্রেমের কথা বলতে ভালো লাগছে সেদিন কিন্তু লাগবে না। সেদিনের কথা ভেবেছ ?

—ভেবেছি। রূপ যৌবন কারো চিরস্থায়ী হয় না। তাই বলে কি কেউ বিয়ে করে না ?

—করে। কিন্তু আমাদের মতো মেয়েকে করে না। করলেও ভুল ক'রে। আবার সে-ভুল অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে সংশোধন করে। তুমি জানো—আমার জাত নেই, আমার সমাজ নেই, আমার পিতৃকুলের মাতৃকুলের কোনো পরিচয় নেই। একটা সার্কাসের দলে সার্কাস ক'রে বেড়াতুম। তারপর পালিয়ে এলুম ভবানীর সঙ্গে কোলকাতায়। কোলকাতায় এসে অভিনেত্রী জীবন শুরু করলুম।

হঠাৎ এই সময় অশোকের কথা মনে পড়ে যেতেই চোখ দুটো ছল ছল ক'রে উঠেছিল উল্লাসীর।

বাসব তার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করেছিল ঃ অশোকবাবুই তো এ লাইনে তোমার গুরু ?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা অশোকবাবুকে তুমি খুব ভালোবাসতে, না ?

—ভালো ?

হঠাৎ চোখ দুটো চক্ চক্' ক'রে উঠেছিল তার। পরক্ষণেই টল টল ক'রে উঠেছিল মুক্তোর মতো দু ফোঁটা জল চোখের কোণায়। গলাটার স্বরও একটু ভাঙা ভাঙা হ'য়ে এসেছিল যেন।

আস্তে আস্তে কতকটা আপন মনেই বলেছিল সে : আমার বুকখানার মাঝে আগুন জ্বেলে দিয়ে গেছে অশোক। কোলকাতায় এসেছিলুম শুধু অশোককে পাবো বলে। ভবানী? ভবানীর সঙ্গে শুধু আমার দেহের সম্পর্ক ছিল, মনের ছিল না। সে ছিল অশোকের সঙ্গে। অশোক আমায় কতো আশার বাণী শোনাতো। আমি মুগ্ধ হ'য়ে শুনতুম। তখন কী বুঝেছিলুম যে অশোক এতোবড় বিশ্বাসঘাতক। কিন্তু যাক্—ভালোই করেছে সে। আমাকে শিক্ষা দিয়ে গেছে। জীবনে কোনো পুরুষকে আর বিশ্বাস করবো না।

—কিন্তু সকলেই অশোক নয়।

—না হলেই ভালো। তবে আমার আর তোমাদের ভালোবাসায় বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না।

আমাকে তুমি অবিশ্বাস কোরো না কাবেরী!

উল্লাসীর মুখের দিকে চেয়ে ব্যাকুল স্বরে বলেছিল বাসব।

উল্লাসী তার কোনো জবাব না দিয়ে কেবল একটু হেসেছিল।

সেদিন সে হাসির অর্থ ঠিক মতো বুঝতে পারেনি বাসব, বুঝেছিল দিন কয়েক পরে। যেদিন তার সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে দিলে উল্লাসী। যেদিন তার সমস্ত ভালোবাসার মূলে কুঠারাঘাত ক'রে সহাস্যে চলে গেল উল্লাসী। চলে গেল তাকে কোনো কথা না বলেই।

একটা নতুন ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করার চুক্তিবদ্ধ হয়েছে সে। এবং সেই ছবিতে যে নায়কের ভূমিকায় নামছে তারই সঙ্গে চলে গেল সে। শুধু চলেই গেল না—কয়েকদিন পরে দৈনিক পত্রিকায় সচিত্র সংবাদ প্রকাশিত হল :—

...চিত্র জগতের বিস্ময় সুদর্শনা অভিনেত্রী কাবেরী দেবীর সহিত সুবিখ্যাত অভিনেতা অমিতাভ হাজারীর শুভ পরিণয় গত পাঁচুই বৈশাখ সাড়ম্বরে সমাধা হইয়াছে। বিবাহ সভায় বহু অভিনেতা-

অভিনেত্রী, পরিচালক, প্রযোজক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।···

পরিশেষে নবদম্পতির আনন্দময় শুভ জীবন কামনা ক'রে সংবাদ শেষ করা হয়েছে।

হৃৎপিণ্ডে ছুরিকাঘাত করলে মানুষের মুখে যন্ত্রণার যে রেখা ফুটে ওঠে, সংবাদটি পাঠ ক'রে বাসবের মুখের অবস্থা তার চেয়েও বুঝি খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল।

যার জন্যে সে সব পরিত্যাগ করেছে তার এই ব্যবহার! পিতা-মাতা আত্মীয় পরিজন সকলকে পরিত্যাগ করে—দেশ ছেড়ে বিদেশ বিভূঁয়ে এসে যার মায়ায় পড়ে আছে, সে-ই পরিশেষে এমন কাজ করলে? একবার তার কথা ভাবলেও না?

বুকের ভেতর একটা চাপা কান্না তালগোল পাকাতে লাগলো। নিজেরই ওপর কেমন যেন ধিক্কার এলো বাসবের। এতোবড় প্রতারণা, এতোবড় অপমান প্রবঞ্চনা কিছুতেই সহ্য করতে পারলে না সে। এ অসহনীয়।

প্রতিশোধ নেবে সে—নিশ্চয় প্রতিশোধ নেবে—চরম প্রতিশোধ নেবে। সারা জীবন যাতে বিষাক্ত হ'য়ে থাকবে উল্লাসীর জীবন। প্রণয়ীর সঙ্গে প্রেম সম্ভাষণ করতে গিয়ে তার কথা মনে পড়ে আতঙ্কে শিউরে উঠবে উল্লাসী। এমন প্রতিশোধ বাসব নেবে।

ক্ষেপে গেছে যেন বাসব। আহার নেই, নিদ্রা নেই কেবলই এক চিন্তা—কোন পন্থা অবলম্বন করবে সে উল্লাসীকে শিক্ষা দেবার জন্যে। কঠিন শিক্ষা, রূঢ় শিক্ষা। যা কল্পনাও করতে পারেনি উল্লাসী।

সত্যিই তাই করলে বাসব শেষ পর্যন্ত।

উল্লাসীর বিবাহের কদিন পরেই সংবাদপত্রে আর একটি সংবাদ প্রকাশিত হ'ল ঃ—

···গতকল্য সন্ধ্যা সাতটায় চিত্রাভিনেত্রী কাবেরী দেবীর গৃহ সম্মুখস্থ পার্কে বাসব রায় নামক জনৈক যুবক তীব্র বিষ সেবনে

আত্মহত্যা করিয়াছে। যুবকের নিকট কাবেরী দেবীর একটি ফটো পাওয়া গিয়াছে এবং একটি পত্র পাওয়া গিয়াছে। পত্রে লেখা আছে—কাবেরী, তোমায় আমি ভালোবাসি। তোমায় না পাওয়ার বেদনা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করলাম। প্রার্থনা করি তুমি সুখী হও। কিন্তু আর কাউকে তুমি আমার মতো বেদনা দিও না, এই অনুরোধ। আর একটি অনুরোধ—তোমার সুখের বাসর শয়নে প্রণয়ীর প্রেম সম্ভাষণের সময় ভুলেও আমাকে একবার স্মরণ কোরো। বিদায়।···

সংবাদটি যথাকালে উল্লাসীর দৃষ্টি গোচর হ'ল। একবার যেন বুকটার ভেতর কেমন করে উঠলো তার। ভুরু দুটো একবার কুঁচকে গেল। একবার অসাম নীলে শূন্য দৃষ্টি বিস্ফারিত করে স্তব্ধ হ'য়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ব্যাপারটা মনের গভীরে ঘুম পাড়িয়ে দিলে।

আপন জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে গেলে অমন কতো বাসব আসবে, কতো যাবে। ও নিয়ে দুর্ভাবনার কোনো হেতু হয় না। রাখেওনি সে কোনো দুর্ভাবনা মনের মধ্যে পুষে।

কদিনের মধ্যেই পরিষ্কার ভুলে গেল সে বাসবকে।

নতুন জীবন শুরু হয়েছে উল্লাসীর। মন্দ লাগছে না জীবনটাকে।

অমিতাভ আর সে দুজনে ছবিতে কাজ করে। নায়কের ভূমিকায় অমিতাভ আর নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করে সে। তারপর দুজনে অভিনয় শেষে জোড়ের পায়রার মতো বাড়িতে ফিরে আসে। ফিরে আসে নিজেদের নতুন কেনা প্রকাণ্ড বুইককারে করে।

স্টুডিওর লোকেরা তাদের সৌভাগ্যের ঈর্ষা করে। বাইরের লোকে তাদের নিয়ে নানা আলোচনার সৃষ্টি করে।

সিনেমা দর্শকরা তাদের অভিনয় দেখে ধন্য ধন্য করে।

এমনি করেই দিন কেটে যায়। কেটে যায় একদিন দুদিন করে একটি বছর।

ক্রমেই কিন্তু কেমন অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠছে উল্লাসী। আর ভালো লাগছে না তার এই একঘেয়ে জীবন। বোম্বাই দেশটা ক্রমেই অসহ্য হ'য়ে উঠছে তার।

অমিতাভকেও ভালো লাগছে না আর। এ যেন কেমন বন্দী জীবন। এ যেন প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।

মানুষ সুদীর্ঘ বিবাহিত জীবন কী ক'রে কাটায়?

না, উল্লাসী পারবে না—কিছুতেই পারবে না।

মুক্তি চাই তার—এ জীবন থেকে মুক্তি চাই—চাই-ই। তা ছাড়া কিসের লোভে থাকবে সে! কী পেয়েছে সে অমিতাভের কাছে। যে বস্তু এতোটুকু লাভ করবার জন্যে প্রাণী মাত্রই অধীর আগ্রহ প্রকাশ করে এবং যেখানে পায় সেখানেই আপনি আপনাকে হারিয়ে ফেলে—সেই প্রকৃত ভালোবাসা কই অমিতাভের মধ্যে? অমিতাভ ভালোবাসতে জানে না। অমিতাভ তার সঙ্গে ভালোবাসার অভিনয় করে।

আজ বাসবকে বড্ড বেশি মনে পড়ে উল্লাসীর। বাসবের কথা ভাবতে ভাবতে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে একফোঁটা চোখের জলও বিসর্জন করে সে বাসবের উদ্দেশ্যে।

এদানি ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে প্রায়ই অমিতাভের সঙ্গে তার মৃদু কলহ হয়। তার আদি জীবনের খুঁটি ধরে আস্তে আস্তে নাড়া দিয়ে পরিহাস করে অমিতাভ। মনে করিয়ে দেয় তাকে তার সেই পুরাতন জীবনের কথা। কোন সমাজ থেকে কোথায় আজ সে এসে পৌঁছেচে মনে করিয়ে দেয় তাকে।

কলহের মাত্রা একটু চড়ে গেলে আরো অনেক অশ্রাব্য কথা শোনাতে বাধে না তার। এমন কি নেশার ঘোরে রাগের মাথায় মাঝে মাঝে চড় চাপড়ও বসিয়ে দেয়। আবার নাকি সন্দেহ করে উল্লাসীকে।

মোট কথা অমিতাভও আর সইতে পারছে না তাকে।

অমিতাভরা মধুমক্ষিকার দল! এক ফুলে বসে চিরকাল মধু আহরণ প্রকৃতি বিরুদ্ধ তাদের। হয়তো নতুন কোনো ফুলের সন্ধান এসেছে। হয়তো অমিতাভের মন সেইখানে বাঁধা পড়েছে! এখান থেকে এবার সরে পড়তে চায়।

কিন্তু আগে তাকে সরে পড়ার সুযোগ দেবে না উল্লাসী। উল্লাসীই বিদায় নেবে আগে।

সুযোগের অভাব হ'ল না। অভাবনীয় ভাবেই একটা সুযোগ এসে গেল উল্লাসীর বোম্বাই ছাড়বার।

এক ধনী মাড়োয়ারী যুবক অনেকদিন ধরে অনেক টাকার বিনিময়ে উল্লাসীকে কামনা করেছিল। সহসা তার ভাগ্য প্রসন্ন হ'ল। উল্লাসী তাকে আহ্বান জানালে।

এরই কয়েকদিন পরে দৈনিক পত্রিকার পাতায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হ'ল। প্রকাশিত হ'ল ঃ—

চিত্রতারকা কাবেরী দেবী এবং অমিতাভ হাজারীর বিবাহ বিচ্ছেদের মামলার বিবরণ।

॥ চৌদ্দ ॥

ভগবান কাল-ভৈরবের আশীর্বাণী নিষ্ফল হয়নি।

বসুমতী দেবীর অন্তরের মৌন কামনা—অনুরাধার নীরব তপস্যা—গৌরীশংকরের গোপন অনুসন্ধান কিছুই ব্যর্থ হয়নি—কিছুই বিফলে যায়নি।

একদিন রিক্ত সর্বস্বান্ত রুগ্ন ভবানী ভিক্ষুকের মতো শতছিন্ন পরিচ্ছদে দেহ আবৃত ক'রে রাতের অন্ধকারে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে রাধানগরে ফিরে এলো।

তখন শীতের রাত অনেক হয়েছে। চারদিক নিস্তব্ধ। জমিদার বাড়িরও কোথাও জাগরণের সাড়া নেই, কেবল নব প্রতিষ্ঠিত কাল-ভৈরবের মন্দিরের সামনের দিকের একটা চওড়া দালানে আলো জ্বলছে এবং সেখানে দু' একজন মানুষের অস্তিত্বও বাইরে থেকে অনুমান করা যাচ্ছে।

অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কি যেন ভাবলে ভবানী। সবই যেন কেমন নতুন! একবার ভুরু কোঁচকালে। তারপর আস্তে আস্তে মন্দিরের পিছনের দিকে এগিয়ে গেল।

পিছনের দিকেও অনুরূপ একটি চওড়া দালান। তবে উন্মুক্ত দালান—আশেপাশে বা ওপরে কোনো আচ্ছাদন নেই। নাই থাক, কোনো রকমে ভবানীকে আজ ওইখানেই রাত্রিবাস করতে হবে। উপায় নেই। কিন্তু বাগানের রেলিং টপকাতে গেলে আবার কোনো রকম ফ্যাসাদে পড়তে হবে না তো?

হয়তো চোর মনে করে—যা ভাগ্য তার। নইলে জমিদার মহেশ্বর ঘোষালের বংশধর—গৌরীশংকরের ভাইকে আজ এখন

চোরের মতো সকলের চোখ এড়িয়ে বাড়ি আসতে হয়? নিজের বাড়িতে নিজের প্রবেশাধিকার নেই?

একবার আকাশের দিকে তাকালে ভবানী। বুকটা নিঙড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস আছড়ে পড়লো তার। চোখ দুটো জলে টল টল করতে লাগলো। আজ প্রায় দু'দিন সে অভুক্ত।

কে জানে বাড়িতে তার স্থান হবে কি না? হয়তো একটা উৎকট অপমান তার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আছে! তবু সব জেনে শুনেই সে এসেছে। না এসে যে তার কোনো উপায় ছিল না একমাত্র আত্মহত্যা করা ছাড়া। আর আত্মহত্যাই যদি করতে হয় তো নিজের জন্মস্থান এই রাধানগরেই করবে।

ভবানীর দৃঢ় বিশ্বাস পৃথিবীর কেউ তাকে স্থান না দিলেও গৌরী তাকে নিশ্চয় আশ্রয় দেবে। গৌরী তাকে পরিত্যাগ করতে পারবে না। একবার দাদা বলে সে যদি গৌরীর কাছে দাঁড়ায় গৌরী তার সব অপরাধ ক্ষমা করে তাকে বুকে টেনে নেবে।···

শেষ পর্যন্ত হ'লও তাই।

বাগানের বাইরে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে বহুক্ষণ ওইসব চিন্তা করতে করতে কখন ভবানীর অনাহারক্লিষ্ট দুর্বল দেহ সেইখানের মাটিতেই লুটিয়ে পড়লো জানতেও পারলে না সে। অঘোর ঘুমে ঘুমিয়ে গেল।

প্রতিদিনের মতো প্রভাতের অনেক পূর্বেই গৌরীশংকর শয্যা ত্যাগ করলে সেদিন। তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো বাড়ির বাইরে। তখনো রাত্রির অন্ধকার এখানে সেখানে জমাট বেঁধে আছে। বাড়ির দেউড়ির পেঁটা ঘড়িতে মিনিট কয়েক আগেই নিশাশেষের সময় জ্ঞাপন হ'য়ে গেছে। ঠিক এই চারটের সময়েই গৌরীশংকর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে এবং বেরিয়েই সর্বাগ্রে নব

প্রতিষ্ঠিত মহাকালের মন্দিরে প্রণিপাত ক'রে মন্দিরের আশেপাশে ও বাগানে কিছুক্ষণ বেড়িয়ে বেড়ায়।

এ তার নিত্যকার কাজ।

বাড়ির লোকেদের ঘুম থেকে ওঠার আগেই তার প্রাতঃভ্রমণ সারা হ'য়ে যায় প্রায় প্রতিদিন। কোনো কোনো দিন আবার ইতিমধ্যে স্নানও শেষ ক'রে মন্দিরে এসে পূজায় বসে যায়। একমাত্র বসুমতী দেবী আর অনুরাধা ছাড়া সে সময় আর কেউ মন্দিরে থাকে না বড় একটা।

বসুমতী দেবী বাড়ির ভেতর আর থাকেন না। তিনি মন্দিরের পাশেই একটি ছোট ঘরে বাস করেন। দিবারাত্রি জপতপ নিয়েই তাঁর অতিবাহিত হয়।

অনুরাধা প্রতিদিন রাত্রি থাকতে উঠে এসে মন্দিরের অঙ্গন প্রাঙ্গণ নিজ হাতে পরিষ্কার করে, তারপর স্নান সেরে দেবতার পূজার আয়োজন করে। অবশ্য অধিকাংশ দিন অনুরাধার মন্দিরে আসার পূর্বেই গৌরীর বেড়ানো হ'য়ে যায়।

আজও তার নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। সকলের ওঠার আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করলে। কি প্রার্থনা করলে সেই জানে। প্রণাম শেষে সে অভ্যাস মতো বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ একটা কিসে হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে গেল।

—কী রে এটা?—আরে শুয়ে কে এখানে! এই শীতে কুঁকড়ে একেবারে—কে রে?

ঝুঁকে পড়ে গৌরী ঘুমন্ত লোকটাকে ডাকতে লাগলো।

—শুনছো—ওহে—কে তুমি? ওহে—এই—

কিন্তু কোনো সাড়া নেই লোকটার।

—এ তো আচ্ছা ঘুমুচ্ছে দেখি। ওহে—শুনছো? ওঠো—অতিথশালায় গিয়ে শোও।

তথাপি নিদ্রিত ব্যক্তির কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

বিরক্ত হ'য়েই গৌরী চলে যেতে গেল 'মুক্রগে যাক' বলে কিন্তু দু'পা গিয়ে আর যেতে পারলে না। দাঁড়িয়ে পড়লো। ভাবলে—হয়তো কতো কষ্ট হচ্ছে লোকটির। হয়তো শীতের দাপট সহ্য করতে না পেরে অজ্ঞান হ'য়ে গেছে।

আবার একটু এগিয়ে এসে সে দাঁড়ালো লোকটির সামনে। মিনিট দুই চুপচাপ চেয়ে রইলো সেই অস্পষ্ট আলোয় লোকটির দিকে।

তারপর আপন মনেই বললেঃ ছুঁয়েই যখন ফেলেছি তখন গায়ে হাত দিয়ে দেখতে দোষ কি? স্নান তো করবোই।

এই বলে লোকটির গায়ে হাত দিয়ে ঠেলা মেরে ডাকতে লাগলো। কিন্তু তাতেও কোনো ফল হ'ল না। লোকটি অজ্ঞান হ'য়ে গেছে।

হঠাৎ কী একটা সন্দেহ হতেই গৌরী চঞ্চল হাতে লোকটির পাশ ফেরানো মুখখানাকে দু'হাতে সমান ক'রে ধরে মুখখানার ওপর ঝুঁকে পড়লো। এবং পরমুহূর্তেই প্রায় আর্তনাদ ক'রে উঠলোঃ ভবানী !!

দেবতার কথা মিথ্যা হয়নি—দেবতার কথা মিথ্যা হয় না। দেবতার অশেষ করুণায় দীর্ঘদিন পরে বসুমতী দেবী ফিরে পেলেন তাঁর পুত্রকে। অনুরাধা ফিরে পেল তার আরাধ্য স্বামীকে। আর গৌরীশংকর ফিরে পেল তার পাঁজরের চেয়ে প্রিয়—তার কোলে পিঠে করে মানুষ করা একমাত্র স্নেহের ভাইটিকে।

সেদিন যখন পথের পাশে ভবানীকে আবিষ্কার করলে গৌরী, তখন তার প্রায় মৃতকল্প অবস্থা। প্রাণের চিহ্ন নেই বললেই হয়। দেহ শীতল।

বুকে তুলে নিলে গৌরী তার সেই অচৈতন্য হিম দেহ। তারপর কাঁপতে কাঁপতে মন্দিরের সামনে এসে চিৎকার ক'রে উঠলোঃ

মাগো—ভগবান আমার ভবানীকে ফিরে দিয়েছেন। কিন্তু—কিন্তু—এ যে—

কথা শেষ করতে পারলে না গৌরী, উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কেঁদে উঠলো।

কোথায় ছিলেন বসুমতী, ছুটতে ছুটতে এলেন—এলো অনুরাধা—এলো আরো অনেকে।

স্থির নির্বাক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ভবানীর দিকে তাকিয়ে থাকার পর অসীম ধৈর্যের সঙ্গে নিজের ক্রন্দনের বেগ চেপে কাঁপা গলায় বসুমতী আদেশ করলেন: ওকে ঠাকুরের সামনের ওই ঢাকা বারান্দায় শুইয়ে দাও গৌরী। ঠাকুরই ওকে ফিরিয়ে দিয়েছেন—নেবার হ'লে ঠাকুরই ওকে নিন। বউমা—

অনুরাধার দিকে তাকালেন তিনি।

অনুরাধার বুকের ভেতর তখন কান্নার সপ্তসাগর তোলপাড় করছে। সমস্ত শরীর কী এক ভাবনায় ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে গেছে। তবু চোখে জল নেই—দৃষ্টি স্থির। অন্তরের অন্তস্তল হ'তে কে যেন তাকে আশ্বাস বাণী শোনাচ্ছে—ভয় নেই—ভয় নেই।

কাল-ভৈরবের দিকে তাকিয়ে কেবলমাত্র সে বলতে পারলে: ঠাকুর—

এর পরেই শাশুড়ীর আহ্বানে সে চমকে উঠলো।

—মা—

অনুরাধা ব্যথা বিহ্বল নেত্রে বসুমতীর পানে তাকালো।

—তোমার পুণ্যের আকর্ষণেই ও আবার এসেছে—সতী সাবিত্রী তুমি—যা করবার তুমি করো।

ক্রন্দনের আবেগে থর থর ক'রে কেঁপে উঠলো বসুমতীর সর্বদেহ।

প্রথমটা কিছু বুঝতে পারলে না অনুরাধা, ফ্যাল ফ্যাল করে শাশুড়ীর মুখের পানে তাকিয়ে রইলো। কিন্তু সে মুহূর্তকাল,

পরমুহূর্তেই সে নিজেকে সংযত ক'রে নিয়ে আস্তে আস্তে বললে : ওই ঢাকা বারাণ্ডাতেই ওঁকে শুইয়ে দিতে বলুন, মা।

গৌরীশংকর চোখের জল ফেলতে ফেলতে ভবানীর জীর্ণ শীর্ণ কংকালসার চেতনাবিহীন দেহখানিকে নিয়ে গিয়ে বসুমতী দেবীর নির্দেশিত স্থানে শুইয়ে দিলে।

তারপর অনুরাধার অক্লান্ত সেবায় প্রায় তিন দিন তিন রাত্রি পরে ধীরে ধীরে ভবানীর দেহে জ্ঞান সঞ্চার হ'ল। ভবানী চক্ষু মেলে তাকালে। কিছুক্ষণ নির্বাক চোখে তাকিয়ে থেকে আবার চোখ বুজিয়ে ফেললে। চোখের কোণ বয়ে দু'ফোটা জল গড়িয়ে পড়লো তার।

আরো কটা দিন সেই অবস্থায় কাটার পর একটু যেন সামলে উঠলো ভবানী।

বসুমতী দেবী বললেন : এবার ওকে বাড়ি নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করো বউমা! ঠাকুরের দয়ায় প্রাণটা যখন রক্ষে হয়েছে তখন মনে হয় এবার আস্তে আস্তে সেরে উঠবে! এবার বরং একজন ভালো ডাক্তার ডেকে—

বাধা দিয়ে বলে উঠলো অনুরাধা : না মা, ডাক্তার ডাকার কোনো আবশ্যক নেই। মহাকালের চরণামৃত ছাড়া আমি আর ওঁকে কিছু খেতে দেব না।

দেয়ওনি অনুরাধা ডাক্তারের এক ফোঁটা ওষুধ ভবানীকে খেতে। শাশুড়ীর অনুরোধ, ভাসুরের অনুরোধ কিছুই তাকে সংকল্পচ্যুত করতে পারেনি। সে শুধু বলে এসেছে : যিনি মিলিয়ে দিয়েছেন তিনিই প্রাণও ফিরিয়ে দেবেন। তাঁর পাদপদ্মে আমার স্বামীর ভালো মন্দ সমস্ত আমি সমর্পণ করেছি। তিনি যা করেন তাই হবে। ডাক্তারের কোনো আবশ্যক নেই।

অনুরাধার মুখচোখের ভাব দেখে অবাক হ'য়ে গিয়েছিলেন বসুমতী—অবাক হ'য়ে গিয়েছিল গৌরী। এমন দেবতার প্রতি একান্ত বিশ্বাস আর কখনো দেখেননি তাঁরা।

বসুমতী দেবীর কথা মতো পরদিন ভবানীকে বাড়ির ভেতর নিয়ে যাওয়া হ'ল। নিয়ে যাওয়া হ'ল বটে কিন্তু অনুরাধার অনিচ্ছায়। অবশ্য আর বিশেষ আপত্তিও করেনি সে। কারণ শাশুড়ী এবং ভাসুরের সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদ করতে আর ভালো লাগে না তার। এক ডাক্তার দেখানো নিয়েই তো অশান্তির শেষ নেই। তার ওপর আবার যদি—যাক্, দেখাই যাক না। ভগবান মহাকালের কৃপায় যখন জ্ঞান একবার হয়েছে তখন আর তিনি বিমুখ নিশ্চয় করবেন না।

কিন্তু দুর্ভোগ তখনো কাটেনি। বাড়িতে নিয়ে যাবার পরই ভবানী আবার সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললো। এবং দু'একদিনের মধ্যেই কঠিন রোগাক্রান্ত হ'য়ে পড়লো। শুধু ঠাকুরের চরণামৃতের ভরসায় আর ফেলে রাখা সমীচীন নয় বিবেচনায় গৌরী অনুরাধার কাতর অনুরোধ উপেক্ষা ক'রে শহর থেকে বড় ডাক্তার নিয়ে এলো।

ডাক্তার রোগী দেখে নাক কোঁচকালেন। বললেন: লিভার পেকেছে—এই বেলা অপারেশন করালে বাঁচলেও বাঁচতে পারে। আর দেরি করলে শিবের অসাধ্য।

অতঃপর—

একদিকে চললো চিকিৎসার রাজকীয় আয়োজন, অন্যদিকে অনুরাধার মহাকালের দরবারে নিত্য অশ্রুঝরা মর্ম-ছেঁড়া প্রার্থনা। সকাল সন্ধ্যা সে দেবতার চরণামৃত এনে স্বামীকে পান করায়, অঙ্গে লেপন করে দেয়। আর ক'রে প্রাণান্ত সেবা।

এমনি ক'রে দীর্ঘ ছ'মাস যমে মানুষে চললো সংগ্রাম। অবশেষে দেবতা প্রসন্ন হলেন।

ভবানী আরোগ্য হ'য়ে উঠলো আস্তে আস্তে।

ডাক্তার তাকে পরীক্ষা ক'রে সন্তোষ প্রকাশ করলেন। বললেন: এবার কিছুদিনের জন্যে কোনো স্বাস্থ্যকর জায়গায় হাওয়া বদলে এলে —ব্যস্! আর কোনো গণ্ডগোল থাকবে না। কিন্তু—

একটু হাসলেন ডাক্তার ভবানীশংকরের দিকে চেয়ে। তারপর বললেন : কিন্তু এ স্বাস্থ্যে আর কোনোদিনই কোনো রকম অত্যাচার চলবে না, এই বলে দিলুম। অতিশয় সাবধানে থাকতে হবে !···

এইবার তোড়জোড় চললো বিদেশ যাত্রার।

কোথায় যাওয়া হবে ? কে কে সঙ্গে যাবে ? প্রভৃতি কতো আলোচনা।

ভবানী কিন্তু নির্বিকার। তার ইচ্ছাও নেই, অনিচ্ছাও নেই। যে যা বলছে শুনে' যাচ্ছে মাত্র। তাকে কোথায় যাওয়া হবে, জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর দিয়েছে : তোমরা যেখানে ভালো বোঝ।

মোট কথা ভবানীর যেন নব জন্ম হয়েছে সমস্ত দিক দিয়ে। সে এখন সর্ব ব্যাপারেই অনুরাধার ওপর নির্ভরশীল। এতোদিন পরে যেন অনুরাধা তাকে একান্ত ভাবে জয় ক'রে নিয়েছে।

বিগত দিনের কথা চিন্তা করে এখন ভবানী অনুতাপ করে। ভাবে কী করেছে সে। হীরে ফেলে কাচের মোহে অন্ধ হ'য়েছিল! ছিঃ—

অনুরাধা তার মনের ভাব বোঝে, কিন্তু কোনোদিন ভুলেও কোনো কারণে সে তার অতীত দিনের প্রশ্ন ক'রে তাকে লজ্জা দেয়নি। এমন কী তার থিয়েটার সম্পর্কেও কোনো প্রশ্ন করেনি। কেমন করে তার এই সর্বস্বান্ত অবস্থা হ'ল, তাও জিজ্ঞাসা করেনি।

ভবানীও কিছু বলেনি। ভবানী সে-সব কথা ভুলেই যেতে চায়। মন থেকে ধুয়ে মুছে সব বার ক'রে দিতে চায়। কেবল একদিন হঠাৎ কেমন করে অশোকের কথা উঠে পড়েছিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে সে আলোচনা বন্ধ হ'য়েও গিয়েছিল।

যাই হোক, অবশেষে বহু তর্ক বিতর্কের পর মুসৌরী যাওয়া স্থির হ'ল। সেখানে মাস কয়েক থেকে স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি হ'লে আরো কোনো কোনো জায়গায় পরিভ্রমণ করার কথাও হ'ল।

ভবানীর সঙ্গে অনুরাধা, একজন দাসী এবং একটি ভৃত্য যাবে। আর যাবে করালীচরণ। গৌরীও যাবে তবে তাদের পৌঁছে দিয়ে চলে আসবে। দীর্ঘকাল বাড়ী ছেড়ে থাকলে তার চলবে না। অন্য কোনো ব্যাপার হ'লে কিছুতেই যেত না সে। যাবার উপায় কই তার? যেদিকে সে না তাকাবে সেই দিকেই একটা না একটা গণ্ডগোল। তার ওপর আবার এক সর্বনেশে গুজব শোনা যাচ্ছে—ভারতবর্ষ থেকে নাকি সমস্ত জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হ'য়ে যাবে। এবং সে ব্যবস্থা পাকা করবার তোড় জোড় নাকি ভারত সরকার আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন। জমিদারি উচ্ছেদ বিলও নাকি পাশ হ'য়ে গেছে। শোনো কাণ্ড! এখন কখন কী হয়—কখন তারই জমিদারিতে টান পড়ে কে জানে! কাজেই এ সময় বাইরে হাওয়া খেয়ে বেড়ানো তার পক্ষে সম্ভব নয়।

বসুমতী দেবী বলেছিলেনঃ এতো যখন হ্যাঙ্গামা বলছ বাপু, তখন তুমি না হয় ওদের সঙ্গে নাই গেলে।

—নাই গেলে—হুঁ!

মুখখানার অদ্ভুত এক রকম ভাব প্রকাশ করে গৌরী বলেছিলঃ বেশ বললে তুমি! কার ভরসায় আমি এতো বড় একটা রুগীকে এতো দূর পাঠাবো? তোমাদের আর কী? ভাবনাও নেই, চিন্তাও নেই।

—তা কী করবো? তোমার মতো দিনরাত গালে হাত দিয়ে ভবানী ভবানী করবো? যে যেমন কাজ করেছে তেমনি ফলভোগ করবে। অতো মায়া আমার নেই বাপু তোমার মতো।

—তা থাকবে কেন? নইলে বাবার সঙ্গে ষড় করে ভাইটাকে আমার—তোমাদের অবিবেচনার জন্যেই তো ও অমন বিগড়ে গেছল।

—দেখ গৌরী! যখন তখন এক কথা ভালো লাগে না বলে দিচ্ছি।

—ওই তো তোমার দোষ, একটুতেই অমনি রেগে যাও।

—বেশ যাই তো যাই! আমার কাছে আর তুমি কাজের ফিরিস্তি দাখিল করতে এসো না। যা বোঝ করগে'।

বেশ রাগ এবং বিরক্তি সহকারেই বসুমতী দেবী চলে যান।

বিরক্ত হওয়াও বিচিত্র নয়—যেদিন থেকে ভবানী এসেছে সেইদিন থেকেই এই সব কথা দিনে অন্তত চার পাঁচ বার করে শুনে শুনে তিনি অস্থির হ'য়ে পড়েছেন। আর সেই সঙ্গে শুনে আসছেন গৌরীর কাজ আর বিপুল দায়িত্বের কথা। আর সে পারে না—তার বিশ্রাম আবশ্যক। অথচ তার বিশ্রামের উপায় নেই। বাবা তাকে সংসারের ঘানিতে এমন বেঁধে দিয়ে গেছেন যে না মরলে তার আর বিশ্রামের আশা নেই। তার ওপর ছোট ভাইয়ের ন্যায্য অংশ ফাঁকি দিয়ে কী অধর্মই যে করছে তারা! ভবানীর দোষ কী? কী স্বার্থেই বা সে পড়ে থাকবে এখানে? স্ত্রী আর ভাইয়ের হাত তোলা হ'য়ে কেনই বা পড়ে থাকবে সে। একটু ভালো হলেই হয়তো চলে যাবে আবার!

এই সব আবোল তাবোল নানা কথা দিন রাত শুনে শুনে অধৈর্য হ'য়ে পড়েছেন বসুমতী।

গৌরী যে কী করবে কিছুই যেন স্থির করতে পারছে না ভবানীর সম্বন্ধে।

॥ পনেরো ॥

কোলকাতায় এসে এবার নিজেই একজন ছায়াচিত্রের প্রযোক্তা হ'য়ে একটি ছবি তোলার আয়োজন করতে লেগে গেছে উল্লাসী। উল্লাসী এবার নতুন নাম ধারণ করেছে—অশোকা দেবী। চিত্র প্রতিষ্ঠানের নামকরণ হয়েছে—'অশোকা পিক্‌চার্স'। অশোকা পিকচার্স নামকরণের উদ্দেশ্য কী এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে উল্লাসী শুধু মৃদু হাসে—কোনো উত্তর দেয় না।

একখানি গল্পও লেখানো হ'য়েছে একজন সাহিত্যিককে দিয়ে। তার বিষয়বস্তু রচিত হয়েছে প্রাচীন কাহিনী অবলম্বন করে।

এটা উল্লাসীরই নির্দেশ।

এখনও উল্লাসীকে দেখে সহসা চোখ ফেরানো যায় না। নায়িকা হবার যোগ্য চেহারা বটে। অথচ বয়স তো কম হ'ল না। কিন্তু রূপ যেন দিন দিন বাড়ছেই।

কোনো দিকে কোনো অভাব এখন তার নেই। শিউনারাণ আগরওয়ালা তার কোনো অভাবই রাখেনি।

বিরাট বাড়ি, মস্ত গাড়ি। চারিদিকে পরিচারক পরিচারিকার দল তার এতোটুকু নির্দেশের প্রতীক্ষায় তার মুখের দিকে চেয়ে আছে।

শিউনারাণ তাকে রাণীর আদরে রেখেছে। বাড়ি গাড়ি সব তার নামে করে দিয়েছে। ফিল্ম কোম্পানি করবার জন্যে নগদ পাঁচ লাখ টাকা দিয়েছে। বলেছে—অন্য লোকের ছবিতে পার্ট ক'রে অর্থ উপার্জন করার কোনো আবশ্যক নেই তার। 'সে নিজে স্বাধীন ব্যবসা করুক। যতো টাকা লাগে শিউনারাণ দেবে। আরো একটা

অনুরোধ জানিয়েছে—যে, যদি সে নিজে আর অভিনয় না করে তাহলে অত্যন্ত খুশী হবে শিউনারাণ।

সে কথায় উল্লাসীর মুখে কেবল একটা অবোধ্য বাঁকা হাসি ফুটে উঠেছিল ক্ষণিকের জন্যে। হাঁ না কোনো কথাই বলেনি।

এমনি করে কটা মাস কেটে গেল। উল্লাসীর ছবির কাজ আরম্ভ হ'য়ে গেছে। স্বনামখ্যাত এক পরিচালকের তত্ত্বাবধানে উল্লাসী নিজেই ছবিখানির পরিচালনার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

কী আশ্চর্য জীবন উল্লাসীর।

মাঝে মাঝে নিজেই কেমন বিমনা হ'য়ে পড়ে সে নিজের দিকে চেয়ে। কোথায় ছিল সে আর কোথায় আজ এসেছে! কোথায় সেই সার্কাস দলের খেলোয়াড় হ'য়ে বাঘ ভল্লুকের খেলা দেখানো আর কোথায় আজ সিনেমার পরিচালিকা।

বছরগুলো তার জীবনের ওপর দিয়ে পরিবর্তনের পর পরিবর্তনের কী গভীর রেখা আঁকতে আঁকতে যে যাচ্ছে!

কিন্তু এর মূলে কে? অশোক। তার গুরু অশোক! অশোকের জন্যেই আজ তার এই উন্নতি। অশোক না থাকলে হয়তো তাকে আজ অতি সাধারণ পতিতার জীবন যাপন করতে হতো।

অশোকের উদ্দেশে মনে মনে প্রণাম জানায় সে।

অশোক এখন কোথায় আছে কে জানে! হয়তো এ লাইন ছেড়ে দিয়েছে, হয়তো হলিউডে যাবার শখ ছিল, চলে গেছে। কিংবা হয়তো বেঁচেই নেই।

অশোককে আজও ভুলতে পারেনি উল্লাসী।

কিন্তু যাই হোক, জীবনে যে-যে বস্তু কাম্য ছিল পরিপূর্ণ ভাবে ভোগ করে নিয়েছে সে। আর কী চাই?

নাম যশ খ্যাতি অর্থ বিলাসের প্রাচুর্য। কিছুরই অভাব নেই তার। রূপ যৌবন তার এতো অত্যাচারেও তার দেহখানার মায়া

পরিত্যাগ করতে পারেনি! আর পুরুষ? এক মাত্র অশোক ব্যতীত যাকে কামনা করেছে সে, সে-ই ধন্য হ'য়ে গেছে। তার যা কিছু সম্বল উজাড় ক'রে এনে দিয়েছে তাকে। এমন কী তার জন্যে একটি পুরুষ জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছে।

কিন্তু তবুও কী মনে শান্তি পেয়েছে সে? বোধ হয় পায়নি।

ভালো করে মনের দিকে তাকালে মনে হয় যেন কোথায় একটা বিরাট অভাব রয়ে গেছে সেখানে। মনে হয় যেন এই উৎকট প্রাচুর্যময় জীবন অসহনীয় হ'য়ে উঠছে তার।

এখন মাঝে মাঝে অশোকের একটি তিরস্কার প্রায়ই মনে পড়ে। তার কোনোরূপ অসংযত ব্যবহার দেখলে অশোক বলতো: তোমার দোষ নেই উল্লাসী। তোমার কাছে এর বেশি আশা করাই ভুল। দাঁড় কাক ময়ূরের পালক এঁটে ময়ূর হ'তে পারে না। তোমার যোগ্য স্থান ছিল সেই সার্কাসের দল।

অপমানে অভিমানে কেঁদে ফেলতো সে অশোকের সে-কথায়!

আজ ইচ্ছে ক'রে অশোককে দেখাতে যে তার স্থান কোথায়? কোনো কামনাকেই মনের তলায় টুঁটি টিপে মেরে ফেলেনি সে। ভোগ করেছে—জীবনটাকে পরিপূর্ণরূপে ভোগ করেছে সে। এখনো করবে।

অভিলাষ করেছে আগামী বছরে সে সাগরপারে ঘুরে আসবে। অনেক দিনের বাসনা। এ বাসনা অশোকই জাগিয়ে দিয়েছিল তার মনে। এ-ও সে অপূর্ণ রাখবে না। কেন রাখবে? তার অভাব কী? শুধু একটি মাত্র অভাব। সারা মন প্রাণ সে অভাবের জন্যে মরুভূমির মতো খাঁ খাঁ ক'রে দিবারাত্রি। কিন্তু সে অভাবের পূরণ নেই। নিজেই সাধ ক'রে একদিন তার পথ রুদ্ধ ক'রে দিয়েছে সে। আজ শত কান্না কাঁদলেও মা হবার গৌরব অর্জন করতে পারবে না আর। কাজেই সে-অভাবটাকে মনের গভীরে ঘুম পাড়িয়ে অন্য অভাব পরিপূরণের চেষ্টায় সর্বদা সচেষ্ট থাকে।

জীবনের খতিয়ান খুলে মাঝে মাঝে বসে এমনি সব কতো কথাই চিন্তা করে উল্লাসী।

বেশ আছে—ভালোই আছে সে বিলাস সমুদ্রে গা ভাসিয়ে দিয়ে। সামনে তাকাতে নেই—পেছনে তাকাতে নেই, শুধু ভেসে যাওয়া। কোথায় পৌঁছবে, পৌঁছবে কী না পৌঁছবে—তারও চিন্তা করে না সে।

ছবির কাজ পুরা দমে চলেছে। প্রায় অর্ধেকের মতো ছবি ইতিমধ্যে উঠে গেছে। সংশ্লিষ্ট সকলেরই ধারণা, ছবিটি দর্শকমহলে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করবে। উল্লাসীও সেইরকম আশা পোষণ ক'রে।

এমনই সময় একদিন একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেল।

সেদিন ছিল রবিবার। স্টুডিও যাবার তাড়া নেই। কাজ কর্মও হাতে বিশেষ কিছু নেই।

শিউনারাণ আজ কদিন হ'ল বাইরে গেছে কী এক বিশেষ প্রয়োজনে। সুতরাং অনিচ্ছার হাসি মুখে ফুটিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে বসে তার প্রণয় সম্ভাষণ শুনতে হবে না।

বাস্তবিক পুরুষগুলো কী সবই এক প্রকৃতির! কী তোষামোদই না করতে পারে ওই পুরুষগুলো! আর তারা স্বার্থের খাতিরে নির্বিবাদে পরিপাক করে সেই তোষামোদ।

দোতলার বসবার ঘরে একখানা আরাম কেদারায় দেহ এলিয়ে দিয়ে এই সব পাঁচ ভাবনা ভাবছিল উল্লাসী। সামনে একটা ছোট টেবিল কতকগুলো কাগজ পত্র ছড়ানো পড়ে ছিল। বোধ হয় ছবি-সংক্রান্ত কাগজপত্র। আগামী কাল ছবির কোন কোন অংশ গ্রহণ করা হবে সেটা স্থির করার উদ্দেশ্য নিয়েই বসেছিল উল্লাসী। কিন্তু তার মধ্যে মন বসাতে পারেনি। মন তার কোথায় উধাও হ'য়ে

গেছে। অতীত জীবনের দীর্ঘ ইতিহাস যেন মূর্তি ধরে নৃত্য করছে তার মুদিত চক্ষুর সামনে।

সেই শিশুকালের কথা, সেই বোর্ডিংএ থেকে লেখা পড়া শেখা, তারপর শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে রামলালের সার্কাস দলে যোগদান।

রামলালকে এখনো সুস্পষ্ট মনে আছে তার। মনে আছে কামিনীকে। মনে আছে সার্কাস দলের প্রত্যেকটি লোককে। আর সব চেয়ে বেশি মনে আছে বিশাই মাস্টারকে।

বিশাইয়ের কথাটা মনে পড়তেই সর্ব দেহ রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলো তার। ভেসে উঠলো চোখের সামনে কামিনী-হত্যার সেই ভয়াবহ দৃশ্য!—

বেঁটে কুৎসিত বিশাই কিন্তু সত্যিই ভালোবেসেছিল তাকে। তার ভালোবাসার মধ্যে কোনো ফাঁকি ছিল না। অথচ ইনিয়ে বিনিয়ে এই সব সভ্য সমাজের পুরুষগুলোর মতো অন্তরের ভালোবাসা প্রকাশ করতেও জানতো না।

সভ্য সমাজ!

হাসি পায় উল্লাসীর সভ্য মানুষগুলোকে দেখলে। এদের চলা বলা হাসি কান্না সবই যেন কৃত্রিম—সবই যেন মাপা জোপা। একটু এদিক ওদিক হ'লেই অসভ্য! এদের জীবনও কৃত্রিমতার আবরণে আচ্ছন্ন। সত্য জীবনকে এরা প্রায় ভুলেই গেছে। প্রকৃতিকে এরা চোখ রাঙিয়ে, চাবুকের ঘায়ে সভ্য ক'রে তুলতেই ব্যস্ত। কিন্তু পারে কী? মাঝে মাঝে এদের আদিম প্রবৃত্তি শত শাসনের মধ্যেও আত্মপ্রকাশ করে বসে।

নাঃ, এ জীবনে সুখ নেই। এ যেন সময় সময় প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। মনে হয়, ছুটে পালায় কোনো বনজঙ্গলে। যেখানে জীবন স্বচ্ছন্দ, যেখানে এই সভ্যতার কৃত্রিমতা নেই। মানুষ যেখানে প্রাণ খুলে হাসে কথা কয়। মাপ জোপের কারবার নেই! ভালোবাসার জন্যে যেখানের মানুষরা ছলনার আশ্রয় নেয় না অথচ প্রণয়ীর জন্যে

অকুণ্ঠিত ভাবে জীবন বলি দিতে পারে। সেই তার আবাল্যের পরিচিত পরিবেশে—সেই অসভ্য দুরন্ত স্বভাব নর-নারীর মধ্যে ফিরে যাবার জন্যে মাঝে মাঝে ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে তার মন।

বেশ ছিল সে! কারো মন জুগিয়ে মনের বিরক্তি মুখের হাসিতে ঢেকে চলবার আবশ্যক ছিল না। বনে বাদাড়ে যথেচ্ছ ঘুরে ঘুরে পশু পক্ষী শিকার ক'রে বেড়ানো। বনের ফল মূল পেড়ে আনন্দে খাওয়া। গলা ছেড়ে মনের খুশিতে গান গাওয়া, কথা কওয়া কিংবা প্রাণখোলা অট্টহাসিতে নিন্দা করবার কেউ ছিল না। ছল চাতুরি ছিল না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা রূপ চর্চায় ব্যয় করতে হ'তো না। অনাবশ্যক বেশবাস—অকারণ ছলাকলা—দেঁতো হাসি, ছেঁদো আলাপন কোনো দরকার হতো না। এই জীবনটায়—বিশেষ ক'রে এই অভিনেত্রীর জীবনে ঘৃণা জন্মে গেছে তার। এ যেন জীবন-অরণ্যে অবিরত বাসর বদলানো। এ আর ভালো লাগে না।

বেশ ছিল, বেশ ছিল সে সার্কাসদলে সার্কাসওয়ালী হ'য়ে। এমন অর্থের লিপ্সা ছিল না, এমন কামনার দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপাত্র নিয়েও বেড়াতে হ'তো না।

আবার যদি ফিরে যাওয়া যেতো সে জীবনে!

একটু নড়ে চড়ে বসলো উল্লাসী। একটা দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করলে।

নাঃ! সে জীবনে আর ফিরে যাওয়া যায় না। সেই সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন আর পাওয়া যাবে না।

কিন্তু নিশাই কী এখনো আছে? থাকলে কোথায় আছে? সেই তেমনিতর কী মেলায় মেলায় তাঁবু ফেলে সার্কাস দেখিয়ে বেড়াচ্ছে? না যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে গিয়ে কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করছে? অথবা ফাঁসি হ'য়ে গেছে তার! পৃথিবীর সঙ্গে সকল সম্পর্ক শেষ হ'য়ে গেছে!

অনেকদিন পর আজ মনে মনে এই সব তোলাপাড়া করতে গিয়ে

বুকটার মধ্যে কেমন মোচড় দিয়ে উঠলো উল্লাসীর। চোখ দুটো জ্বালা করে দু' ফোঁটা জলও গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়লো। বোধ হয় বাল্য সঙ্গী বিশাইয়ের উদ্দেশেই।

হঠাৎ কলিং বেলটা সজোরে বেজে উঠলো। সে শব্দে চমকে উঠলো উল্লাসী। ভুরু জোড়া কুঁচকে গেল তার। অসময়ে কে আবার বিরক্ত করতে এলো।

পরক্ষণেই ভৃত্য এসে সংবাদ দিলেঃ বিমানবাবু দেখা করতে এসেছেন।

শশব্যস্তে উঠে পড়লো উল্লাসী।

এলো মেলো হ'য়ে পড়া কাপড় চোপড় ঠিক করতে করতে ভৃত্যকে আদেশ করলেঃ যা যা, নিয়ে আয় বাবুকে—এইখানেই নিয়ে আয়।

ভৃত্য প্রস্থান করলে এবং সেও ঘর থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তার দিকে গাড়ি বারাণ্ডাটার ওপর এসে দাঁড়ালো। নিচে তাকিয়ে দেখলে—রাস্তার ওদিকে তার ছবির পরিবেশক রূপশ্রী পিকচার্সএর মালিক বিমান রায়ের প্রকাণ্ড স্টুডিবেকারখানা দাঁড়িয়ে রয়েছে। ড্রাইভারটা গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কাকে দিয়ে যেন গাড়িটা পরিষ্কার করাচ্ছে। ড্রাইভারটা আড়াল ক'রে থাকায় অপর লোকটাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।

ইতিমধ্যে ভৃত্য আগন্তুক বিমান রায়কে ঘরে এনে বসিয়েছে এবং বারাণ্ডায় বেরিয়ে এসে সে সংবাদ গৃহস্বামিনীর গোচর করলে।

—ও, যাই!—

বলেই উল্লাসী ফিরে চলে যেতে গেল। কিন্তু যাবার পূর্বে কী ভেবে আর একবার সে নিচে গাড়িটার দিকে তাকালে। আর তাকাবার সঙ্গে সঙ্গেই পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত যেন একটা বিদ্যুত শিহরণ বয়ে গেল তার। সমস্ত পৃথিবীটা চোখের সামনে নেচে উঠলো যেন। বুকের ভেতর যেন কামারের হাতুড়ির ঘা পড়তে লাগলো। মাথাটা বন-বন ক'রে ঘুরতে লাগলো।

একি, একি দেখলে সে? কাকে দেখলে? এমন অসম্ভব কেমন করে সম্ভব হ'ল? চোখের ভুল তো নয়—ঠিক দেখেছে সে। হ্যাঁ ঠিক দেখেছে। লক্ষ লোকের ভিড়ের মাঝেও বিশাইকে চিনতে কারো ভুল হয় না। ভুল করেনি সে—ভুল করেনি! ও বিশাই—নিশ্চয় বিশাই। হয়তো তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। হয়তো এখনো প্রতিহিংসার আগুন বুকে জ্বেলে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। খুন করবে।

থর থর ক'রে কেঁপে সেইখানে পড়ে গেল উল্লাসী সংজ্ঞা হারিয়ে।

মাসখানেক পরে আবার আকস্মিক ভাবে বিশাইয়ের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল উল্লাসীর। দেখা হ'ল স্টুডিওর গেটে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনিবের গাড়ি সাফ্ করছিল সে। উল্লাসীকে দেখতে পেয়ে কোনো কথাই বললে না, কেবল তার দিকে চেয়ে সেই চির পরিচিত অদ্ভুত হাসি হাসলে একবার।

উল্লাসী চমকে উঠলো। তার সর্ব শরীর হিম হ'য়ে এলো যেন।

কিন্তু মুহূর্তে নিজেকে সংযত ক'রে নিয়ে সেও মৃদু হাসলে। তারপর একবার চারদিকে অকারণে তাকিয়ে একটু ইতস্তত করে চাপা গলায় বিশাইকে বললেঃ এক সময় আমার সঙ্গে দেখা কোরো।

তেমনি অদ্ভুত হাসির সঙ্গে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে বিশাই।

সেই রাত্রেই বিশাইয়ের আবির্ভাব ঘটলো উল্লাসীর গৃহে।

দুজনে অনেকক্ষণ ধরে অনেক সুখ দুঃখের কথা হ'ল।

বিশাই তার সেই কামিনী হত্যার পর থেকে আজ অবধি যা কিছু ঘটেছে সব একে একে বলে গেল।

নির্বাক হ'য়ে শুনলে উল্লাসী।

বিশাই বললে তার সাত বছরের জন্যে দ্বীপান্তর হয়েছিল। দ্বীপান্তর থেকে ফিরে পর্যন্ত সে উল্লাসীর সন্ধান ক'রে ফিরছে। কতো জায়গায় কতো খুঁজে খুঁজে শেষে এই মাস তিনেক হ'ল

কোলকাতায় এসে উল্লাসীর ঠিকানা আবিষ্কার করে সে। কিন্তু উল্লাসী এখন এতো বড় হ'য়ে গেছে যে, তার সামনে আসার সাহস সঞ্চয় ক'রে উঠতে পারেনি সে এতোদিন। ভেবেছে, যদি উল্লাসী তাকে না চেনার ভান করে? যদি উল্লাসী কোনো অভিযোগ আরোপ ক'রে তাকে পুলিসে ধরিয়ে দেয়! দাগী আসামী সে—পুলিস তৎক্ষণাৎ তাকে আবার কয়েদে পুরবে!

অনেক ভেবে সে অবশেষে বিমানবাবুর কাছে চাকরি নিলে। গাড়ি ধোয়া মোছা করার চাকরী। আজ তিন মাস এই চাকরীই করছে সে। উল্লাসীকে এর আগে অনেকবারই দেখেছে। আর যতোবার দেখেছে ততোবারই মনে হয়েছে তার বাবুজীর কথা।—

বাবুজী অর্থাৎ তার পিতা রামলাল।

বাবুজী বলতো উল্লাসীর সঙ্গে তার শাদি হবে। দুজনে তারা স্বাধীনভাবে সার্কাসের ব্যবসা করবে। কিন্তু আজ উল্লাসী কোথায় আর সে কোথায়? উল্লাসী এখন মস্ত বড়লোক, কতো মান কতো যশ তার—আর সে যে বিশাই সেই বিশাই। আগে তবু একটা সার্কাস দলের মালিক ছিল, এখন তাও নেই—এখন সে কুড়ি টাকা মাইনের একটা গাড়ি মোছা চাকর।

রামলালের ছেলে আজ চাকরগিরি করছে।

পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ হ'য়ে বসে বসে বিশাইয়ের সমস্ত কথাগুলি শুনে গেল উল্লাসী। আজ বহুদিন পরে রামলালের নামটা শুনে বুকের ভেতর কেমন টন টন করে উঠলো তার। চোখের জল বাধা মানলো না। ছেলেবেলাকার ছোট বড় কতো ঘটনা একটার পর একটা মনে পড়তে লাগলো। কী স্নেহ দিয়েই রামলাল না মানুষ করেছিল তাকে।

রামলালের অন্তিম বাসনা কিন্তু রক্ষা করতে পারেনি সে। সভ্য হবার মোহে, খ্যাতির মোহে অসম্মান করেছে সে পালকপিতা রামলালকে।

কিন্তু মোহ তো আজ ভেঙে গেছে তার। এখনো কী কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করা যায় না? এই অর্থ অট্টালিকা, এই কৃত্রিম জীবনযাপন, এই ভালোবাসার একটানা একঘেয়ে অভিনয়, এ কি পরিত্যাগ করে আবার সেই পুরাতন সত্য জীবনে ফিরে যাওয়া যায় না? যায় না কি বিশাইয়ের বাসনা পূর্ণ করে রামলালের আত্মার শান্তি বিধান করা?

নিশ্চয় যাবে, নিশ্চয় যাবে। কেন যাবে না! এই শ্বাসরোধ করা সভ্য আবহাওয়া, আদিম প্রবৃত্তির মুখে সভ্যতার প্রলেপ লাগিয়ে ঘুরে বেড়ানো তার সইছে না আর। এ থেকে সে মুক্তি চায়। এই ছলা কলা, প্রেমের অভিনয় অনেক হয়েছে। আর ভালো লাগে না।

একে একে অসংখ্য পুরুষের মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠলো তার। ভেসে উঠলো অশোকের মুখ। ভেসে উঠলো ভবানীর মুখ, বাসবের মুখ, অমিতাভর মুখ, শিউনারাণের মুখ। ভেসে উঠলো আরো কতো শত মুখ। যারা তার এই দেহখানিকে স্বর্গের সঙ্গে তুলনা করেছে। তার অধরে অমৃতের আস্বাদ পেয়েছে। কিন্তু সে কী পেয়েছে তাদের কাছে?

কিছু না। কিছু না। তবে কেন, কিসের আকর্ষণে এখানে পড়ে থাকবে সে? থাকবে না।

আবার নতুন করে যদি সেই পুরোনো জীবন শুরু করে ক্ষতি কি!

মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করছে উল্লাসীর। সমস্ত শরীর যেন কেমন করছে।

কতোক্ষণ—কতোক্ষণ এমনি ভাবে কেটে গেল। তারপর—

হঠাৎ যেন মাথার মধ্যে কী ঘটে গেল উল্লাসীর। উন্মাদিনীর মতো ছুটে এসে বিশাইয়ের একখানা হাত সজোরে চেপে ধরে বলে উঠলোঃ আমি যাবো—আমি যাবো বিশাই। আমি তোর সঙ্গে

চলে যাবো। আবার আমরা তেমনি ক'রে সার্কাস ক'রে বেড়াবো।— আবার আমরা নতুন করে সেই পুরোনো জীবন শুরু করবো। চল বিশাই—

বিশাইয়ের ছোট ছোট চোখ দুটো আরো ছোট হ'য়ে গেল। পুরু পুরু ঠোঁট দুটো চিড় খেয়ে গেল যেন। আর তার ফাঁকে ফুটে উঠলো সেই অদ্ভুত দুর্বোধ হাসি।

বোধ করি উল্লাসীর এই উত্তেজনাকে পাগলামি ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারলে না সে। এই বৈভব, এই বিলাস জীবন, এই যশ খ্যাতি ফেলে কী মানুষ আবার সেই নিঃস্ব-বন্য-জীবনে ফিরে যেতে পারে? উল্লাসীর হয় মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে নয় তার সঙ্গে তামাশা করছে!

উল্লাসী কিন্তু ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। তাকে নিরুত্তর দেখে বলে উঠলো: বিশাই! তুই চুপ ক'রে থাকিস না। আমায় নিয়ে চল।

—হি হি—

আকর্ণ বিস্তৃত একটা বীভৎস হাসি হাসলে বিশাই।

—সত্যি যাবি তু?

—হ্যাঁ। সত্যি, সত্যি, সত্যি!

—ই-সব তুর ঘর বাড়ি টাকা কড়ি সব লিয়ে যাবি?

—না। ই-সব তো আমি সঙ্গে ক'রে আনি নাই—ই-সব আমার লয়।

—হি হি—তবে যাই চ'।

উঠে দাঁড়িয়ে বিশাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালে উল্লাসীর মুখের দিকে। মুখে তখনো তার তেমনি অবিশ্বাসের বাঁকা হাসি।

॥ ষোল ॥

দীর্ঘ একটি বৎসর পর আজ মাস দুই হ'ল ভবানীশংকর রাধানগরে ফিরে এসেছে স্বাস্থ্যোদ্ধার ক'রে।

এখন ভবানীকে দেখলে মনে হয় এই এক বৎসরে কে যেন তাকে সম্পূর্ণ ভেঙে' চূরে নতুন মানুষ তৈরি ক'রে দিয়েছে। তার প্রকৃতিরও অস্বাভাবিক পরিবর্তন হয়েছে। এক বছর আগের ভবানীর সঙ্গে এ ভবানীর কোনো মিল নেই যেন। অনুরাধা ভিন্ন এখন আর ভবানীর এক মিনিট চলে না। নিজের ভালো মন্দ, বিচার বিবেচনা সমস্ত কিছুর ভার অনুরাধার ওপর ছেড়ে দিয়ে সে নিশ্চিন্ত হয়েছে।

ভবানীর আচার ব্যবহার দেখে গৌরীশংকরের খুশীর অন্ত নেই। বসুমতী দেবী মহাকালের দরবারে নিত্য পূজা মানত করেন।

আর অনুরাধা?

অনুরাধার হৃদয় নিঙড়ে প্রতি মুহূর্তে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি দেবতার পায়ে আছাড় খেয়ে পড়ছে। দেবতার অনুগ্রহে তার জীবন ধন্য য়েছে এতোদিনে।

মুশৌরীতে মাস তিনেক মাত্র ছিল ভবানীরা, তারপর হরিদ্বারে যায়। হরিদ্বারে যায় অনুরাধারই একান্ত আগ্রহে এবং সেখানে প্রায় ছ'মাস অতিবাহিত করে।

— এই ছ'মাসের স্মৃতি কোনোদিন মুছে ফেলতে পারবে না মন থেকে অনুরাধা—পারবে না ভবানীশংকর।

এ ক'মাসের স্মৃতি অক্ষয় হ'য়ে থাকবে তাদের মনের মণিকোঠায়। এতোটা কেউই আশা করেনি। অনুরাধাও না, ভবানী তো

নয়ই। তারা আশা করেনি যে এমন আচম্বিতে অশোকের সঙ্গে দেখা হ'য়ে যাবে এখানে।

দেখা হয় প্রথমে করালীচরণের সঙ্গে। এখানে পৌঁছবার পরদিন প্রভাতে গঙ্গাস্নান করতে যায় করালী এবং সেখানেই অশোকের দর্শন পায়। যে ঘাটে করালী স্নান করতে গিয়েছিল সে ঘাটটি স্নানার্থীদের কলরব মুখর ছিল না, বেশি লোকজনও ছিল না। সেই ঘাটটির একটি নির্জন প্রান্ত থেকে বড় মধুর ভজনের সুর শোনা যাচ্ছিল দু'চার জন স্নানার্থী স্নান ভুলে মুগ্ধ হ'য়ে শুনছিল সে অপূর্ব গান দু' একজন বাবুও স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে বেড়াতে বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এদিকে এসে পড়েছিলেন এবং গান শুনে দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

ভোরের বাতাসের বুকে সুরের উত্থান পতন যেন এক অপরূপ মায়ালোকের সৃষ্টি করেছে।

বৃদ্ধ করালীও সে সুরের মায়ায় সম্মোহিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তারপর কখন সুরের আকর্ষণে পায়ে পায়ে সে গায়কের দিকে এগিয়ে গেছে জানতেও পারেনি। দৃষ্টি তখন তার ঝাপসা হ'য়ে গেছে চোখের জলে।

তার কিছুক্ষণ পরেই গান থামলো। আর গান থামার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে—

—আরে, করালীবাবু! আপনি এখানে?

এই বলে কে তার কাঁধে একটা হাত রাখলে।

তাড়াতাড়ি চোখ দুটো মুছে নিয়ে বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে করালী পরিপূর্ণ ভাবে তাকিয়ে দেখলে। দেখলে তার সামনে দাঁড়িয়ে এক সৌম্য দর্শন প্রশান্ত মূর্তি। সারা মুখখানি শ্মশ্রু মণ্ডিত, দৃষ্টি বড় শান্ত বড় গভীর। চেনা চেনা মনে হচ্ছে, অথচ—

তার বিস্ময়-বিহ্বলভাব লক্ষ্য ক'রে হেসে উঠলো হো হো ক'রে লোকটি।

হাসির ধরনটাও যেন কতো পরিচিত। অথচ—

—আমাকে চিনতে পাচ্ছেন না আপনি ?

—না, ঠিক—মানে ! কিন্তু যেন—

—আমি অশোক।

—অ্যাঁ !

হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে অশোককে জড়িয়ে ধরলে করালী।

—অশোকবাবু। আপনি, আপনি ! আমি কিন্তু এ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি—

অশোকের আপাদমস্তক একবার ভালো ভাবে নিরীক্ষণ ক'রে করালী বললেঃ একেবারে চেনবার যো নেই যে। মানে, আমি তো একেবারেই চিনতে পারতুম না, যদি না পরিচয় দিতেন। ছোটবাবুও চিনতে পারবেন বলে মনে হয় না—ছোট মা-ও বোধ হয় না।

—আপনার ছোটবাবু ছোট মা কোথায় ? এখানে এসেছেন নাকি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি তাঁদের সঙ্গেই এসেছি।

অশোক যেন একটু বিস্মিত হ'ল। কিন্তু তেমনি হাসি মুখেই জিজ্ঞাসা করলেঃ আর কে এসেছেন সঙ্গে ?

—আর কেউ না। একজন ঝি।

—ও। তা ভবানী এখন বেশ ভালো আছে তো ?

—ভালো ? ভালো কি ছিল বাবু ! ছোট-মা যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন। তা বাবা মহাকালের দয়ায় এখন আর কোনো রোগভোগ নেই। বদ্‌খেয়ালও গেছে !

—তাই নাকি ?

একটু যেন আশ্চর্য হ'ল অশোক। কপাল কুঁচকে করালীর মুখের দিকে তাকাল।

ব্যাপারটা কি সব খুলে বলুন তো। ভবানীর থিয়েটার—

—সে আর বলবেন না—সে সব জাহান্নমে গেছে।

বলেই এক গাল হাসলে করালী। তারপর হাসতে হাসতেই আগাগোড়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা ক'রে গেল আস্তে আস্তে।

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনলে অশোক। তারপর তেমনি মৃদু হাসির সঙ্গে বললেঃ ভারা দেখতে ইচ্ছে করছে ভবানীকে। চলুন একবার দেখা ক'রে আসি। বউদিকেও অনেকদিন দেখিনি—একটা প্রণাম ক'রে আসি অমনি।

এখানে এমন অভাবনীয় ভাবে অশোককে পেয়ে বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হ'য়ে পড়লো ভবানী আর অনুরাধা। এ যেন স্বপ্নেরও অগোচর। আনন্দের আতিশয্যে ভবানী তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলে উচ্ছ্বসিত হাসির সঙ্গে।

অনুরাধাও শিশুর মতো করতালি দিয়ে উঠলো।

—ঠাকুরপো!

ভবানী সহাস্যে বললেঃ এ কী চেহারা করেছিস্ অশোক? এ যে একেবারে চেনা যায় না রে।

—ভালো মেক্ আপ নিতে জানলে চেনার অসুবিধে হয় বইকি।

হাসতে লাগলো অশোক তাদের দিকে চেয়ে নিজের দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে।

তারপর কতো হাসি কতো কথা কতো উচ্ছ্বাস উদ্বেল হ'য়ে উঠলো তাদের মধ্যে।

কথায় কথায় জানা গেল, মাসখানেক পূর্বে অশোক গুরুদেবের কাছে এখানে এসেছে। গুরুদেব অর্থাৎ সংগীতাচার্য বামদেব মিশ্র। গুরুদেবের এ জায়গাটা বড্ড ভালো লেগেছে। ইচ্ছা এখানেই জীবনের অবশিষ্ট দিনকটা অবস্থান করবার। আরো ইচ্ছা আছে, শরীর বইলে একবাব সুবিধামত বদরিকাশ্রম দর্শন ক'রে আসবার। অশোকেরও সেই রকম ইচ্ছা।

বড়ই শান্তিতে আছে এখন অশোক। ইতিমধ্যে সে ভারতের প্রায় সকল তীর্থই দর্শন ক'রে ধন্য হয়েছে। কেবল বাকী আছে

অমরনাথ আর বদরিকা। এবার তারই আগ্রহাতিশয্যে বদরিকা যাওয়া ঠিক হয়েছে। নইলে গুরুদেবের যা শরীর! তিনি কোথাও যেতে চান না আর—পারবেনও না। তিনি বলেন, ঘুরে ঘুরে তীর্থ দর্শন ক'রে পুণ্য সংগ্রহ করার চেয়ে ঘরে বসে ভগবানকে দু'খানা গান গেয়ে আরাধনা করলে অনেক বেশি পুণ্য হবে। করেনও তাই। নিজে এখন আর দম রাখতে পারেন না—এখন তাই অশোকের ওপর ভার পড়েছে প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় তাঁর নির্দেশ মতো দু'খানি ক'রে ভজন গান তাঁকে শোনাবার। এখন আর অশোকের গুরুদেবকে ছেড়ে কোথাও যাবার উপায় নেই।

অশোকের সমস্ত কথা শুনে একটা দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করলে ভবানী। অশোক সম্বন্ধে ভবানীর মনে যে একটা ভ্রান্ত ধারণা ছিল, এতোদিনে তার অবসান হ'ল।

অনুরাধা অশোককে জিজ্ঞাসা করলেঃ ঠাকুরপো কি তাহলে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত সাধুই হ'য়ে গেলে?

—সাধু!

হো হো ক'রে হেসে উঠলো অশোক।

—সাধু আর হ'তে পারলাম কই বউদি? আমি যা ছিলাম তাই আছি। তবে কবির ভাষায় বলতে গেলে, বলতে হয়—এই জীবনেই হ'ল আমার জন্মজন্মান্তর! নইলে যে অশোক সেই অশোকই আছি। অভিনয় আগেও করতাম, এখনও করি।

—অভিনয়?

সবিস্ময়ে তার দিকে তাকালে ভবানী।

—এখন আবার কোথায় কী অভিনয় করো?

—করি বইকি ভাই। তবে এ অভিনয় যাঁর সন্তুষ্টি উৎপাদনের জন্যে সে রসিক দর্শকটিকে চোখে দেখা যায় না। অন্তত আমি দেখতে পাই না। তিনিই দৃষ্টির অন্তরালে থেকে আমায় নানা সাজে সাজাচ্ছেন—অভিনয় করাচ্ছেন—গান গাওয়াচ্ছেন। আমিও

তাঁর নির্দেশে সব কিছু করে যাচ্ছি। কিন্তু তাঁকে অভিনয় দেখাতে কিংবা গান শোনাতে বড় আনন্দ পাই ভাই—বড় তৃপ্তি পাই।

অনুরাধা বললেঃ তোমার আধ্যাত্মিক কথা এখন রাখো তো ঠাকুরপো! বলি বউদির কথা কী তুমি একেবারেই ভুলে ছিলে এতোদিন ?

—তা সত্যি কথা বলতে গেলে এক রকম তাই বলতে হয় বটে। তবে গুরুদেব তোমার কথা প্রায়ই বলেন। বিশেষ যখন তোমার মাসিক দক্ষিণাটা আসে।

—কী বলেন ?

—বলবেন আর কি, তোমায় আশীর্বাদ করেন। চলো না—যাবে আজ আমাদের আশ্রমে। তোমাদের দেখলে সত্যি ভারি খুশী হবেন গুরুদেব।

বাস্তবিক কী আশ্চর্য পরিবর্তনই না অশোকের হ'য়েছে। অবাক হ'য়ে ভবানী শুধু তাই ভাবে। ভাবে, সেই থিয়েটার পাগলা অশোক—থিয়েটারের নেশার জন্যে যে জীবনের অনেক বড় বড় সম্ভাবনাকে পদদলিত করেছে—অনেক দুঃখ হাসিমুখে স্বীকার ক'রে নিয়েছে, সেই অশোক আজ পরম ধার্মিক, সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করছে। একদিন যার এতোটুকু হাসি, এতোটুকু মিষ্টি ব্যবহারের লোভে কতো মেয়ে ব্যাকুল হ'য়ে থাকতো, যার একটু ভালোবাসা পাবার লোভে কতো মেয়ে নিজের রূপ যৌবন বিলিয়ে দিতেও কুণ্ঠা বোধ করতো না। মেয়েদের সতীত্ব সম্বন্ধে যে ছিল একান্ত অবিশ্বাসী এবং ভালোবাসার অভিনয়ে কতো মেয়েকে কাছে টেনে এনে পরিশেষে যে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে পরিতৃপ্তি লাভ করতো; আজ সেই অশোক নারীজাতিকে মা ছাড়া সম্বোধন করে না।

আশ্চর্য পরিবর্তন! কোনো বিলাসিতা নেই—কোনো নেশা নেই—সিগারেট ভিন্ন যার এক মুহূর্ত চলতো না সেদিন, সে আর

সিগারেট সইতে পারে না। সদা সর্বদাই প্রশান্ত প্রসন্ন মুখ। দৃষ্টি উদাস স্বপ্নালু। মনে হয় যেন সর্বদাই সে রাগ-রাগিনীর সুর-সমুদ্রে নিমজ্জিত হ'য়ে আছে। কথাগুলি পর্যন্ত কতো মিষ্টি করে বলে অশোক!

ভবানী তাকে শ্রদ্ধা না ক'রে পারেনি।

অশোক আর গুরুদেবের সঙ্গ লাভ ক'রে হরিদ্বারে ছ'টা মাস কী আনন্দেই যে কেটেছে ভবানীর আর অনুরাধার! সে আনন্দের সঞ্চয় সারা জীবন ধরে উপভোগ করবে তারা।

ভবানী জীবনে অনেক গান শুনেছে। অনেক ওস্তাদ গায়ক সুরের ইন্দ্রজাল রচনা করেছে তার সামনে। অনেক নারী কণ্ঠের সংগীতে চিত্ত উন্মাদ হ'য়ে গেছে তার; কিন্তু বামদেব মিশ্র যে গান শুনিয়েছেন, যে গান শুনিয়েছে অশোক তার তুলনা কোথাও নেই। ছ'টা মাস যেন কোন সুরের রাজ্যে বিচরণ করেছে তারা।

রাধানগরে এসে পর্যন্ত কেবল অশোকের ভাবনাই ভাবছে ভবানী। অশোককে ছেড়ে আসতে যেন কিছুতেই প্রাণ চাইছিল না। ভবানীরও না, অনুরাধার'ও না।

বহু চিঠি গেছে মায়ের কাছ থেকে, দাদার কাছ থেকে যে, চলে এসো। শরীর সেরেছে, ভালো আছ লিখছ, অথচ আসছ না কেন? এই পত্র পাবার সঙ্গে সঙ্গে চলে এসো। পারো তো আসবার সময় অশোককেও সঙ্গে এনো। এখানে তোমরা না থাকায় বাড়ি খাঁ খাঁ করছে।

তবুও আসতে পারেনি তারা। অশোক নিজেও কম বলেনি তাদের বাড়ি ফেরার কথা। বলেছেঃ এবার তোমরা বাড়ি ফেরো। মাসিমা গৌরীদা বার বার চিঠি লিখচেন, আর তোমাদের এখানে থাকা ভালো দেখায় না। বরঞ্চ আসছে বছর আবার এসে কিছু দিন কাটিয়ে যেও। আমার তো যাবার উপায় নেই, থাকলে আমি নিজে গিয়ে তোমাদের রেখে আসতুম। গুরুদেবকে রেখে

আমি কোথাও যেতে পারবো না আর, যতোদিন গুরুদেব আছেন।
তোমরা ফিরে যাও ভাই—মাকে দাদাকে আমার প্রণাম জানিও।
ভগবানের কাছে কায়মনবাক্যে তোমাদের সর্ববিধ কল্যাণ কামনা
করি। মাঝে মাঝে চিঠি পত্র দিয়ে আমাদের খোঁজ খবর কোরো।
বদরিকা থেকে ফিরে আমি তোমাদের খবর দেব।—

কিন্তু তবুও হরিদ্বারের মায়া কাটিয়ে আসতে পারেনি তারা।

শেষে গৌরীশংকর নিজে গিয়ে একরকম জোর ক'রেই তাদের
নিয়ে এলো।

কথা শেষ

শিবরাত্রি প্রত্যাসন্ন···

এবার ডাকুর-বাদার মহাকালের আর রাধানগরের মহাকালের মহাপূজা এক সঙ্গে একই স্থানে উদ্‌যাপন হবে শিবরাত্রের রাত্রে। তারপর চৈত্র-সংক্রান্তি পর্যন্ত চলবে উভয় বিগ্রহের একই সঙ্গে পূজারতি।

দীর্ঘদিন ধরে এর জল্পনা কল্পনা এবং উদ্যোগ আয়োজন চলছে সাড়ম্বরে। বিরাট আয়োজন হয়েছে। সমারোহের অন্ত নেই। অন্যান্য বৎসরের তুলনায় মেলাও বসেছে এবার অনেক বড়। দেশ দেশান্তর থেকে এসেছে অসংখ্য পণ্যাজীব। এনেছে কতো শত রকমের পণ্যসম্ভার মেলায় বিক্রি করবার জন্যে। মেলার চারিদিকে বসেছে পণ্যবীথি। তা ছাড়া সিনেমা থিয়েটার সার্কাস, ম্যাজিক প্রভৃতি তো আছেই।

প্রাচীনরা বলছেন—মৌগাছির ডাকুর-বাদায় এতো বড় মেলা আর কখনো দেখেননি তাঁরা। এতো লোকের সমাবেশও এর আগে আর কখনো এখানে হয়নি।

ডাকাতে বিল এখন আর বর্ষায় তেমন টইটুম্বুর হ'য়ে যায় না। তার সে ভয়ংকর রূপ আর নেই। অতি বর্ষায়ও আর মহাকালের মন্দির-চূড়া জলের তলায় তলিয়ে যায় না। ডাকাতে বিল এখন বিশুষ্ক প্রায়। কোনো রকমে ক্ষীণ একটি জলস্রোত অতীত স্মৃতি বহন ক'রে প্রবাহিত হচ্ছে।

ডাকাতে বিলের দক্ষিণ পূর্ব কোণের সেই রহস্যময় প্রকাণ্ড বাদাড়টিও এখন প্রায় নিশ্চিহ্ন হ'য়ে এসেছে। সেখানে গড়ে উঠছে

মস্ত মস্ত দুটো কারখানা। একটা পাটের কল কার একটা কাপড়ের।
হাজার কয়েক লোকের বস-বাসের জন্যে ঘন-বিন্যস্ত কুটীর শ্রেণী তৈরি
হচ্ছে সেই সঙ্গে।

মৌগাছি আর সে মৌগাছি নেই। তার রূপও সম্পূর্ণই বদলে
গেছে। আরও যাবে।

মৌগাছির জমিদার বাড়ি আগাগোড়া মেরামত করা হয়েছে
এবার। স্থির হয়েছে ভবানী এইখানে থাকবে কিছুদিন। কিছুদিন
মানে—অন্তত আগামী চৈত্র সংক্রান্তি পর্যন্ত। তারপরও মাঝে মাঝে
এখানে এসে অবস্থান করতে হবে তাকে।

জায়গাটা অনুরাধার বড়ই ভালো লেগেছে।

কিন্তু অনুরাধা কী বুঝতে পারে ভবানীর মনের কথা? পারে
না। পারলে বোধ হয় এ জায়গা তার এমন ভালো লাগতো না।

মৌগাছির নামেই যেন ভবানীর অন্তর কেমন শিউরে ওঠে। মনে
পড়ে যায় অনেক বছর আগের সেই কাহিনী। মনে পড়ে যায়—
সার্কাসওয়ালি উল্লাসীকে, মনে পড়ে যায় কামিনী সর্দারনীকে, মনে
পড়ে যায় খুনী বিশাইকে।

জীবনে ভুলবে না ভবানী সে জ্বালাময় আগ্নেয়-স্মৃতি।

উল্লাসী। সার্কাসওয়ালি উল্লাসী!

উল্লাসী তার জীবনের ওপর দিয়ে প্রভঞ্জনের ঝঞ্ঝা বইয়ে দিয়েছে।
তার জীবনের সমস্ত কল্পনাকে ওলোট পালোট ক'রে দিয়েছে।
রাহুগ্রস্ত সূর্যের মতো সে হারিয়ে গিয়েছিল উল্লাসীর মধ্যে।

উঃ! কি দিনই গেছে!

কিন্তু যাক্ উল্লাসীর কথা। উল্লাসী তাকে মুক্তি দিয়ে গেছে।
এখন জাহান্নমে যাক্ উল্লাসী। উল্লাসীর কথা চিন্তা ক'রে মনকে আর
পীড়িত করতে চায় না ভবানী।

চায় না বটে, তবুও উল্লাসীর কথা মনে পড়লেই আজও কেমন
মনটা ব্যথায় খচ্ খচ্ করে তার।

কোথায় আছে উল্লাসী কে জানে। বেঁচে আছে কি না তারই বা ঠিক কী? তবে বেঁচে না থাকার কোনো হেতু নেই। বেঁচে সে নিশ্চয়ই আছে। হয়তো তার মতো আরো কতো জনকে ইতিমধ্যে পথের ফকির বানিয়েছে এবং বানাবার প্রয়াস করছে।

সত্যিই, কতো লোকেরই না সর্বনাশ করলে মেয়েটা।···

মৌগাছিতে আসার ইচ্ছা মোটেই ছিল না ভবানীর। কিন্তু সে না এলে নাকি চলবে না—বসুমতী দেবী বললেন। বললেনঃ তোমার নামে মানত পূজো—তোমার কি না গেলে চলে। শুধু তাই তো নয়; তোমায় চড়ক সংক্রান্তির মেলা পর্যন্ত ওইখানেই থাকতে হবে। নিত্য পূজারতির সময় মহাকালের মন্দিরে তোমায় উপস্থিত থাকতে হবে।

কাজেই ভবানীর আর কোনো আপত্তি, কোনো কথা চললো না।

তা ছাড়া আজকাল সে কারো কথার প্রতিবাদ ক'রে কাউকে দুঃখ দিতেও চায় না। যে যা বলে সাধ্য মতো পালন ক'রে যাবার চেষ্টাই করে।

শিবরাত্রের কদিন আগেই মৌগাছির জমিদার ভবন জমজমিয়ে উঠলো। পাইক বরকন্দাজ, দাসী চাকর দরোয়ান সঙ্গে নিয়ে সস্ত্রীক কুমার ভবানীশংকর এসে উপস্থিত হ'ল।

তারপর এলেন গৃহিনী বসুমতী দেবী। গৌরী পরে আসবে।

বহুদিন পরে জমিদার গৃহে এতো লোক সমাগমে এবং বিশেষ ক'রে জমিদার গৃহিণীর আগমনে পাড়ার মধ্যে একটা যেন সোরগোল পড়ে গেল। জমিদারের ঘুমন্ত পুরী দীর্ঘকাল পরে কোন মায়ার কাঠির মোহন স্পর্শে হঠাৎ জেগে উঠে সকলের মনে চমক লাগিয়ে দিলে যেন।

অনেকদিন পরে আদি-বাড়িতে এসে বেশ ভালোই লাগছে

বসুমতী দেবীর। অনুরাধারও বেশ লাগছে। কেবল বিশ্রী লাগছে ভবানীর। তার প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠছে এখানে। কিন্তু উপায় কি ?

শিবরাত্রের পূর্বদিন অপরাহ্ণে ভবানী বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো একটু ঘুরে ফিরে আসবার জন্যে।

এ দুদিন কোথাও বেরুতেই পারেনি নানা ঝঞ্ঝাটে। বাড়ির মধ্যে বসে বসে আরো অস্থির হ'য়ে উঠেছে সে—বিরক্তি ধরে গেছে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে অনিয়তভাবে পথ চলতে লাগলো সে। ডাকাতে বিলের চরের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় মেলায় এসে উপস্থিত হ'ল।

চারিদিকে দোকান পাট হৈ হল্লা। লোকে লোকারণ্য।

তারি মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে চলতে লাগলো সে। চলতে লাগলো যেন মেলারই এক দর্শকের মতো।

অতি সাধারণ পোশাকেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছে সে, লোক জনও সঙ্গে নেয়নি। সুতরাং সে যে জমিদার—এই মেলারই একজন মালিক, এ বোঝবার উপায় নেই তাকে দেখে। তাকে এখানে চেনেও না বেশি লোকে।

অন্যমনস্কের মতো এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে এগিয়ে চলেছে সে। হঠাৎ মনে পড়লো অনেক বছর আগের সেই প্রথম মেলা দেখতে আসার কথা। মনে পড়লো সেবার সঙ্গে ছিল অশোক। অশোকই তাকে জোর ক'রে মেলা দেখাতে এনেছিল। কিন্তু শুধুই কি মেলা দেখিয়েছিল সে ? না। দেখিয়েছিল উল্লাসীকে !

উল্লাসী ! আশ্চর্য মেয়ে উল্লাসী।

সেদিনের দৃশ্যটা স্পষ্ট যেন আজো দেখতে পাচ্ছে ভবানী চোখের সামনে।—

একটা তাঁবুর সামনে বাঁশের মাচার ওপর দাঁড়িয়ে অদ্ভুত পোশাক পরে সার্কাসওয়ালি মেয়ে উল্লাসী বাঁকা চোখে সামনের দিকে চেয়ে হাঁকছিল :

—আসুন বাবু। বাঘের খেলা, সাপের খেলা···হরেক রকম আর মজার খেলা! আসুন, দেখে যান। মাত্তর দু' আনা পয়সা খরচা ক'রে দেখে যান—

আজো যেন কানে বাজছে উল্লাসীর সেদিনের সেই কথাগুলি।

ভাবতে ভাবতে আনমনে ভবানী অনেকটা পথ চলে এসেছে—কোনো খেয়াল নেই।

অকস্মাৎ একটা মেয়েলি কণ্ঠের আহ্বান কানে যেতেই সে ভয়ংকর চমকে উঠলো।

—ভানুমতীর খেল বাবু—ভানুমতীর খেল।, আসুন, দেখুন—মাত্তর দু' আনা টিকিট!

চমকে উঠে দৃষ্টি ফেরাতেই দেখলে তার একান্ত সন্নিকটে একটি ছোট্ট তাঁবু, আর তারি সামনে দাঁড়িয়ে একটি নারী লোক ডাকছে—ভানুমতীর খেলা দেখবার জন্যে।

—আরে রাজাবাবু—হি-হি—

চমক না কাটতে কাটতে আর একবার চমকে উঠলো ভবানী। সামনে বজ্রপাত হ'লে মানুষ যেমন চমকে ওঠে, তেমনি চমকে উঠলো।

সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলে—তাঁবুর ওপাশ থেকে আকর্ণ বিস্তৃত হাসি হাসতে হাসতে যে বেঁটে কদাকার লোকটা এগিয়ে আসছে তার দিকে—সে সেই—সে সেই কামিনী হত্যাকারী ভয়ংকর মানুষ বিশাই।

এক নজরেই তাকে চিনে ফেললে ভবানী।

বুকটার মধ্যে কেমন যেন ধড়-ফড় ক'রে উঠলো তার।

কিন্তু বিশাই কোত্থেকে এলো এখানে? এ ভানুমতীর দল কী তবে ওরই?

ততক্ষণে বিশাই এগিয়ে এসেছে তার কাছে। একটা প্রকাণ্ড সেলাম ঠুকে তেমনি বিভীষণ হাসি হাসতে হাসতে বললেঃ আপনার শরীল গতিক ভালো রাজাবাব? হেঁ হেঁ—আমরা আবার

আপনার মেলায় একটুন খেলা দেখাতে এয়েচি। আসুন হামরাদের ডেরায় একটুন পায়ের ধূলা দিয়ে যান।

বুকের ভেতরটা তেমনি ধড়াশ ধড়াশ করতে লাগলো ভবানীর। কী এক অজ্ঞাত ভয়ে গলাটা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেল তার। কি একটা বলবার চেষ্টা করলে কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না।

বিশাই সজোরে হেসে উঠলো তার সেই ভাব দেখে।

হাসতে হাসতে আরো একটু কাছে সরে এসে বললেঃ আমায় চিনছেন না রাজাবাবু? আমি বিশাই আছি। হি হি—রামলালের ছেলে বিশাই। ওই যে—ওইখানে হামরাদের তাঁবু।

হঠাৎ হাসি থামিয়ে গম্ভীর হ'য়ে গেল বিশাই।

একটু চুপ ক'রে থেকে একটা জোরে নিশ্বাস ফেললে। তারপর বেশ খেদের সঙ্গে বললেঃ বড় গরীব হ'য়্যা গেছি রাজাবাবু। সেই কামিনী শালী আমায় ফকির বানিয়ে গেছে। শালীর তরে আমার সাত বছর দ্বীপান্তর হ'ল। আর ইদিকে আমার যথা সর্বস্ব ফাঁক হ'য়্যা গেল।

সখেদে একবার নিজের ললাট স্পর্শ করলে বিশাই। হাতখানা উল্টে এখন একটা বিচিত্র ভঙ্গী করলে, যেন বলতে চাইলে সবই কপাল। তারপর আবার তেমনি ভীষণ হাসি হেসে বললেঃ এখন আর সার্কেস খেলা নেই বাবু— এখন ভানুমতীর খেলা দেখাই। ভারী মজার খেলা। আসুন না—

ঠিক সেই মুহূর্তে পুনরায় সেই নারীকণ্ঠের আহ্বান শোনা গেলঃ

—আসুন বাবু—ভানুমতীর খেল্—

ভানুমতীর খেল!

ভবানীর মাথার মধ্যে কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগলো। হৃৎপিণ্ডটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠলো যেন। ও নারী কণ্ঠের স্বর কার? এ যেন—এ যেন—

—রাজাবাবু!

—অ্যাঁ। হ্যাঁ—

আবার একবার চমকে উঠে বিশাইয়ের দিকে তাকালে ভবানী। পরমুহূর্তে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালে অদূরে ছোট্ট তাঁবুটার সামনে দণ্ডায়মানা নারীটির পানে। সহসা তার চোখের সামনে পৃথিবীটা যেন দুলতে লাগলো।

চিনেছে সে, চিনেছে—ঠিক চিনেছে।

কিন্তু এমন কি ক'রে হয়?

দু' হাত দিয়ে চোখ দুটো পরিষ্কার ক'রে তাকিয়ে দেখলে সে।

না তার চেনার তো ভুল হয় নি।

বিশাই বোধ করি বুঝতে পেরেছে তার মনের ভাব। একটু হেসে বললেঃ রাজাবাবু, উ আমার বউ—উল্লাসী।

—উল্লাসী!

কেমন যেন আর্তনাদের মতো শব্দটা ভবানীর গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো।

—হাঁ বাবু, উল্লাসী।

অকস্মাৎ বছর খানেক পূর্বেকার পড়া সংবাদ পত্রের একটা সংবাদ ভবানীর মনে পড়ে গেলঃ—

> বিখ্যাত সিনেমা অভিনেত্রী ও চিত্র পরিচালিকা অশোকা দেবীর আকস্মিক অন্তর্ধানে চিত্র জগতে মহা চাঞ্চল্য পড়িয়া গিয়াছে। তিনি একাধারে সিনেমা এবং থিয়েটারে অভিনয় করিয়া প্রভূত যশ খ্যাতি ও অর্থ অর্জন করিয়াছিলেন। বর্তমানে তিনি বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছিলেন এবং নিজে একটি সিনেমা কোম্পানি করিয়া চিত্র নির্মাণের কাজ শুরু করিয়াছিলেন। তাহার অন্তর্ধানে চিত্রটি অর্ধ সমাপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে এবং তাঁর বিষয় আশয়ের যে কী গতি হইবে কে জানে। আরো বিস্ময়কর ঘটনা এই যে, তাঁহার এইরূপ অভাবনীয়

অন্তর্ধানে তাঁহার বর্তমান স্বামী বিখ্যাত শিল্পপতি শিউনারাণ আগরওয়ালা পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করিয়াছেন। * * *

অশোকা দেবী! তখন বুঝতে পারেনি ভবানী—চিনতে পারেনি এই অশোকা দেবীটি কে? আজ সমস্ত ব্যাপারটা মুহূর্তে পরিষ্কার হ'য়ে গেল তার কাছে। উল্লাসী—মালবিকা—কাবেরী—অশোকা একই নারী। কেবল বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন নামে লীলা করেছে মাত্র। এবং সুচারু প্রেমের অভিনয়ে বহু পুরুষকে পথের ভিকিরি ক'রে ছেড়েছে সর্বস্ব আত্মসাৎ ক'রে। কারো কারো মৃত্যুও ঘটিয়েছে। কামিনীও বিশাইয়ের হাতে নিহত হয়েছে ওরই জন্যে। ওরই জন্যে ভবানীরও আজ—

কিন্তু যাক! ভবানীর একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে। ওর নাগপাশ থেকে মুক্তি না পেলে ভবানীর জীবন আজ অনুরাধার সাহচর্যে—এমন ধন্য হ'য়ে উঠতো না। অনুরাধার প্রেমের মাধুর্যরসে বঞ্চিতই হ'য়ে থাকতে হতো তাকে। এ তার শাপে বর হয়েছে! চুলোয় যাক্ উল্লাসী—চুলোয় যাক্ তার কৃত্রিম প্রেমের দুরন্ত অভিনয়।...

কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছে না ভবানী—শহরের সেই বিলাস-জীবন—সেই সম্মান সম্পদ সমস্ত পরিত্যাগ করে কিসের আকর্ষণে উল্লাসী আবার সেই তার আদি জীবনে ফিরে এলো?

স্থির দৃষ্টিতে ভবানীর দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছিল বিশাই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিল তার চিন্তাক্লিষ্ট মুখে রকমারি ভঙ্গী, আর মৃদু মৃদু হাসছিল। এইবার সেই হাসির এব সশব্দ প্রকাশে বাধা পেল তার চিন্তার গতি।

বিশাইয়ের দিকে তাকিয়ে একটু হাসবার চেষ্টা করলে সে, কি সে শুধু চেষ্টাই—হাসি ফুটলো না।

তারপর বার দুই শুষ্ক অধর জিব দিয়ে লেহন ক'রে নিয়ে কাঁ

লায় আস্তে আস্তে বললে : তা, তা—তোমাদের খেলা কেমন চলছে বিশাই ?

—হেঁ হেঁ ! ভালো আজ্ঞে। একবার হামরাদের ওখানে পায়ের ধুলো—

অসমাপ্ত রেখেই বিশাই তাঁবুর দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে চিৎকার ক'রে উঠলো হঠাৎ।

—উল্লাসী—উল্লাসী, একবার ইদিকে আয় রে। রাজাবাবু আইছেন। তুর ছেল্যেরে লিয়ে আয়।

—ছেলে !

ব্রহ্মাণ্ডের বিস্ময় চোখ দুটোয় জড়ো ক'রে বিশাইয়ের পানে তাকালে ভবানী।

—ছেলে ? কার ছেলে ? উল্লাসীর ?

—হাঁ বাবু।

—দূর। উল্লাসীর ছেলে কি ?

—হাঁ বাবু। উই ছেলে নিয়্যা পাগল হ'য়্যা আছে উল্লাসী দিনরাত্ত।

—তা থাক। কিন্তু—

ভুরু দুটো কুঁচকে গেল ভবানীর।

—কিন্তু তুমি ঠিক বলছো উল্লাসীর গর্ভের সন্তান !

—হি-হি-হি ! রাজাবাবু কি বলে।

এবার সজোরে হেসে উঠলো বিশাই। এবং পরমুহূর্তেই হাসি নামিয়ে, চতুর্দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে চাপা গলায় বললে : ছেলে উর প্যাটের হবে কেনে বাবু ! উরে যে রেখেছিল সেই শিউনারাণ নাকি—ই তার ভাইর ছেলে। চুরি কর‍্যা আনছে।

শিউরে উঠলো ভবানী।

—চুরি ক'রে ? কী ক'রে চুরি করলে ?

—উ করে নাই—টাকা দিয়া করাইছে। একটা নার্স (নার্স)

অনেক টাকা খেয়্যা আঁতুড় ঘর থেকে ছেলেটারে ... দিছে সেই রাতেই আমার সঙ্গে চম্পট। হি—হি—...

ভবানীর যেন বাক রোধ হ'য়ে গেল। আতঙ্ক ফুটে উঠলো। ঘৃণায় সংকুচিত হ'য়ে গে... মনে কেবল একটা প্রশ্ন ধ্বনিত হ'তে লাগলো- নারী -মায়ের বুক থেকে তার সন্তান চুরি ক'রে

সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল—পারে বইকি। উল্লাসী ও ব্যাধিনী।

উল্লাসী তখনো সেই একই জায়গায় দাঁ... দেখাবার জন্যে লোক ডাকছে। বোধ হয় বিশা... পায়নি, কিংবা সে ডাকে গুরুত্ব দেয়নি।

বিশাই পুনরায় ডাকতে যাচ্ছিল, বাধা দি... একবার উল্লাসীকে দেখবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জেগে... ইচ্ছা দমন ক'রে বললেঃ আজ থাক বিশাই। ... অন্য কাজ আছে—তাড়াতাড়ি আছে। আমি... হোক আবার আসবো। এসে তোমাদের ... উল্লাসীর ছেলেকেও দেখে যাবো। আজ আ... কাজ নেই।

একবার বিশাইয়ের পিঠটা চাপড়ে দিয়ে হন... দিকে পা চালিয়ে দিলে ভবানী।

আর ফিরেও তাকালে না। শুধু শুনতে শুন... উল্লাসীর সেই একটানা কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর কানে।

—ভানুমতীর খেল্ বাবু—ভানুমতীর খেল্—